সতীনাথ ভাদুড়ী

অপরিচিতা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬১

দ্বিতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট্ লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—মন্মথনাথ পান

কে. এম. প্রেস

১।১ দীনবন্ধু লেন

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

এই লেখকের অন্যান্য বই

জাগরী

ঢোঁড়াই-চরিত মানস

(১ম চরণ ; ২য় চরণ)

চিত্রগুপ্তের ফাইল

গণনায়ক

জাগরী (কিশোর সংস্করণ)

সত্যি ভ্রমণকাহিনী

অচিন রাগিণী

চকাচকী

সংকট

অপরিচিতা

পিকাডিলি-সার্কাসের বিখ্যাত কন্দর্পমূর্তিটির নীচে অপেক্ষা করছিলাম দত্তর জন্য এক রাত্রে। করোনেশনের আরও এক সপ্তাহ দেরী আছে। কিন্তু এখনই চেনা লণ্ডনকে আর চিনবার উপায় নেই। ভিড়ের ঠেলায় পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে থাকা দায়।...বছর চারেক থেকে দত্ত বিলাতে আছে; তবু এখনও এতটুকু সময়ের জ্ঞান হ'ল না! মন বিরক্ত হয়ে উঠছে তা র উপর। এসেই হয়ত বলবে, এক বান্ধবী তাকে কিছুতেই আসতে দিচ্ছিল না, নেহাৎ আমাকে কথা দিয়েছিল বলে একরকম জোর করে চলে এল; কাল আবার এর জন্য অভিমান ভাঙ্গানোর পালা আছে।...আরও কত কথা। রোজ শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে এসব। এক এক সময় সন্দেহ হয় যে মিছে কথা বলছে। আবার পর মুহূর্তে মনে হয় যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে কি কেউ এত বিশদ ও সুনিশ্চিত বিবরণ দিতে পারে, তার বিভিন্ন প্রেমের পাত্রীর! দত্ত বড়লোকের ছেলে। ব্যারিস্টারির ছাত্র। চার বছর আগে এসেছে বিলাতে, কিন্তু সব পরীক্ষাগুলো পাশ করা তার হয়ে ওঠেনি। যে কোন গল্পই আরম্ভ কর না তার সঙ্গে, সে তার মধ্যে মেয়েদের প্রসঙ্গ, আর প্রেমের রাজ্যে নিজের দিগ্বিজয়ের অসংখ্য কাহিনী, এনে ফেলবেই ফেলবে। আমি যতদূর বুঝেছি, প্রেমে বিজয়লাভ বলতে সে বোঝে একজন সদ্যপরিচিত মহিলার সঙ্গে রেস্তরাঁয় অনেকক্ষণ বসে খাওয়া এবং তারপর সময় থাকলে, বড় রাস্তার উপর দিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ হেঁটে

বেড়ানো। এই নিয়েই তার এত লম্বা লম্বা গল্প, এত লম্ফঝম্ফ। তবু একথা অস্বীকার করতে পারব না যে, তার এই সব গল্প আমার খারাপ লাগে ·না আজকাল। এত ঝাড়া-হাত-পা ইংলণ্ডে আসবার পর আর কখনও হইনি। পড়াশোনার চাপ নেই মাথার উপর। যে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য এদেশে আসা তা পেয়ে গিয়েছি। পরীক্ষায় ভাল করবার পর বিবেক একটু ভোঁতা হয়ে এসেছে। বাড়ি থেকে মিছে কথা বলে টাকা আনিয়ে থেকে গিয়েছিলাম করোনেশন দেখবার জন্য। প্রায় তিন বছর এদেশে হল। কিন্তু এতদিন পড়াশোনার দায়িত্ব মাথায় থাকায়, এদেশকে উপভোগ করতে পেরেছি খুবই কম। লোকজনের সঙ্গে ভাসাভাসা পরিচয় হয়েছে, কিন্তু আলাপ জমেনি। সত্যি কথা বলতে কি লোকজনের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতা আমার নেই। বুড়ী ল্যাণ্ডলেডি ছাড়া অন্য কোনও ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধা আমার হয়নি। নাচতে জানি না, খেলাধুলোয় রুচি নেই, বড়লোকের ছেলে নই, আমার মত লোক নতুন আলাপ জমাবার সুযোগ পাবে কি করে এদেশে! সাধে কি আর দত্তদের দলে ভিড়বার চেষ্টা করছি ইদানীং! আমার মত আনাড়ীকে, তালিম দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে একটু চালাকচতুর করে দেবার জন্য, তার চেষ্টার ক্রুটি নেই। যে তার সবজান্তা ভাবটাকে স্বীকার করে নেয়, তাকেই দত্ত বন্ধু বলে স্বীকৃতি দেয়। আমার চেয়ে এক বছর আগে বিলাতে আসবার দাবীতে, সে নিজেকে সব বিষয়ে অনেক উঁচুতে মনে করে। আমিও নির্বিরোধে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিই বলেই সে আমার উপর এত সদয়।...দত্তর এখনও আসবার নাম নেই!......একখানা খবরের কাগজ কিনলাম। করোনেশনের হিড়িকে আর কিছু না হোক, আলোর জলুস বেড়েছে; কাগজ পড়তে কোন কষ্ট নেই।...বড় বড় অক্ষরে—করোনেশন!...করোনেশন!...করোনেশন!... কাগজে করোনেশন ছাড়া আর অন্য কোন খবর নেই!...“স্কটল্যাণ্ড

ইয়ার্ডের বড় কর্তাদের ভিতর করোনেশনের মরশুমে লণ্ডনে নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার জন্য বিশদ আলোচনা।"

"টিলবেরি ডকে অস্ট্রেলিয়া হইতে করোনেশন উপলক্ষে আগত পুলিস দলের সহিত আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।— দুর্বৃত্তদের করোনেশনের সময় মোটেই সুবিধা হইবে না।"......

"পুলিসের ধারণা যে ক্যানাডার দাগী হীরা চোর রবার্টসন সম্ভবত করোনেশন উপলক্ষে ইংলণ্ডে আসিয়াছে...... !"

"দেরী করে ফেললাম না কি ? লিজা কিছুতেই"...দত্ত এসে গেল তাহ'লে। তাকিয়ে দেখি সে ঘড়ি দেখছে। লিজার গল্প এখনই শেষ করে লাভ নেই।...

"না না দেরী আর কি। আমিও তো এই আসছি। চল !"

সম্মুখের 'কর্নার-হাউস' রেস্তরাঁয় আমাদের যাবার কথা ছিল। খাবারের ট্রে নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম।

"নতুন স্যুট তয়ের করালে যে দেখছি !"

"হ্যাঁ দেশে যাওয়ার আগে একবার করিয়ে নেওয়া গেল।"

"বুঝেছি বুঝেছি দাদা, করোনেশনের মরশুমে কাজে লাগবে। ঠিকই করেছ। অপরিচিতাদের সঙ্গে আলাপ করতে হলে ভাল দরজী-বাড়ির স্যুটই হচ্ছে প্রারম্ভিক পাসপোর্ট এদেশে।"

"না না সেজন্য পোশাক তয়ের করাইনি। আর আমার মত চেহারায় যত দামী স্যুট পরি না কেন, কোন মেয়ে ফিরেও তাকাবে না।"

"এ তোমার ভুল ধারণা। ভাল পোশাকে লোকের চেহারা বদলে দিতে পারে। খেঁদি পেঁচিকে রাণীর পোশাক পরিয়ে দাও ; দেখবে ঠিক রাণী রাণী দেখতে লাগছে। তবে হ্যাঁ, ভাল দরজী-বাড়ির সেলাই হওয়া চাই। এদেশে থাকতে থাকতে এমন হয়ে গিয়েছে আজকাল যে পোশাকের কাটছাঁট সেলাইএর ভালমন্দ দেখা মাত্র বুঝতে পারি। তুমি করালেই

যদি, তবে আর একটু বেশী খরচ করে একটা ভাল দোকান থেকে করালে না কেন ?”

আমার জামার ভিতরে ‘অস্টিন রিড’ এর দোকানের নাম লেখা আছে। নিজের সামর্থ্যের চেয়ে বেশী খরচ করে ঐ ভাল দোকানটির থেকে জামা তয়ের করিয়েছি। ইচ্ছা হল দত্তকে সেই লেখাটা দেখিয়ে দিই। কিন্তু তাতে লাভ নেই। তাহলে আজকে রাত্রের গল্প আর হয়তো ভাল করে জমবে না। বরঞ্চ ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতার দিকটা বাড়িয়ে বললেই সে খুশী হবে বেশী। তাই তার প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে বললাম, “আমি যেদিন প্রথম লণ্ডনে আসি সেদিনও এই ‘কর্নার হাউস’ রেস্তরাঁয় খেতে এসেছিলাম। একটা ‘Lancashire Hot-Pot’ নিয়ে কি অপ্রস্তুত ! পাত্রটিকে নাড়িচাড়ি উবুর করি, কিছুতেই ভিতরের মাল বার হয় না। সবাই তাকিয়ে আমার টেবিলের দিকে। ময়দা না কি দিয়ে যেন মুখটা আঁটা থাকে না, সেটিকে কেটে যে ভিতরের তরকারি বার করতে হয়, তা’ কি তখন জানি ?”

“এখনও যে তখনকার চেয়ে বিশেষ বেশী জেনেছ এদের সম্বন্ধে তা’ ভেবোনা। এখানকার কোন নামজাদা হোটেলেতো একদিনও খাওনি বোধ হয় ?”

তার ভাবখানা যে ভাল হোটেলে খেতেই সে অভ্যস্ত। নেহাত আমার খাতিরে আজ এই সস্তা রেস্তরাঁয় ছকে ফেলা রুটিন-ডিস খাওয়ার জন্য এসেছে। “বলেছ ঠিকই ! ভাল হোটেলে খাওয়ার রেস্ত কোথায় পা’ব। দেশে কাত্যায়নী কেবিনে চা খাওয়া অভ্যাস ছিল ; এখানে তাই এই সস্তা রেস্তরাঁর জাঁকজমকেই আজও হকচকিয়ে যাই। ঐ শোন হোটেলের মিউজিক ! যে রেস্তরাঁয় খাওয়ার সময় ভদ্রমহিলারা পিয়ানো বাজিয়ে শোনান, তাকে কি আমি বাজে হোটেল বলে ভাবতে পারি ?”

"এখানকার এই তৃতীয় শ্রেণীর পিয়ানোর গৎগুলোকে আর মিউজিক ব'ল না! আর প্রত্যেকবার বাজানোর পর পিয়ানিস্ট মহিলাটি অপেরার সেরা নর্তকীর ধরনে কি রকম করে সকলকে ঝুঁকে কুর্নিশ করেন হাততালি পাবার জন্য লক্ষ্য করেছ?"

"ভদ্রমহিলার হাবভাব দেখে শুধু আমরা কেন, এই রেস্তরাঁর প্রত্যেক খদ্দেরই হাসে। অথচ মজা দেখেছ, প্রত্যেকেই যথাসময়ে হাততালিও দিতে ভোলে না। অদ্ভুত এই ইংরেজ জাতটা! আমিতো এদের মতি-গতি কিছুই বুঝতে পারলাম না তিন বছরেও।"

"ও সব কি আর বইয়ে লেখা থাকে; ও সব চেষ্টা করে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শিখতে হয়।"

"আমাদের প্রোফেসার ব'লছিলেন যে, আসল ইংরেজ-চরিত্র দেখতে হয় যুদ্ধের সময়, আর করোনেশনের সময়। যুদ্ধের সময়ের ইংলণ্ড দেখবার সুযোগ না হয় হয়নি; কিন্তু করোনেশনের সময়ের ইংলণ্ডতো দেখছি। ইংরাজদের মধ্যে নূতনত্বতো কিছু চোখে পড়ছে না; শুধু রাস্তার ভিড় খানিকটা বেড়েছে আগের থেকে।"

"তোমার প্রোফেসার ভেবেছিলেন বোধহয় যে তুমি করোনেশনের সময় এখানে থাকবে না; তাই খানিকটা বাড়িয়ে বলেছিলেন। যে দেশে রাজারাণী আছে, সেখানেই লোকে করোনেশনের সময় হুজুগে মাতে। এর মধ্যে ইংরেজ জার্মান কিছু নেই! তুমি ব'লছ রাস্তার লোক বেড়েছে; আমার তো ভাই নজরে পড়ে না। আজকের ভিড় দেখে ব'লছতো? পিকাডিলি-সার্কাসে প্রতি শনিবারেই এই রকম ভিড় হয়। বরঞ্চ আজকে একটু কম মনে হল। করোনেশন হচ্ছে শনিবার সন্ধ্যার একটা পরিবর্ধিত সংস্করণ। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।"

এইরে! একটু বিরক্ত বিরক্ত ভাব যেন দস্তুর! কি আবার বেফাঁস বলে ফেললাম? তার চেয়ে বেশী জানি এমন কোন কথা বলেছি

বোধহয়! সামলে নেবার জন্ত বলতে হয়—"পিকাডিলি সার্কাস অঞ্চলে আমার যাওয়া আসা এতকাল কম ছিল কিনা, সেইজন্ত এর আগে হয়তো ভাল করে লক্ষ্য করিনি এখানকার লোকজনের ভিড়। এই রেস্তরাঁয় প্রথমদিনই আর এক কাণ্ড করেছিলাম। শোন বলি। খেয়ে দেয়ে বার হবার সময় দেখি দরোয়ান আমাকে যেতে দেবার জন্ত দরজা ফাঁক করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গট্‌গট্ করে বেরিয়ে আসবার পর বুঝি যে সে দরোয়ান নয়; আমারই মত একজন খদ্দের। আমারই জন্ত ভদ্রতা দেখিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল। একটা ধন্তবাদও দেওয়া হয়নি। প্রথম দিনের এই ছু'ছুটো কাণ্ড থেকেই বোধহয় পিকাডিলি-সার্কাসের দিকটা এড়িয়ে চলবার একটা চেষ্টা ছিল, আমার অবচেতন মনে।"

"তুমি যে মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে চলে যাচ্ছো! সাবধান! থিয়োরী শিখতে শিখতেই তোমাদের জীবন কেটে গেল! কাজে খাটাতে না পারলে শুকনো মনোবিজ্ঞান শিখে লাভ কি? ইংরেজদের সাইকোলজি শুনবে? স্বাভাবিক ইংরেজ অস্বাভাবিক মানুষ। এই অমানুষ জাতটা মানুষ হয় সপ্তাহে একদিন—শনিবারে সন্ধ্যায়। আজ একটু অন্তরকম অন্তরকম লাগছে না? শুধু যে পানশালা, নাচঘর, সিনেমা, থিয়েটার আজ ভরা তা নয়; শনিবারে সমাজ একটু রাশ আলগা দেওয়ায়, আসল ইংরেজ ফুটে বার হয় নকলের মধ্যে থেকে। বলছিলাম না যে করোনেশনের সময়ের ইংরেজ, শনিবারের রাতের ইংরেজের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ; কথাটা হয়ত ঠিক হয়নি। পরিবর্ধিত ও অমার্জিত সংস্করণ বলাই ঠিক হবে। আর এক কথা। আমার বদ্ধমূল ধারণা কি জান? জাতীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হয় মেয়েদের মধ্যে। চেহারা আর পোশাকের কথা বাদ দিলে পুরুষ সব দেশে মোটামুটি একই রকম। কিন্তু মেয়েরা তা নয়। কোথাও মেয়েরা দেখবে কেঁদে জেতে, কোথাও হেসে; কোথাও ঠাণ্ডা বরফ, কোথাও গরম আগুন; কোথাও গম্ভীর,

কোথাও চটুলা; কোথাও দেহসর্বস্ব, কোথাও ভাবপ্রবণ; কোথাও দেখবে তোমাকে খাইয়ে খুশি করতে চায়, কোথাও তোমার পয়সায় খেয়ে তোমাকে খুশি করতে চায়। আমিতো যে কোন দেশে গিয়ে, মেয়েদের শুধু চলার ভঙ্গী দেখে বলে দিতে পারি, সেখানকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য কি কি। চোখের চাউনি দেখতে পেলেতো কথাই নেই!"

"বোরকা পরা থাকলে কি করবে? সেখানে না দেখতে পাবে চোখের বিজুলী, না বুঝতে পারবে চলার ভঙ্গী ঢিলে আলখাল্লার মধ্যে দিয়ে?"

"বোরকা পরা মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই। জানবার আছেই বা কি? বোরকাই সেখানকার স্ত্রী-পুরুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তুমি হঠাৎ বোরকার কথা তুললে কেন? আমায় ঠাট্টা করে নাকি? সত্যিই মেয়েদের চোখের চাউনির ভাষা আমি বুঝতে পারি। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

"না না সে কথা কে বলছে! মনের ছাপ চোখে পড়ে বই কি। মেয়েদের চোখের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা তোমার আছে জেনেইতো, তোমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি।"

"শিখে যাবে হে। এই করোনেশনের সপ্তাহেই সব চাউনির ভাষা পড়তে শিখে যাবে। 'বিলোল-কটাক্ষ' কথা দুটো বইয়ে পড়েছ তো? কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তুমি কারও চাউনি দেখে চিনতে পারবে না সেটা বিলোল-কটাক্ষ, না অন্য কিছু। যতই অভিধান দেখে তার মানে খুঁজে বার কর না কেন। সারাজীবনের পুঁথিগত বিদ্যার চাইতে এক ঘণ্টার অভিজ্ঞতায় যে লোকে বেশী শিখতে পারে, এ তোমায় আমি হাতেনাতে দেখিয়ে দেব। ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের কথা হচ্ছিল না? পাঁজি দেখে যেমন আমরা আমাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করি, ওদেরও সেই রকম গোছেরই ব্যাপার। শনিবার ছাড়া রোজই

অশ্লেষা মঘার পালা, নীতিবাগীশদের যাত্রা নাস্তি। মহাশনিবার হচ্ছে করোনেশন ; একেবারে চূড়ামণিযোগের ব্যাপার। লোকাচার শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী ওরা প্রত্যেকে সেই সময় একখানি করে সাময়িক ছাড়পত্র পায়—একেবারে travel-as-you-like টিকিট। এই জিনিসকেই তোমার প্রোফেসার বলেছিলেন ইংরেজদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। করোনেশনের হুল্লোড়ের মধ্যে এ কয়দিন নিজেকে ডুবিয়ে দাও ; করোনেশনের আবহাওয়া প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে একেবারে আপন করে ফেল ; করোনেশনের উদ্দাম আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়। তবে না ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবে। বুঝবে যে এরাও জীবনের স্বাদ নিতে জানে। ভয় ক'র না! সঙ্কোচের কারণ নেই। শুচিবাই-গ্রস্তা ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে বসবার সপ্তাহও সে যুগের লম্বা-জুলফিওয়ালা ইংরেজরা যেমনভাবে উদ্‌যাপন করেছিল, আজ তাঁর নাতির-নাতনীর যুগে তা'র চেয়ে অনুদারভাবে এ যজ্ঞ সমাধা হবে না। এই সপ্তাহের স্মৃতি তোমার জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে!"...

দস্তুরমত লেকচার দেওয়া আরম্ভ করেছে দত্ত, আমার ভয় ভাঙ্গানোর জন্য। গত কয় মিনিটের মধ্যে করোনেশনের সম্বন্ধে তা'র মত বদলেছে। আমি এতে আশ্চর্য হইনি। তা'র মতের নড়চড় হয় না ততক্ষণ, ঠিক যতক্ষণ তুমি তার কথার প্রতিবাদ করছ। আমি যে অকুণ্ঠভাবে নিজেকে তা'র হাতে সঁপে দিয়েছি, এ বিষয়ে দত্তর আর সন্দেহ নেই। সেইজন্য তার অপদার্থ শিষ্যকে উপদেশ দেবার প্রেরণা পাচ্ছে সে।—কানে ভেসে আসছে তার কথার স্রোত।...এখন চলছে একটি ইংরেজী কবিতার কয়েকটি লাইন।—নীরস জীবন নিয়ে বিরাট ওকগাছ কতকাল বেঁচে থাকে। কিন্তু তাতে লাভ কি? লিলি বাঁচে মোটে একদিন—সৌন্দর্যের রসে ভরপুর জীবন। বসন্তের ঐ একদিনই যথেষ্ট ......তবে মিশতে হবে ওদের সঙ্গে। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে

হবে।……এক এক জায়গায় আলাপ করবার নিয়ম এক এক রকম। নাচ ঘরে যে নিয়ম কার্যকরী রাস্তায় সে নিয়ম অচল। হাইড পার্কে উপবিষ্টা মহিলার সঙ্গে প্রথম আলাপের কৌশল কখনও রেস্তরায় আহাররতা মহিলার বেলা চলতে পারে না।……যত খারাপ ভিশই দিক, এই সব সস্তা হোটেলের একটা মস্ত গুণ যে এখানে যারা খেতে আসে, তাদের সঙ্গে আলাপ করা সহজ। এদের অধিকাংশই প্রেম করবার জন্য উদ্‌গ্রীব, সব শনিবারে। এই করোনেশনের বাজারে তো কথাই নেই! তবু এদের মধ্যে থেকেও যেয়ে চিনে বার করতে হয়। সে চোখ থাকা চাই। চাউনির ভাষা বুঝবার চোখ।…বুঝতে শেখো, জানতে শেখো, চিনতে শেখো!"

বহুদূরে হলঘরের কোণার দিকের একটি টেবিল দেখিয়ে দত্ত বলল—"ঐ যে দুটি মহিলা দেখছ, ওঁদের সঙ্গে আলাপ করা যেতে পারে।"

দত্তর লেকচার একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু এখন আর শুধু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নয়—একেবারে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চেয়ারে নড়েচড়ে বসলাম মহিলা দুটিকে ভাল করে লক্ষ্য করবার জন্য। একজনের পোশাক সবুজ রঙের; আর একজনের গোলাপী।…মহিলা দুজন মৃদু হাসতে হাসতে গল্প করছেন নিজেদের মধ্যে।…খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন মধ্যে মধ্যে চারিদিকের টেবিলের লোকজন আড়চোখে দেখে নিচ্ছেন, নিজেদের হাসিগল্পের খোরাকের জন্য বোধ হয়। হাবভাবে এখানকার অন্য মহিলাদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য আমার কিছুই নজরে পড়ল না।…

দত্তকে জিজ্ঞাসা করি, 'কি করে বুঝলে?'

এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিল সে। ডিটেকটিভ বইয়ের শেষের দিকে গোয়েন্দা যেরকম করে নিজের যুক্তির শৃঙ্খলের বলয়গুলো এক এক করে তুলে ধরে পাঠকদের সম্মুখে সেইরকমভাবে দত্ত আরম্ভ করে।

'প্রথমত বেশভূষা দেখে!'

এই পয়েণ্টটি এত সংক্ষেপে সেরে দিল যে, আমি জিজ্ঞাসা করবারও সুযোগ পেলাম না, বেশভূষার মধ্যে বিশেষত্ব কি দেখলে? পোশাকের রঙের মধ্যেই কিছু আছে নাকি? কে জানে?

"দ্বিতীয়ত, ওদের খাবার ডিশগুলো লক্ষ্য করেছিলে? সস্তায় পেট ভরানোর চেষ্টা। গরীব। তা না হলে এখানে আসবেই বা কেন! একটু একটু করে খাচ্ছে, ছোট ছেলেপিলেদের মত। যাতে অনেকক্ষণ ধরে স্বাদ পাওয়া যায়। গরীবরা মনের দিক থেকে উদার হয়।"

"বেশী খিদে নেই বোধ হয়। খিদে থাকলে তবে তো গোগ্রাসে গিলবে।"

"যা বলছি শোন। জানবার ইচ্ছে থাকলে বাজে তর্ক কর না। অন্তত এখন নয়। ওতে চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেবো আমি পরে।......ঐ! ঐ! তাকিয়েছে! তাকিয়েছে!...তাকাচ্ছে আমাদের দিকে! এইভাবে তাকানোটাই আসল! অব্যর্থ লক্ষণ।"...

সত্যিই সবুজ পোশাক পরা মহিলাটি আবার যেন এদিকে তাকালেন মনে হ'ল।...কি যেন বলছেন ফিসফিস করে সঙ্গিনীকে।...দুজনেই প্লেটের উপর ঝুঁকে পড়েছেন।...ঠিকই তাকিয়েছেন।...আর কোন সন্দেহ নেই!...দত্তর চোখ আছে!...

"হাঁ মুখার্জি তোমাকে আর একটা কথা সেদিন বলেছিলাম মনে আছে বোধ হয়? এসব ক্ষেত্রে দুই সংখ্যাটি বড় পয়মন্ত; বড় ভাল। ওরা দুজন আছে। প্রেমিকারা একা বার হওয়া শোভন মনে করেন না। দুজন একসঙ্গে বার হ'লে নানান দিক দিয়ে সুবিধা। সেসব তোমাকে সেদিন বলেইছি। ওরা খোঁজেও দুই বন্ধুকে। নইলে দু'য়ে দু'য়ে চার মিলবে কি করে? তোমাকেও বলে রাখি, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ যদি

করতে চাও, তবে খবদ্দার একা বেরিয়ো না। আবার তিনজনও থাকবে না। সুবিধা আছে হে, সুবিধা আছে এতে; চালাক লোকের পক্ষে একটি ইশারাই যথেষ্ট। একদিনে রংরুটকে কতটুকুই বা শেখানো যায়।"...

দত্তর কথা মনে বসছে। মেয়েটি এদিকে তাকানর পর আর দত্তর গল্পকে অতিরঞ্জিত বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

"দুজন থাকার এক মস্ত সুবিধে—একজন বসে থাকতে পারে, আর একজন উঠে যেতে পারে বাইরে।" দত্তর কথার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম।

সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

"আর কত পরিষ্কার করে বোঝাই ? মার্জিত সমাজে কি মেয়েরা—ওগো আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইগো বলে সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসে থাকবে।"

ব্যাপার আমার পক্ষে বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠল দেখছি! তবু বাঁচোয়া যে, হঠাৎ হাততালির শব্দে দত্ত আর কথা বলতে পারছে না। পিয়ানো এই মুহূর্তে থেমেছে। পিয়ানিস্ট ভদ্রমহিলা সম্মুখে ঝুঁকে কুর্নিশ করবার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে হতাশ না করবার জন্য সকলেই হাততালি দিচ্ছে। এখানকার বাঁধা খদ্দেররা এরই প্রতীক্ষায় ছিল এতক্ষণ, প্রাণ খুলে হেসে নেবার জন্য।...দূরের টেবিলের সেই সবুজ আর গোলাপী পোশাকপরা মহিলাদুটির উপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ।...তাঁরাও হাততালি দিতে দিতে হাসছেন।...চারিদিকের লোকজনের মুখের দিকে দেখছেন।...এইবার আমাদের দিকেও নিশ্চয়ই তাকাবেন। লক্ষ্য করতে হবে সেই সময় তাঁদের চাউনির ভঙ্গী।...অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাশায় মন মেতে উঠেছে।...প্রাণপণ শক্তিতে হাততালির ঐকতানে যোগ দিয়েছি হাসতে হাসতে।...তাকিয়েছেন! ঐ তাকাচ্ছেন

সবুজ পোশাক পরা মহিলা আমারই দিকে! শুধু আমার দিকে! দত্তর দিকে নয়! ঘরভরা এত লোকের মধ্যে আর কারো দিকে নয়! এ এক নতুন উদ্দীপনা। দ্বিগুণ উৎসাহে হাততালি দিচ্ছি।...

যখন থামলাম, দেখি আমার একার হাত তালিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু লোক আমার দিকে তাকিয়ে। কেউ কেউ আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে, সেই সবুজ পোশাকপরা মহিলাকে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছেন।... ঠিক সবুজ পরীর মত দেখতে লাগছে ওঁকে!...

"এই!"

দত্ত জুতোর ঠোকর মেরে আমায় সাবধান করে দিল। সে খুশী হয়েছে তার যুক্তির সত্যতা প্রমাণ হওয়ায়। আরও বেশী খুশী হয়েছে শিষ্যের পরিবর্তন দেখে।

সে কি সোজা পরিবর্তন! এক নম্বরের চালিয়াত ভেবে যে দত্তর কাছে ঘেঁষতাম না এক মাস আগে পর্যন্ত, তারই কাছে সত্যেন দত্তর 'সবুজ-পরী' কবিতার দু'লাইন আউড়ে দিলাম এখন। সবুজ ছাড়া আর সব রঙ পৃথিবীতে নিরর্থক, সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যবর্জিত। দত্ত চক্ষের চাউনির ভাষা বোঝে; আমার চোখে যে সবুজের নেশা লেগেছে একথা বুঝতে তার দেরী হয়নি।

সবুজ পরী ঘড়ি দেখলেন।...আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন।...আমার সাহস বেড়েছে; তাই চোখ ফিরিয়ে নিলাম না। চোখাচোখি হতে তিনি সঙ্গিনীর দিকে ফিরে তাকিয়ে কি যেন বললেন।...দুজনেই হাসছেন।...ফিকে সবুজ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ঘরের ঐ কোণাটি!...গোলাপীর পাশে সবুজ যে এত সুন্দর মানায় তা' আগে জানতাম না! সবুজ পাতার মধ্যে গোলাপ ফুল দেখতে ভাল লাগে, চিরকাল; কিন্তু তখন যে নজর থাকে গোলাপী রঙের ফুলটির দিকে; সবুজের দিকে কে তাকায়?

দত্ত উপদেশ দিচ্ছে—"দেখেছ! বলেছিলাম না! ওরা নিজেদের নিজেদের মধ্যে ঠিক করেছে কে আগে উঠবে। আজকের এমন আলাপের সুযোগ নষ্ট হতে দিও না! মন তৈরী করে ফেল! নার্ভাস হবার কিছুই নেই। কি বলে কথা আরম্ভ করবে সেটা আগে থেকে ভেবে রেখো। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা লেগে গেলে বলবে "মাপ করবেন। যা ভিড় করোনেশনের মরশুমে!" না হয় দেশলাই আছে কি না খোঁজ নিতে পার মহিলাটির কাছে। তোমার পক্ষে বোধহয় সহজ হবে বলা "ভারি সুন্দর রাতটা!" ভাব দেখাবে যে কথাটি কাউকে উদ্দেশ্য না করেই বলা। তারপর মুখে হাসি এনে মেয়েটির দিকে তাকাবে। মেয়েটি অবধারিত হেসে তোমার কথার সমর্থন করবে। ব্যস! তারপরেই আরম্ভ করবে গল্প। এত খুঁটিনাটি কি কাউকে মুখস্থ করে শিখিয়ে দেওয়া যায়?"

আর শেখানোর দরকারও ছিল না। আমি মন স্থির করে ফেলেছি। দত্ত ঠিক বলেছে। কথার আরম্ভটাই আসল। পরের কথাগুলো আপনিই মুখে জোগাবে।

সবুজপরী হাত ঘড়িতে আর একবার সময় দেখে নিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে।

"মুখার্জি ওঠ!"

দত্ত একথা বলবার আগেই আমি উঠে পড়েছিলাম।...পান্নার দ্যুতি ছড়াতে ছড়াতে সবুজপরী এগিয়ে চলেছেন দরজার দিকে। যেমন করে হ'ক তাঁর কাছে পৌঁছতে হবে। আর দ্বিধা করবার অবকাশ নেই। একখানা চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম প্রথমেই। কে কি ভাবল সে কথা ভাববার সময় নেই আমার এখন! একটি সবুজ জ্যোতির্মণ্ডল ছাড়া আর সমস্ত পৃথিবী মুছে গিয়েছে আমার চোখের সম্মুখ থেকে। এখন যদি উনি সত্যিকার সবুজপরী হয়ে উড়েও যান ডানা মেলে তবুও তার পিছু নিতে হবে! কার সাধ্য আমাকে আটকায়!

সবুজপরী দরজা দিয়ে বাইরে বেরুলেন। এখন প্রত্যেক সেকেণ্ডের মূল্য আছে আমার কাছে। প্রায় ছুটে চলেছি। আমার আগের ভদ্রলোকটি বার হবার সময় দরজাটি খুলে ধরে দাঁড়ালেন, খোলা কপাটের চার্জ আমার হাতে সঁপে দেবার জন্য।...

"ধন্যবাদ।"

দারোয়ান বলে ভুল না করলেও, আজও সেই লণ্ডনে প্রথম দিনের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল। ভদ্রলোকটির মুখখানি কেমন হয়ে গিয়েছিল দেখবার সময় পাইনি।...সবুজপরী পেভমেণ্টের উপর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছেন। এমন সময় হনহন করে চলবার দরকার কি? এইটাই নিয়ম না তো? একটি খুব জরুরী কাজের ভান দেখাতে চান বোধ হয়! তাঁকে ধরতে হলে আমার দৌড়ান ছাড়া উপায় নেই!...ছুটতে আরম্ভ করেছি হন্তদন্ত হয়ে।...তিনি কন্দর্পমূর্তির পাশ দিয়ে গিয়ে ওদিককাব পেভমেণ্টে উঠলেন।...আমিও প্রায় পৌঁছে গিয়েছি তাঁর কাছে। হঠাৎ নার্ভাস হয়ে গিয়েছি শেষ মুহূর্তেও। হাঁটুর কাছে কি রকম যে অসাড় ভাব, কি বলে কথা আরম্ভ করা যায় ভেবে ঠিক করতে পারছি না।...দেশালাই চাওয়া ঠিক হবে না।...

...তার পাশে পৌঁছে গিয়েছি। আর এক মুহূর্তও দেরী করা চলে না! মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম—"ভারি স্থন্দর রাতটি!"

নজর আমার তাঁর মুখের দিকে। সবুজপরী অবাক হয়ে তাকিয়েছেন।...অল্প হাসি হাসি মুখ। হাসির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চাচ্ছেন যে, সত্যিই আজ রাতটি অতি স্থন্দর।...তাঁর চাউনির ভাষা বুঝতে চেষ্টা করছি, দত্তর নির্দেশ মত।...তিনি চিনতে চেষ্টা করছেন আমায়। প্রশ্ন করছেন। আমার কাছ থেকে বোধ হয় অন্য কথার আশা করেছিলেন। সলজ্জ আরক্তিম মুখে ও চাউনি ঠিক খাপ খাচ্ছে না। একটা কিছু বলতে হয় এখন।

"মাপ করবেন; যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে চলুন কোথাও বসে কিছুক্ষণ গল্প করতে করতে খাওয়া যাক একটু কিছু।"

এতক্ষণে তিনি যেন বুঝলেন, আগাগোড়া ব্যাপারটা। কাঠিন্যের আভাস পড়ল কেন দৃষ্টিতে? দত্তর শেখানো সব হিসাব গুলিয়ে দিয়ে সবুজপরী জবাব দিলেন—"আমি দুঃখিত। আমার এখন বিশেষ কাজ আছে।"

গলার স্বর বেশ শান্ত ও সংযত।

দত্ত এর আগে আমায় আর একদিন বুঝিয়েছেন, অনেক সময় এদের "না" মানেই "হ্যাঁ"। তাই নয়তো?

"আচ্ছা তবে কাল বিকেলে আপনার যদি সময় হয়..."

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সবুজপরী বললেন—"না দুঃখিত! কালও আমার কাজ আছে।"

এবার গলার স্বর দৃঢ়তর। চোখে বিরক্তির আভাস সুস্পষ্ট। ভদ্রতার খাতিরে মুখে হাসি আনবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা আছে। ...একটা মাকড়শা কিম্বা শুঁয়োপোকাকে দেখছেন যেন তিনি?...

আর ভুল বুঝবার অবকাশ মোটেই নেই। এক মিনিটের অভিজ্ঞতায় মেয়ে মানুষের চোখের ভাষা জলের মত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে আমার কাছে। সে দৃষ্টি বলতে চায়—নেহাত তুমি বিদেশী ছাত্র বলে পুলিশ ডাকছি না, নইলে তোমার মত লোকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়, তা' আমার বিলক্ষণ জানা আছে।...

...ধরণী দ্বিধা হও!...আমার নিজের চোখের চাউনি কোথায় লুকোই, তা' সুদ্ধ ভেবে ঠিক করতে পারছি না লজ্জায়!...

কিন্তু মহিলাটি ভদ্র। মনের উষ্মা কথাবার্তায় প্রকাশ না পেয়ে যায়, এ বিষয়ে শিক্ষা আছে, অধিকাংশ ইংরেজের মত। আমার দিকে একটা

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন নিজের গন্তব্যের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। ফুট ছয়েক লম্বা দুজন লোক দুদিক থেকে এসে আমার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে! ছিল কোথায় এরা? এরা কি ঐ মহিলাটির প্রণয়ী? না নিকট আত্মীয়? না আমার আস্পর্ধা দেখে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে দুজন পথচারী ইংরেজ আমায় উচিত শিক্ষা দেবার জন্য? ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপছে। এখন কি করা উচিত সে কথা ভাববার ক্ষমতা পর্যন্ত আমার লুপ্ত হয়েছে। এদের সঙ্গে মারামারি করবার কথা ভাবাও যায় না। ও জিনিস কোনকালেই আমার আসে না। পুলিশ ডাকবার সাহস নেই, নিজের বিবেক পরিষ্কার নয় বলে। এখনই লোক জড় হয়ে যাবে আমাকে ঘিরে! এরা যখন আমায় ধরেছে, তখন কি আর ঘা কতক না দিয়েই ছাড়বে! সিনেমায় দেখেছি ঝগড়ার সময় ইংরেজরা আমাদের মত চড়চাপড় মারে না, ঘুঁষি মারে; নাকে, মুখে, চিবুকে! নিজের মুখখানিকে আসন্ন আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য, অজ্ঞাতে হাত উঁচুতে তুলবার চেষ্টা করতেই সেই দুজন আমার দু' কাঁধে হাত রাখল। ছাঁত করে মনে পড়ল, লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে পুলিশ যখন কাউকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তখন একজন ডান বগলের মধ্যে দিয়ে তার হাতটি চালিয়ে দেয়, আর একজন দেয় বাঁ বগলের মধ্যে দিয়ে তার হাত। দুজন দু পাশে, মার্চ করবার তালে চলেছে দুর্বৃত্তকে ধরে নিয়ে, এ দৃশ্য বহুবার দেখেছি। এরা তো দেখি তা-ই করছে! কলোনির পুলিশ? দুজনেই লণ্ডন পুলিশের মত লম্বা! সেই রকমই দৃঢ় অথচ সংযত এদের ভাব। মাথার উপর এখন যদি এদের বাজও পড়ে, তবু এরা নিজেদের কর্তব্য করতে ভুলবে না! কালকের কাগজ পড়েছিলাম যে, করোনেশনের সপ্তাহে প্রতি রাস্তায় সাদা-পোষাক-পরা পুলিশের লোক থাকবে, দুর্বৃত্তদের ঠাণ্ডা করবার

জন্ত। তবে তো এরা ঠিকই সাদা পোষাক পরা পুলিশ! ভয়ে ঘেমে উঠেছি। বেশ জোরেই তারা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ঐ [illegible]কে কি বলছিলে?"

এরা নিশ্চয়ই সব দেখেছে। কোন জবাব জোগায় না আমার মুখে।

"আমি—অ্যাঁ—আমি বলছিলাম যে…" কথা খুঁজবার ব্যর্থ চেষ্টা আর আমায় করতে হ'ল না। সবুজপরী অল্প কিছুদূর মাত্র গিয়েছিলেন। তিনি থমকে ফিরে দাঁড়ালেন! বোধ হয় কানে গিয়েছে এখানকার পুলিশের কথাবার্তা! এই দিকেই যেন এগিয়ে আসছেন! আর রক্ষা নেই! এতক্ষণে ষোল কলা পূর্ণ হ'ল! আমার দুঃসাহসের কথা হয়তো অতিরঞ্জিত করেই বলবেন পুলিশের কাছে! এখনই পেনি কাগজের ফটোগ্রাফার আমার ছবি তুলে নেবে! আর কাল সকালের কাগজেই পিকাডিলি-সার্কাসে ভারতীয় দুর্বৃত্তের চাঞ্চল্যকর সংবাদ বেরিয়ে যাবে! ভারতবর্ষের কাগজেও বেরতে পারে! ভারতীয় হাই-কমিশনারই হয়ত বাড়িতে চিঠি লিখে দেবেন! এত বড় বিপদে আমি জীবনে পড়িনি এর আগে!

সবুজপরীর মুখে হাসি! তবে কি এদের মধ্যে একজন তাঁর প্রণয়ী? সবুজপরী খানিক দূর থেকেই হাসতে হাসতে বললেন, "আচ্ছা, কাল তিনটের সময় তোমায় আমি ফোন করব বুঝলে? এখন আসি; আবার কাল ফোনে জানাবো, কখন তোমার বাড়িতে যাব।"

অবাক হয়ে গিয়েছি। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার সম্মুখের লোক দুইজনের মধ্যে কাউকে বলছেন বুঝি। তা' তো নয়! উনি বললেন আমাকেই! আমার নাম ধাম কিছুই তো উনি জানেন না! আমার বাড়ির ফোন নম্বর উনি পাবেন কি করে?…

মুহূর্তের বিস্ময়। তারপরেই জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা আমার কাছে। উনি লোক দুটিকে শুনিয়ে দিলেন, যে আমার সঙ্গে

ওঁর পরিচয় আছে আগের থেকে। এ না করলে আজ আমার নিস্তার ছিল না।

সেই লম্বা চওড়া জোয়ান দুজন অবাক হয়েছে আমার চেয়েও বেশী। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুতও। সবুজপরীর কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা হাত নামিয়ে নিয়েছে, আমার গায়ের থেকে। ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে, পালাবার পথ খুঁজছে তখন তারা।

...অপরিচিতা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। রঙবেরঙের আলো পড়েছে অন্ধ কন্দর্প মূর্তিটির গায়ে!

পরিচিতা

কেবল হিসেব, আর হিসেব! সংসার চালানো মানেই তাই। এ যেন ছেঁড়া জাল দিয়ে মাছ ধরা। একদিক সামলাতে যাও তো আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। প্রশান্ত যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চায় এ ঝামেলা। কিন্তু বাড়ির কর্তার কি নিস্তার আছে এর হাত থেকে! হিসেব তাকে করতেই হয়—মোটা খরচের হিসেব, দমকা খরচের হিসেব, ধার শোধ দেবার হিসেব, টাকা জমানোর হিসেব; স্ত্রী শৈলের উপর ভার দৈনন্দিন সংসারের হিসাবের। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, প্রশান্ত হিসাব করে টাকায়—মাসের প্রথমে; শৈল হিসাব করে পয়সায় আর আনায়—মাসের তিরিশ দিন।

মাসপয়লা আপিস ফেরত বাড়ি ঢুকবার মুহূর্তে প্রশান্তর মেজাজ একটু ভারিক্কি হয়ে ওঠে। সদর দরজার চৌকাঠটা পর্যন্ত জুতোর ঠোকরে বুঝতে পারে যে এ লোকটি নেহাত হেঁজিপেঁজি নয়; বাড়ির হর্তাকর্তা-বিধাতা, এতগুলি লোকের অন্নদাতা। আজকে চোখ বুঁজলে ভেসে যাবে এতগুলি লোক। বাড়ির গিন্নি এখন নির্জীব, ঢোঁড়াসাপ। মাইনের টাকাটি হাতে পাবার পর থেকে তাঁর গিন্নিপনা আরম্ভ হবে। ঠিকে ঝি গুল্‌টেনের-মা প্রতি মাসপয়লায় অপেক্ষা করে, বাবুর আপিস থেকে বাড়ি ফিরবার। সে এ পাড়ার ডাকসাইটে দজ্জাল ঝি। পোড়া-বাসন মাজবার সময় চীৎকার করে বে-আক্কেলে বাড়ির লোকদের গালাগালি না দিলে সে গতরে জোর পায় না। কাউকে ছেড়ে কথা বলে না—উঠতে বসতে এমন চাকরি থেকে ইস্তফা দেবার হুমকি দেয়। মাইনে নিতে একটি দিনের তর সইবে না।

সে বাবুকে বাড়ি ঢুকতে দেখে একটুও সরে ব'সল না। পকেট থেকে টাকাটা বার করে শৈলর হাতে দেবার সময়, প্রশান্ত অন্যদিকে তাকিয়েই হাতটা বাড়িয়ে দেয়—নেহাত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে—যেন আজকের ডাকে পাওয়া একখানা সাধারণ চিঠি তার হাতে দিচ্ছে। এইটাই চরম পরিতৃপ্তির মুহূর্ত। ভাব দেখাতে হয়—যাক, একমাসের মত আমি দায়মুক্ত; আমার শুধু এ সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ, রোজ যেন চারটি চারটি খেতে পাই, আর সন্ধ্যাবেলার তাসের আড্ডায় যেতে পাই। ব্যস! তা'হলেই হ'ল। ছেলেপিলের অসুখবিসুখ আবার বাধিয়ে নিয়ো না যেন! তাহ'লে খরচকে খরচ, আর আমার 'ব্রিজ'এর আড্ডায় যাওয়া বন্ধ! ঐ একটাই তো আমার নেশা—বিড়ি সিগারেটটা পর্যন্ত খাই না!···

শৈল আট টাকা গুনে গুলটেনের-মায়ের হাতে দেয়। "বাবা রে বাবা! হ'ল?"

মাইজীর মুখের মৃদু হাসিকে উপেক্ষা করে গুলটেনের-মা মুখঝামটা দেয়—"এর মধ্যে আবার বাবারে বাবা কি? ভিক্ষা নিচ্ছি না কি? বাবু পয়লা মাইনে পাবে, আর আমি পয়লা মাইনে চাইলেই দোষ? আট টাকা দেখাতে এসেছে! এমন আট টাকা ঢের দেখেছি! কাঁড়ি কাঁড়ি পোড়া বাসন! অন্য সব বাড়িতে ঝি-চাকরদের দশহরা আর হোলিতে একখানা করে কাপড় দেয়—এ বাড়িতে সে পাটও নেই। চাকরির আবার অভাব! সেরিস্তাদারবাবুর বাড়িতে খোশামোদ করছে আমায় ন'টাকা মাইনেতে। নেহাত একটা পুরনো সম্বন্ধ আছে অনেক-কালের বলে ছেড়ে যাইনি এতদিন। সোজা বলে দিচ্ছি, দশহরা আর হোলিতে যদি আমায় কাপড় না দেন—তাহলে আর কাজ করব না এ বাড়িতে। মাসের প্রথমেই বলে দেন! তাতে গেরস্তেরও সুবিধে, আমারও সুবিধে।"

একবার আরম্ভ হলে, এ এখন থামবার নয়। শৈল কাতর মিনতি জানায়—"আচ্ছা বাপু এখন যা! বাবুকে একটু মুখহাত ধুয়ে জলটল খেতে দিবি, না তাও দিবি না?"

একখানা ময়লা নোট বদলে, রাগে গজগজ করতে করতে গুলটেনের-মা চলে গেল। তার উপর প্রশান্ত চিরকালই বিরক্ত। সংসারের ব্যাপারে সে সাধারণত কথা বলতে চায় না। কিন্তু আজ মাসপয়লার মেজাজে সে ব'লেই ফেলল।

"ছাড়িয়ে দিলেই হয় এটাকে! আজকাল আবার লোকের অভাব! রেফিউজি ক্যাম্পের হাজারটা লোক ঘোরাঘুরি করছে, কাজের খোঁজে। সেই, যে মেয়েমানুষটা সেদিন তোমায় বাঁশের ধুচুনি তয়ের করা শেখাচ্ছিল—সেটাতো ছ'টাকাতেই কাজ করতে রাজী, বললে না?"

"কে চাঁপা? রেফিউজি ক্যাম্পের লোক কে কেমন—জানা নেই, শোনা নেই! গুলটেনের মা হাজার হ'লেও পুরনো লোক! ওকে পুজোয় কাপড় দেবে না ছাই! ও ওরকম বলে!"

প্রশান্ত আর কথা বাড়াতে চায় না। স্ত্রীর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মনের, এই দিকটার সঙ্গে সে অপরিচিত। বয়স্থা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কাউকে শৈল বাড়িতে ঝি হিসাবে রেখে স্বস্তি পায় না।

সে রাত্রে খেলা জমেছিল ভাল। কেবল শেষ হাতে পার্টনার যদি রুইতন না খেলে হরতন খেলে, তা' হ'লে কিভাবে বদলে যেতে পারত খেলা, সেই কথাই ভাবতে ভাবতে প্রশান্ত বাড়ি ফিরছিল। দোরগোড়ায় এসে চমক ভাঙ্গল। এ কি? বাড়িতে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে! রোজ যখন সে ফেরে তখন বাড়ি নিষুতি। আগে শৈল হেঁসেলে রাত বারোটা পর্যন্ত তার জন্য ভাত আগলে বসে থাকত। বিয়ের পর থেকেই তা'র অম্বলের ব্যামো। আজকাল বেড়েছে। প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে মাথা

ধরে। চেহারা দিনদিনই শুকিয়ে দড়িপাকানো গোছের হয়ে যাচ্ছে। ত্রিশ বছর বয়সে গায়ে কোথায় একটু মাংস লাগবে, তা নয় ঠিক উলটো। কবিরাজমশাই বলেছিলেন, সকাল সকাল খাওয়া, সকাল সকাল শোয়', এই হচ্ছে এ রোগের একমাত্র ওষুধ। নিজের শ্রীহীন চেহারার কথা ভেবে, সে কবিরাজ মহাশয়ের নির্দেশ মেনে চলতে রাজী হয়েছে। রাতে ঘরের মধ্যে প্রশান্তর ভাত ঢাকা থাকে। তবে আজ জেগে কেন সবাই? প্রশান্তর মনের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। খোকার আবার অসুখ-বিসুখ হ'ল না কি? এইতো সেদিন অসুখ থেকে উঠল। আবার হয়তো এক খরচের ধাক্কা! দিনকতক সবাই ভাল থাকলেই তার ভিতরের মন বলে যে, আবার এক ঝাঁক ওষুধপথ্যির খরচ আসছে। গতমাসে শৈলর সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপনে একটা মোটা টাকা খরচ হয়েছে। কোথায় ভাবছিল এমাসে কিছু জমাতে পারবে পুজোর সময়ের জন্য। অমনি কি একটা দমকা খরচ আসবে! চিরকাল সে লক্ষ্য করে আসছে যে, টাকা জমানোর যোগাড় করলেই, আচমকা একটা খরচ ঘাড়ে এসে পড়ে—তা' সে বাসন চুরি গিয়েই হ'ক কিম্বা কোন শালাশালীর হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েই হ'ক।...

বাড়ি ঢুকে সে অবাক হয়ে গেল। প্রথমটায় চিনতে পারেনি। সাদা লম্বা দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করছেন। কোথায় যেন দেখেছে এঁকে আগে! চেনাচেনা মুখ!

'এই যে প্রশান্ত! তোমার ছেলেমেয়েদের বলছিলাম, স্কুল-বোর্ডিং-এর তোমার সেই 'নিখিলভারত কুলকুচা-প্রতিযোগিতার' কথা। এরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।..." এতক্ষণে চিনতে পেরে প্রণাম করল প্রশান্ত। অঙ্কর মাস্টার দ্বারিক মুখুজ্যে। বোর্ডিংএর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। ছেলেরা বলত দাড়ি মুখুজ্যে। তখন ছিল কালো দাড়ি; তাই চিনতে পারা যাচ্ছিল না এখন। ভদ্দরলোক দরকারের চাইতেও

বেশি কড়া। বোর্ডিংএ খাওয়াদাওয়ার পর আঁচানোর সময় একদিন কুলকুচো-কুলকুচো খেলার আবিষ্কার। কে কতদূর জল ফেলতে পারে কুলকুচো করে, এই দিয়েই খেলার আরম্ভ। জীবনে এই একটা খেলাতেই প্রশান্ত ফার্স্ট হতে পেরেছিল। এখনও বেশ মনে আছে—তার 'রেঞ্জ' ছিল মাটিতে দাঁড়িয়ে ন'ফুট ছ' ইঞ্চি; বোর্ডিংএর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দশ ফুট। তার কুলকুচোর নিশানাও ছিল অব্যর্থ; টার্গেট প্র্যাকটিস্এর সময় আগে থেকে বন্ধুদের মধ্যে সাড়া পড়ে যেত—এইবার আসছে প্রশান্তর বুলেট! নিজে অবধারিত পাবে জেনে, একটি চায়ের কাপ কিনে, প্রশান্ত "নিখিল-ভারত কুলকুচা-প্রতিযোগিতা" আহ্বান করেছিল। দাড়ি মুখুজ্যে ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁর বোর্ডিংএ এই অনাচারের খবর পেয়ে, তিনি প্রশান্তদের স্কুল থেকে রাস্টিকেট্ করার ভয় দেখান। সব মনে আছে। এর পর থেকে তার বিলক্ষণ রাগ ছিল দাড়ি মুখুজ্যের উপর। সেই দ্বারিক মুখুজ্যে!

"আপনি হঠাৎ? আমার ঠিকানা পেলেন কি করে?"

"ঠিকানা পাবার জন্য কি কম কষ্ট করতে হয়েছে! কৃতী ছাত্ররাই তো শিক্ষকদের বুড়ো বয়সের সম্বল। ভাবলাম একবার দেখা করে আসি প্রশান্তর সঙ্গে। হবে এখন সে সব কথা পরে।"

তাঁর ছাত্রের কৃতিত্বের বর্তমান বাজারদর মাগ্গিভাতা সমেত মাসিক একশ-আটাশ টাকা, এ খবর তিনি জানেন কিনা বোঝা গেল না। এই অবাঞ্ছিত অতিথি এখন কদিন থাকবেন কে জানে! বাড়িতে শোয়ার ঘর তো একখানি! শৈল ছিল রান্নাঘরে। তার কাছেই প্রশান্ত শুনল অতিথির এ বাড়িতে ঢুকবার ইতিহাস।...প্রথম যখন ভদ্দরলোক প্রশান্তর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকেন, তখন শৈল খোকাকে দিয়ে বলিয়েছিল যে বাবা বাড়ি নেই, ফিরতে রাত হবে। তিনি বাইরের সিঁড়ির উপর বসলেন। ঘণ্টাখানেক পর আবার চীৎকার—খোকা মাকে বলো

যে আমি তোমার বাবার মাস্টার মশাই ; আজ রাতে এখানে থাব।...
এরপর কি চোখকান বন্ধ করে থাকা যায় ? এনে বসালাম ঘরে।...

মাস্টারমশাই কেন যে তাঁর কৃতী ছাত্রদের এমন গরুখোঁজা করে খুঁজতে আরম্ভ করেছেন সে খবর জানা গেল খাওয়ার সময়।...তাঁর ছোটমেয়ের বয়স তেইশ-চাব্বিশ বছর। এত দিনে বিয়ের ঠিক হয়েছে এক জায়গায়। সেইজন্য তিনি টাকা সংগ্রহে বেরিয়েছেন। পুরনো ছাত্রেরা যে যা পেরেছে দিয়েছে। অনেকেই আবার তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে, পাড়া থেকে দুদশটাকা চাঁদাও সংগ্রহ করে দিয়েছে। উনি আন্দাজ দিলেন টাকা ত্রিশ-চল্লিশ আশা করেন এখান থেকে।...

এই রকমই একটা কিছুর ভয় করছিল প্রশান্ত। বৃদ্ধ অঙ্কর মাস্টার ছিলেন ; তাই আজও হিসেবে ভুল হয়নি তাঁর! একেবারে পয়লা তারিখে এসেছেন! হাতে কিছু নেই বলবারও উপায় নেই !

স্বামীস্ত্রীতে মিলে অনেক আলোচনার পর ঠিক হ'ল, এঁকে কালই বিদায় করতে হবে। নইলে উনি এখন এখানে থেকে চাঁদা তুলে বেড়াবেন পাড়ার লোকের কাছ থেকে। এখানে থাকা মানেই খরচ। অসুবিধাও অনেক। তার চেয়ে নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু টাকা থোকে ওঁকে দিয়ে কাল সকালেই বিদায় করে দেওয়া ভাল।

যেতে কি চান! পনেরটা টাকা দিয়ে অতি কষ্টে তাঁকে বাগ মানানো গেল কোন রকমে। তিনি তো গেলেন ; কিন্তু পারিবারিক বাজেটের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। এটাকে গুরুদক্ষিণা বলে ভাবতে পারলেও মনে তৃপ্তি পাওয়া যেত। কিন্তু দাড়ি মুখুজ্যের উপর সে যে ছিল হাড়ে চটা চিরকাল। একেবারে বিনা নোটিসে পনের টাকা খরচ ! শৈলই প্রথম কথা পাড়ল। সংসারের খরচ কমিয়ে এই পনর টাকা পুষিয়ে নেবার দায়িত্ব তারই।

"তবু ভাগ্য যে কারও কাছে হাত পাততে হয়নি। গুলটেনের মাকে ছাড়িয়ে দিলেই হয়। দু-মাসেই তাহলে টাকাটা উঠে আসবে।"

"না না। সে হয় না!"

"কেন বিনা ঝিতে কি আমি চালাইনি কখনও?"

"যখন চালিয়েছ, তখন চালিয়েছ। এখন কি তোমার সে-শরীর আছে! দেখ তো, হাতের সব শিরাগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আয়নাতে দেখেছ, তোমার চেহারা কি হয়ে যাচ্ছে দিনদিন?"

প্রশান্ত জানে যে শৈলর মনের এই দিকটা বড় স্পর্শ-কাতর।

শৈল রাজী হয় গুলটেনের মাকে ছাড়িয়ে চাঁপাকে রাখতে। মাসে দু'টাকা করে বাঁচবে। এ মাইনে নেবে ছ'টাকা করে। পনর টাকা পুরোতে লাগবে আট মাস। ততদিন এখানে রেফিউজি ক্যাম্প টিকলে হয়!...শোনা যাচ্ছে যে শীগগিরই এখানকার ক্যাম্প উঠে যাবে। ভালই হবে। চাঁপা-টাঁপার মত মেয়েদের বেশিদিন রাখা কোন কাজের কথা নয়।...আর দু'চার মাসের মধ্যে সে নিজেই বোধ হয় সেরে উঠবে।...

সদ্য বরখাস্ত করা গুলটেনের মায়ের চীৎকার শৈলর মনের খটকা আরও বাড়িয়ে দেয়। সদ্যনিযুক্তা চাঁপার উদ্দেশ্যে গালাগালি দিয়ে সে পাড়া মাথায় করে।

..."ঐ বজ্জাত পাকিস্তানী মাগী, চাল নেই, চুলো নেই, কোথায় বাড়িঘর তার ঠিক ঠিকানা নেই। এখানে এসে, লম্বালম্বা গপ্‌পো ঝাড়ে, ওর নাকি তিনশ বিঘা ধানের খেত ছিল। ছাই। গভর্ণমেণ্টকে ঠকিয়ে খাচ্ছে। ওদিকে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে খোরাকি নিচ্ছে, আবার এদিকে বাবু ভাইদের বাড়িতে কাজ নিয়ে আমাদের দানাপানি বন্ধ করছে। আরও কত রকমে তোরা রোজগার করিস জানি না বুঝি? যার চোখ আছে সেই দেখছে। গা ফুটে কুষ্ঠ বেরুবে, এই বলে

রাখলাম! গুলটেনের মায়ের কথা কখনও মিথ্যা হয় না। আর এই বাড়ির মাইজীকেও বলি—নিজের দেশের লোক পেয়েছ বলে কি চোখ বুঁজে তাকে রাখতে হবে নাকি? বাঙ্গালী হ'লেই বাঙ্গালীর দিকে টানে—এ জিনিস চিরকাল দেখে আসছি। নিজের দেশের ভিখিরীর দেখা পেয়েছ বলে কি, এখানকার এতকালকার সব সম্বন্ধ ধুয়ে পুঁছে ফেলে দিতে হবে? মুলুকের গাধার লাদও বুঝি এখানকার গোবরের চেয়ে ভাল?"...

সে-রাত্রে প্রশান্ত তাসে দশ পয়সা জিতেছিল। সেই জন্য মনটা বেশ ভাল ছিল। রাতে খাওয়ার পর সে ঘর থেকে বেরুল আঁচাতে বাইরের বরান্দায়। রাত নিষুতি। উঠনে জোছ্না ফুটফুট করছে। এক ঘটি জল রাখা রয়েছে বারান্দায়—শৈলর কোন কাজে ত্রুটি নেই। আঁচাবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল দাড়ি মুখুজ্যের বলা কুলকুচা প্রতিযোগিতার কথা। এখন ভাবলেও হাসি পায়। কি দিনই গিয়েছে সে সব! সব জিনিসেই অভ্যাসের দরকার, এখন বোধ হয় আধফুটও 'ক্লিয়ার' করতে পারবে না। উঠনের মাঝখানে শৈল এঁটো বাসনগুলো নামিয়ে রেখে দিয়েছে, ঝি ভোরে এসে মেজে দেবে বলে। কতদূর হবে বাসনগুলো এখান থেকে? ছ'ফুট হবে নিশ্চয়ই। এটুকু সে পারবে না কুলকুচা করে ফেলতে? নিশ্চয়ই পারবে।...ঠিক পেরেছে! অনায়াসে।...আনাড়ীরা জানবে কি করে, মাথাটা কত ডিগ্রি পিছন দিকে ঝোঁকালে কুলকুচোর বুলেট সব চেয়ে বেশি দূরে যায়; ঠোঁট দুটোকে মুড়ে তার পরিধি কতটা সঙ্কুচিত করলে, নিশানা ঠিক করতে সব চেয়ে সুবিধা হয়। আছে, এর মধ্যে আরও অনেক রকমের সূক্ষ্ম কারিগরি আছে। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী উঁচু করে মুখখানাকে, সে বাসনগুলোর দিকে কুলকুচোর পিচকিরি ছুঁড়লো। একেবারে 'বুল্‌স্‌-আই'!

ঠিক জায়গাটির মধ্যে গিয়ে পড়েছে! এত নির্মল আনন্দ সে বহুকাল পায়নি। ছেলেমানুষের মত সে উৎসাহ পাচ্ছে এ খেলায়।...ভাগ্যে শৈল এখন শুয়ে; নইলে এঁটোজল এমন করে সারা উঠন ছিটোতে দেখলে এখনই অনর্থ বাধাতো!...ঘটির জল ফুরিয়ে গেল। আচ্ছা। আবার কাল হবে। এখান থেকে ঐ বাসনগুলো কয় পা দূরে, সে হেঁটে মেপে দেখে। ন' পা! মোটে! কাল থেকে সে আবার কুলকুচো ছোঁড়া অভ্যাস করবে। প্রত্যহ সে চেষ্টা করবে আগের দিনের রেকর্ড ভাঙতে।...পঁচিশ বছর আগেকার বোর্ডিং জীবনের ছেলেমানুষ মনটিকে হঠাৎ যেন আবার খুঁজে পেয়েছে আজ।

দিনচারেক পর সন্ধ্যাবেলায় তাস খেলতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে প্রশান্ত। নজর পড়ল খোকার উপর। রান্নাঘরে একটি ছোট বালতির উপর পিঁড়ি চাপা দেওয়া আছে। সে সেই পিঁড়ির উপর মাথা কাত করে রেখে হাঁটু গেড়ে বসেছে।

"কি হচ্ছেরে খোকা?"

"মাছের টেলিগেরাপ শুনছি।"

"টেলিগ্রাফ!"

"হ্যাঁ। শিঙ্গি মাছের।"

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। বালতির ভিতর শিঙ্গিমাছ ঢাকা আছে। শোবার ঘর থেকে প্রশান্তর কথা শুনে ছুটে এল শৈল। দু'চার ঘা পড়ল খোকার পিঠে।

"যা মানা করি তাই! আঁষ ঘাঁটা! মাছের বালতির উপর শুয়ে আছেন। কিছু আর রাখলে না এরা! হাত ধুয়ে আয় আগে! আবার গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! দাঁড়াতো!..."

সামান্য কারণে শৈলর এত রাগ দেখে প্রশান্ত একটু আশ্চর্য হয়। মেজাজ দিনদিনই তিরিক্ষি হয়ে উঠছে! কিন্তু সে সবচেয়ে অবাক হয়েছে শিঙিমাছ দেখে। প্রশান্ত নিজে বাজার করে। সে তো আনেনি। যেসব মাছে আঁষ নেই সে মাছগুলো এ বাড়িতে তো আসে না। কেউ খায় না। আপত্তি সব চেয়ে বেশি শৈলরই!

"খোকার পেটটা ঠিক যাচ্ছে না। তাই আনালাম শিঙিমাছ। বাড়ির প্রত্যেকটি লোক আছেন যে যার নিজের মত! সব ধকল এসে পড়ে আমারই উপর!"

শৈলর চোখে জল এসে গিয়েছে। চোখের জল তার হাতধরা! এত মারধোর কান্নাকাটির কি হ'ল বুঝতে পারে না প্রশান্ত। ঠেস দিয়ে বলা কথায়, অকারণে নিজেকে দোষী দোষী মনে হয়। সত্যি! সংসারের সব ঝক্কি পোহাতে হয় বেচারী শৈলকেই! ঐ অস্থিচর্মসার শরীর নিয়ে উদয়াস্ত খাটছে! ছেলের যে শরীর খারাপ সে খবর পর্যন্ত রাখে না প্রশান্ত! নিজে থেকে বুদ্ধি করে রুগ্ন ছেলের পথ্যটা পর্যন্ত কিনে আনে না! তাই বুঝি এই অভিমান, এই ব্যথা শৈলর। এসব কোন বিষয়ে নজর নেই; তাস খেলতে বেরুচ্ছে এখন! সত্যিই সে স্বার্থপর! তাস খেলায় সে গড়ে মাসে দেড়টাকা করে হারে। যাদের সংসারে একটা দুটো পয়সার হিসাব করে চলতে হয়, তাদের পক্ষে কি নিজের ফুর্তির জন্য মাসে দেড়টাকা করে বাজে খরচ করা উচিত? না, সে আর তাস খেলতে যাবে না!

অনেককাল পর আজ প্রশান্ত সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে শুল।

কথা বলবে কি, শৈলর চোখের জল বাধা মানছে না। এত সোহাগ স্বামীর কাছে সে অনেকদিন পায় নি। তাস না খেলার জন্য না কি জন্য যেন প্রশান্তরও সেরাত্রে ঘুম কিছুতেই আসতে চায় না। মাঝরাতে একটু তন্দ্রা এসেছিল। কপালে কি যে ঠাণ্ডা মত লাগায় চমকে উঠল।

ও শৈল ! ঘুমের ঘোরেই বোঝে যে সে কপালে পয়সাটয়সা কিছু ঠেকিয়ে, সেটাকে রেখে দিয়ে এল। নিশ্চয়ই সি[illegible]য় পুজো দেবে। তাস খেলতে না যাওয়ায় বোধ হয় ভেবেছে যে স্বামীর একটু শরীর খারাপ হয়েছে।...শৈলর হাতে একটা ঝাঁঝটে ঝাঁঝটে গন্ধ।...আবার ঘুমে চোখ জুড়ে এল।

সকালে চোখেমুখে জল না দিয়েই চা খাওয়া প্রশান্তর চিরকেলে অভ্যাস। বারাণ্ডায় এসে মোড়াটার উপর বসতেই দেখে, গুলটেনের মা বাসন মাজছে। অবাক হবারই কথা। ছেলেমেয়েরা এসে বসেছে বারান্দায় ; বাবার চা খাওয়া শেষ হলে সেই কাপে করে তারা চা খাবে। কে প্লেট কে পেয়ালা নেবে তাই নিয়ে রোজ ঝগড়া। শৈল চা নিয়ে এল। খোকা হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠে।

"এ রাম ! বাবার কপালে সিঁদুর। এ রাম ! বাবা টিপ পরেছে।"

মনে মনে খুব লজ্জিত হ'ল প্রশান্ত। শৈলর মুখ দেখে বোঝে যে সে অপ্রস্তুত হয়েছে আরও বেশি। হবারই কথা—মেয়ে বড় হচ্ছে।

কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের সিঁদুরের ছোপটুকু মুছে ফেলল প্রশান্ত। তারপর গুলটেনের মায়ের দিকে চোখ ইশারা করে শৈলকে জিজ্ঞাসা করে—"একে আবার দেখছি ?"

"হ্যাঁ"। বলেই শৈল রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তার হাতে এখন অনেক কাজ ; কথা বলবার সময় নেই।...চাঁপা নিশ্চয়ই ঝগড়াঝাঁটি করে থাকবে ! যাক, শৈলর সংসার, শৈল বুঝবে !

সেদিন শনিবার। তিনটের সময় আপিস থেকে বাড়ি ফিরল প্রশান্ত। উঠনে প্রচণ্ড হইচই বেধে গিয়েছে। চাঁপা আর গুলটেনের মা ! কেউ কম যায় না। গুলটেনের মায়ের হিন্দীতে গালাগালি তবু বোঝা যায়,

কিন্তু চাঁপার পূর্ববঙ্গের গালাগালির ভাষা বোঝে কার সাধ্য। বারান্দায় বসে কাঁদছে শৈল। বাবুকে দেখে অন্যদিন মাথার কাপড় টেনে দিত চাঁপা; আর কোনদিন মাথায় কাপড় দেয় না গুলটেনের মা। এখন দেখা গেল ঠিক তার উলটো। 'এই! বাবু এসেছেন!' ব'লে গুলটেনের মা জিভ কেটে ঘোমটা টেনে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল। চাঁপা তার কাপড় চেপে ধরেছে।

চাঁপার কথার যা অল্পসল্প বোঝা গেল তার অর্থ দাঁড়ায় যে—বাবুর কাছ থেকেই সে ব্যাপারটার সুবিচার চায়। এই জন্যই সে অপেক্ষা করছে।...ছ টাকা মাইনের চাকরিতে মা তাকে বহাল করে তিন দিন পরে ছাড়িয়ে দিলেন! কোন অপরাধে তা সে জানে না। কাল সকালে সে শুধু মাকে বলেছিল, যে তাঁর মত ঝি-চাকরের উপর দরদ আর কোনও বাড়িতে সে দেখেনি। এঁটো বাসনগুলোয় জল ঢেলে ভিজিয়ে রাখলে ঝি-চাকরের মাজতে কত সুবিধে, এ কথা কি সব বাড়িতে খেয়াল রাখে? সে শুধু দোষের মধ্যে বলেছিল—মা আপনি রোজ রাত্রে এঁটো বাসনগুলোয় জল দিয়ে রাখেন,—দিনের বেলায় রাখেন না কেন? রোদ্দুরে বাসনগুলো শুকিয়ে খরখরে হয়ে থাকে। মা শুধু জিজ্ঞাসা করলেন রাতে বাসনে জল দেওয়া থাকে না কি? তার পরেই চক্ষু রক্তবর্ণ। বললেন—আজ ওবেলা থেকে আর কাজ করতে হবে না; পাকিস্তানী মেয়েদের জানা নেই শোনা নেই; এর চেয়ে চেনাশোনা গুলটেনের মাই ভাল।......বেশ কথা। রাখতে ইচ্ছা হয় রাখবে, ইচ্ছা না হলে রাখবে না। কিন্তু কি দোষ তুমি আমার পেলে মা তিন দিনের মধ্যে যে তোমার চোখে আমি বিষ হয়ে গেলাম? যাকগে! গরিবের আবার মান অপমান! ভগবানই আমাদের মেরেছে; তুমি আর আমার তার চেয়ে বেশি কি করবে! মা বলেছিল আজ এসে চারদিনের মাইনেটা নিয়ে যেতে! আজ মাইনে দেবার পর মা বললে, চারটী

মাছের ঝোলভাত খেয়ে যাও চাঁপা।......ভাত খাওয়ার পর খোকাবাবু তাঁকে গল্পে গল্পে জিজ্ঞাসা করেছে, সিঁদুর মাখানো শিঙ্গিমাছ খেতে তেতো, না ভাল?...সিঁদুর মাখানো শিঙ্গিমাছ! ওয়াক দিয়ে বমি আসবার যোগাড়! সিঁদুরে যে পারা থাকে! পারা খেলে যে গা দিয়ে কুষ্ঠ বার হয়।...মায়ের কাছে চেঁচামেচি করতেই গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এল গুলটেনের মা। সে তুকতাক জানে। নিজে শিঙ্গিমাছ এনে মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। মাইজীকে বলে সেই মন্ত্রপড়া শিঙ্গিমাছ তাকে খাইয়ে দিয়েছে। আরও কি কি করেছে সে-ই জানে। বলছে যে আর কেউ চাঁপার দিকে ফিরেও তাকাবে না, গায়ে কুষ্ঠ বেরুবে; যেমন পরের চাকরি খেতে গিয়েছিলি তেমনি শাস্তি!...চাঁপার কপালে কি এও ছিল! কি করেছিল সে যে সবাই মিলে তাকে এই বিদেশ বিভুঁয়ে সিঁদুরমাখানো শিঙ্গিমাছ খাইয়ে দিল! সে এখনই গিয়ে ক্যাম্পের ডেপুটি সাহেবকে বলে গ্রেপ্তার করাবে গুলটেনের মাকে! বাবু আপনি এর বিচার করে দিন।...

চাঁপা বাবুর পায়ে মাথা কোটে।

তাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে প্রশান্ত। দুটো টাকা আর একখানা পুরনো শাড়ী খেসারত দিয়ে তাকে অতিকষ্টে বিদায় করতে হয়। চাঁপা চলে গেলেও ভয় যায় না—সে আবার ক্যাম্পে গিয়ে এ নিয়ে হইচই না বাধায়! তাহ'লে কেলেঙ্কারির একশেষ!

শৈল অঝোরে কাঁদছে।

গুলটেনের মায়ের পরামর্শে, তার কপালে ঠেকানো শিঙ্গিমাছ চাঁপাকে খাওয়ানো, ছেলেমানুষি না? কিন্তু কি বলবে প্রশান্ত শৈলকে? স্ত্রীর চেয়েও বেশি ছেলেমানুষি সে নিজে করেছে এঁটো বাসনগুলোর উপর কুলকুচো-কুলকুচো খেলা করে।

ফেরবার পথ

বামুনের বরাতই অমনি। আমার লণ্ডন থেকে ফেরবার দিনের কথা বলছি। বঙ্গে আসবার দিনও কপাল ছিল সঙ্গে। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ কিজন্য যেন সেদিন লণ্ডনে ট্যাক্সিওয়ালাদের ধর্মঘট হয়ে গেল। দশটার সময় সাউথহ্যাম্পটন যাবার বোটট্রেন ছাড়বে ওয়াটারলু স্টেশন থেকে। আর দেরী করা চলে না। কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে লটবহর এনে পৌছনো গেল কাছাকাছি টিউব স্টেশনে। অফিস কাছারীর সময়ের ভিড়টা আজ দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে, ট্যাক্সিধর্মঘটের কল্যাণে। এত জিনিসপত্র নিয়ে টিউবট্রেনে ওঠা লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু উপায় কি? এই সর্পিল 'কিউ'এর আরম্ভের জায়গাটিই এখন এতগুলি ঘড়িঅন্তপ্রাণ লোকের সাধনার লক্ষ্য। সম্মুখের প্রৌঢ়া অফিসযাত্রিনীটি আমার অবাধ্য সুটকেসের গুঁতো খেয়ে পিছন ফিরে তাকালেন বুঝতে পারছি। চোখোচোখি হয়ে যাবার ভয়ে মরিয়া হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনি বোধ হয় বিদেশীটির সুটকেসে এস. এস 'ক্যাজার্ক'র কেবিনের লেবেল আঁটা দেখে চোখের অগ্নিবাণ প্রত্যাহার করলেন। দুহাতের সুটকেসের বোঝা হাজার মণেরও উপর ভারি হয়ে উঠেছে। একাল হ'লে তুলোর বস্তার বলদকে ইসপ্ জলে না চুবিয়ে 'কিউ'এ দাঁড় করাতেন। ঘাড়ের উপর মধ্যে মধ্যে কিসের যেন বুরুশের মত ঘসটানি লাগছে; ভারতবর্ষ হলে নিঃসন্দেহে ধরে নিতাম যে, আমার পিছনের লোকটি একজন শ্মশ্রুল শিখ। যাক, ভিড়ের চাপের তবু একটা সুবিধা আছে—বিনা চেষ্টাতে লক্ষ্যে পৌছে যাওয়া যায়। তারপর

গাড়ির নড়ানি-চড়ানিতে লব্ধ খালি স্থানটুকুর আকৃতি নেয় মানুষের শরীর—ঠিক জল যেমন করে পাত্রের আকৃতি নেয়। গাড়ির ভিড়ে কি ভারতের লোককে কাবু করতে পারে? তাই একটু খিতোবার পর চারিদিক ঠাহর করে দেখবার চেষ্টা করি।...খানিক দূরের ঐ তুইজন নিশ্চয়ই ভারতের লোক! লণ্ডনে ভারতবর্ষের লোক এত বিরল নয় যে, সেদিকে আবার তাকিয়ে দেখতে হবে, বরঞ্চ না তাকানোটাই নিয়ম। কিন্তু আমার কৌতূহল জাগলো এঁদের স্যুটকেসগুলোর উপর নজর পড়ায়। তুইজনের একজন ছোকরাগোছের যুবক আর একজন মহিলা—বেশ দশাসই চেহারা। তুজনেই সুশ্রী। এঁদের স্যুটকেসের উপরও "ক্যাজার" জাহাজের লেবেল মারা। বুঝি যে আমরা একেবারে এক গোত্রের লোক, এঁরাও আমারই মত ট্যাক্সি না পেয়ে টিউবে উঠেছেন বাধ্য হয়ে! তুজনে গল্প করছেন—যুবকের হাত মহিলাটির হাতের মধ্যে। এত রঙ মেখেছেন গালে মহিলাটি!...

নামবার সময় চোখোচোখি হয়ে গেল। একসঙ্গে জাহাজে তুই সপ্তাহের উপর কাটাতে হবে—এখন থেকে আলাপ করে নিলে বেশ হত। প্রাথমিক পরিচয়ের উদ্দেশ্যে, একটু হেসে ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম যে, আমিও তাদের জাহাজেরই যাত্রী। অপ্রত্যাশিত!... ভদ্রমহিলা যেন দেখেও দেখলেন না।...আমি কি বলতে চাচ্ছিলাম বুঝতে পারলেন না নাকি? হয়ত অন্য একটা কথা ভাবছিলেন।...না না স্পষ্ট বুঝেছেন। বুঝেও না বুঝবার ভান করলেন! কেন এই অশিষ্ট আচরণ? বিনা 'ইনট্রডাকশন'এ কারও সঙ্গে কথা বলতে চান না? ইংরাজের চাইতেও বেশী ইংরাজ হয়ে গিয়েছেন নাকি এদেশে এসে? ঢের ঢের ইংরাজ দেখেছি তোমাদের মত! ইংরেজগিরি ফলাতে এসেছে!...কেন যেচে এঁদের কাছে ছোট হতে গিয়েছিলাম! সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল নিজের উপর।

তাঁদের দুজনের মধ্যে চোখের ইশারায় কি যেন বলাবলি হল। আমি গিয়ে উঠলাম 'এস্কালেটার'এ। তাঁরা বোধ হয় ইচ্ছা করেই সিঁড়িতে উঠতে দেরি করলেন—যাতে আমি খানিকটা আগিয়ে যাই।

এই অপমানের কথাটা ভুলবার জন্য সারা বোটট্রেন নিজের মনকে প্রবোধ দিই—হয়ত ভদ্রমহিলা যাবেই না; শুধু ঐ ভদ্রলোকটিকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছেন; তাই আর কোনও যাত্রীর সঙ্গে নূতন করে পরিচয় করতে চাইলেন না; এও হতে পারে যে, বিদায় বেলায় তাঁদের মধ্যে আর তৃতীয় ব্যক্তিকে আনতে চান না।···

যাক গে দরকার কি অপরের কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে।···পাশের স্টল থেকে একখানা বই কিনে নিয়ে, জাহাজে উঠবার লাইনে গিয়ে দাঁড়াই।

"গুড় মর্নিং সার!"

পৌঁছুতেই মুখে একগাল হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা করলে কেবিন-স্টুয়ার্ড। টুরিস্ট ক্লাস কেবিন। চারজনের সিট। সব ঠিক আছে—একেবারে ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম, মায় রঙের আর বীজাণুনাশক ওষুধের ভাপসা গন্ধটা পর্যন্ত। আমার নীচেই ৩১৩ নম্বরের বার্থ—কার্ডে নাম লেখা রয়েছে মিস্টার এস সিং। বাঙালী নাকি? ভদ্দরলোক এখনও পৌঁছন নি। অন্য দুটো বার্থে দুজন ফিরিঙ্গি সাহেব, নিজেদের জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। গোয়ানিজ কেবিন স্টুয়ার্ডের নাম লেখা দেওয়ালের কার্ডে—লেসার্ডো। প্রত্যেকের বার্থের উপর একখানি করে জাহাজের যাত্রীদের নামের তালিকা দোরগোড়ায়। আবার শুনলাম, লেসার্ডোর সাধা গলায় 'গুড মর্নিং সার'! বুঝলাম আমাদের কেবিনের চতুর্থ বাসিন্দে আসছেন। তারপরই দেখলাম ৩১৩ নম্বরকে। হায় রে কপাল! ইনিই শেষকালে

আমার কেবিনমেট ! টিউবট্রেনের সেই ছোকরা যুবকটি ! বেশ কয়েক মিনিট ভুলে ছিলাম এঁদের কথা ; কিন্তু নিস্তার কি আছে ? এখনও লোকটি আমাকে আগে দেখেছে, সে ভাব দেখাল না। মন আরও বিরূপ হয়ে ওঠে। এই অভদ্র লোকটির সঙ্গে এতদিন এক ঘরে কাটাতে হবে ! তুমি আমাকে কেয়ার কর না তো আমিও তোমাকে কেয়ার করি না! প্যাসেঞ্জারের তালিকাটা তুলে নিই ; 'ডেক'এ গিয়ে সবার নামধামগুলো একবার দেখতে হবে। এই আরম্ভ হয়ে গেল সময় কাটানোর খোরাক যোগানোর পালা—জাহাজের যাত্রীর একমাত্র কাজ।

'ডেক'এ গিয়ে দেখি খুব ভিড়। রেলিঙের তো কাছে পৌছবার জো নেই। অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ। টুরিস্টশ্রেণীর যাত্রীদের প্রায় অর্ধেক দেখি ভারতবর্ষের লোক—বম্বেতে নামবে। ইংলণ্ডে থাকতে না পেরে ফিরছে হতাশ অ্যাংলোইণ্ডিয়ানের দল। নেণ্ডিগেণ্ডিদের ড্যাডিম্যামি সম্বলিত কলরব তাড়া দিয়ে থামিয়ে ক্রমঅপসৃয়মান ইংলণ্ডের কূল দেখছেন। সেই ছোটবেলা থেকে শোনা, রেলওয়ে ইউরোপীয়ান ইনস্টিটিউটের বিলিতী বিয়ার খেতে খেতে শোনা, রেলের ইউরোপীয় তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় চাপাটি খেতে খেতে শোনা, মিশন হাসপাতালের লেডি ডাক্তারের কাছ থেকে শোনা, ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো শিয়াল শিকারের ছবি দেখে জানা 'হোম' বড় হতাশ করেছে। আমল দেয়নি। অন্যান্য ভারতবাসীর চেয়ে বেশি আপন করে নেয়নি।…কিন্তু যতই দাগা দিক ইংলণ্ড, ইংলণ্ড! তবু ফিরতে হবে সেই কুকুরের খুপরি ভারতে—ভাবলেও মন খারাপ হয়ে যায়।…

ভারতের ছাত্ররাও দেখছে। বাড়ি ফিরবার আনন্দের চেয়ে ইংলণ্ড ছাড়বার দুঃখ কম নয়। সে সম্পূর্ণভাবে ইংলণ্ড উপভোগ করতে পারে নি—পড়াশুনার চাপে নয়, দূর দেশে পড়তে আসবার দায়িত্বে। বাড়িতে ল্যাণ্ডলেডির মন যুগিয়ে চলা, ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট থিসিসের আতঙ্কে

প্রোফেসারের মর্জি বুঝে কথা বলা, দেশ থেকে বাবার উপদেশসম্বলিত চিঠি, এর মধ্যে নিরঙ্কুশ উপভোগের অবকাশ কোথায়? আবার দেশে গিয়ে আরম্ভ করতে হবে চাকরির জন্য ধরাধরির পালা—কতকগুলো থার্ডরেট লোককে যেগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরাজীটা পর্যন্ত বলতে পারে না! এত কাঠখড় পুড়িয়ে যে ইংলণ্ডকে সে ভালবাসতে শিখেছে, তার 'শোর' দেখতে দেখতে মন উদাস হয়ে ওঠে বইকি। এর পরই খোঁজ নিতে হবে নামজাদা হোমরা-চোমরা কেউ প্রথম শ্রেণীতে আছেন কি না।…

অস্ট্রেলিয়ার লোক চলেছে বাড়ি, ইংলণ্ডের তীর্থ সেরে। রৌদ্রহীন ইংলণ্ড তার ভাল লাগেনি। ইংলণ্ডের লোক তার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্বীকার করেছে, কিন্তু আপন করে নেয়নি। ঐ শুনতেই ইংলণ্ড কমনওয়েলথের গুরুভাই! সে ক্রিকেটে গুরুমারা বিদ্যে শিখেছে, তবু ইংরাজ তাকে মনে করে জঙ্গলের দেশের অমার্জিত লোক। এ ব্যবধান ঘুচবার নয়। কিন্তু তাই বলে কি, পিতৃপুরুষদের আদিভূমি ইংলণ্ডকে একবার শেষ নজর দেখবে না!

অনেকগুলি আছে ইংরাজ। এরা অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনারের অফিসে "গোল্ডরাশ"-এর ছবি দেখেছিল, ফ্রেমে বাঁধানো। তারপর উপর্যুপরি কয়েক রাত অস্ট্রেলিয়ার সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখে। ইংলণ্ডে জীবন-যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা না করে উঠতে পারলেই অমন হয়। শেষকালে একদিন দুর্গা বলে কলোনির খরচে ভাগ্যকে জব্দ করবার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। এরা তো ভারাক্রান্ত মনে দেশের বিলীয়মান তীর দেখবেই। শেষ গির্জার চূড়োটা যতক্ষণ না মিলিয়ে যায় কুয়াশার মধ্যে ততক্ষণ তাকিয়ে থাকবে।

এ ছাড়া আছে গুটিকয়েক সিংহল আর মালয়ের লোক। সংখ্যায় এত মুষ্টিমেয় যে তারা কোনও হিসেবের মধ্যে পড়ে না। জাহাজের

বর্তমানের রাজামুখো দিককার রেলিংটায় যত লোক রয়েছে, প্রত্যেকের চিন্তা আলাদা; ডাঙায় থাকাকালীন নিজের নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এরা এখনও ভুলতে পারেনি।

প্যাসেঞ্জার লিস্টের নাম ও গন্তব্য স্থানগুলো দেখতে দেখতে মনে মনে কল্পনা করবার চেষ্টা করি এর মধ্যের কোন নামটি সম্মুখের কোন লোকটির; ভারতীয়দের মধ্যে কে কোন প্রদেশের লোক; অস্ট্রেলিয়ান কোন কোনটি? পরিচয়ের পর জানা যাবে ধাঁধার উত্তর ঠিক মিলেছে কিনা। সিংহলের ছেলেদের চেহারা বাঙ্গালীদের থেকে আলাদা করা এইটাই সবচেয়ে শক্ত। নিজের ছাপা নামটা লিস্টের মধ্যে দেখতে বেশ লাগে; এতেও যেন একজন পূর্ব পরিচিত যাত্রীর নাম খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। আমার নামের নীচেই লেখা—৩১৩ নং বার্থ, মিস্টার এস সিং।

জাহাজ কোম্পানি যদি নিয়ম করত যে সব প্যাসেঞ্জারের পুরো নাম দিতে হবে বার্থের জন্য দরখাস্তে তাহলে বেশ হত। একই আদ্য অক্ষর সম্বলিত নামের দুজন যাত্রী থাকলে জাহাজ কোম্পানিরই কত অসুবিধা হতে পারে। আর এমনই আমার নীচের বার্থের প্যাসেঞ্জারের মুখ যে চিনবার উপায় নেই কোন প্রদেশে বাড়ি। ফরসা, টিকলো নাক, সুশ্রী যুবকের চেহারা সব প্রদেশে একই রকম; শুধু পাঞ্জাবের দিকে একটু বেশি, অন্য প্রদেশগুলোতে সংখ্যায় কম। এই যা। অর্থাৎ দুই জায়গারই সাধারণ চেহারা না হলে ধরবার উপায় নেই কে কোথাকার লোক। আবার সিং উপাধিটাও এমন যে উত্তর ভারতে হেন জায়গা নেই যেখানে এই সিংওয়ালা লোক নেই!...৩১৪ নম্বর বার্থ মিস্টার মর্লি বম্বে।...৩১৫ নম্বর বার্থ, মিস এস দেবী বম্বেতে নামবেন। বাঙ্গালী নাকি? দেবী উপাধি অবাঙ্গালী মহিলারও হতে পারে। মিস যখন তখন ছাত্রী হওয়াই সম্ভব। যাক্, মেয়েটির তবু বিশেষত্ব আছে—বছর

কয়েক বিলাতে থাকবার পরও নামের শেষে দেবী লিখবার রুচি হারাননি।

চমকে উঠেছি! কানের কাছে লাউডস্পিকার।

"Attention please! Attention please! আজ 'রানিং ডিনার'। যে টেবিলে ইচ্ছা বসে খেতে পারেন। তারপর রাত সাড়ে আটটার সময় বি·ডেকে হেড স্টুয়ার্ডের কাছে আপনার স্থায়ী টেবিল বেছে দিয়ে যাবেন। আজ রানিং ডিনার; যে টেবিলে ইচ্ছা··· থ্যাঙ্ক ইউ!"

ডিনারের পর সে রাত্রে টেবিল বাছবার জন্য লাইনে দাঁড়াতে আর ইচ্ছা করল না। জাহাজে এমন কোনও পরিচিত বা পরিচিতার সন্ধান এখনও পাইনি, যা'র সঙ্গ টেবিলে না পেলে খাবার জিনিসে স্বাদ পাব না। জাহাজে চড়তে যখন দিয়েছে, তখন খাওয়ার একটা জায়গা দেবেই জাহাজ কোম্পানী।

তাড়াতাড়ি কেবিনে এসে শুয়ে পড়লাম। অন্য তিনজন কেবিনমেট তখনও ঘরে ঢোকেন নি। বোধহয় খাবার টেবিল বাছবার লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁরা সে সময়। নিজের বার্থে উঠবার সময় লোহার সিঁড়িটা ব্যবহার না করে নীচের বার্থটার উপর পা দিয়েই উঠলাম। ঐ হাড় অভদ্র লোকটার বার্থে পা রাখতে আবার কুণ্ঠা!

পরদিন ভোরে লেনার্ডো বেড টি নিয়ে এসে নীচের বার্থের দিকে বার কয়েক 'গুড় মর্নিং' সার, বলতে সিংহ পুঙ্গব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন "Shut up, will you!" লেসার্ডো বহুঘাটের জলখাওয়া ঘড়েল। উত্তরে অভ্যাসমত 'ইয়েসসার' বলেই উঁচুতে আমার কাছে চায়ের ট্রে ধরল। মৃদুহাসি, চোখ ইশারা ও হাত দিয়ে বোতল থেকে মদ ঢালবার মুদ্রা দেখিয়ে লেসার্ডো আমায় বুঝিয়ে দিল—রাতে যে চলেছে খুব; এখনই ঘুম ভাঙবে কি!

প্রাতরাশ করতে যাওয়ার সময়ও দেখলাম ভক্তর লোক ঘুমুচ্ছে। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সারা ঘরের লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। লক্ষ্য করছি দেশের লোককেই সকলে পেতে চায় খাবার টেবিলে —পূর্ব পরিচিত না হলেও। মালায়ার লোকেরা সবাই বসেছে এক টেবিলে। যে টেবিলে বসলে ঘুলঘুলি দিয়ে সমুদ্র দেখা যায় সে টেবিলের লোকদের গর্বিত দৃষ্টি লাইনের প্রথমে দাঁড়িয়ে কেমন কাজ গুছিয়ে নিয়েছি দেখ, এই ভাব। কবির মত ঘটা করে সমুদ্র দেখবার ভান করছে—যেন ঐ ঘুলঘুলিটা ছাড়া জাহাজের অন্য কোন জায়গা থেকে সমুদ্রে সাক্ষাৎ পাওয়া শক্ত। মনে মনে ঠিক করে নিই নিশ্চয়ই ওরা অস্ট্রেলিয়ান।

না নেই তো! টিউবট্রেনের সেই মহিলাটি তাহলে ঠিকই আসেন নি এ জাহাজে। কৌতূহল জিনিসটা মাছির চেয়েও নাছোড়বান্দা। যদি এমন হয় যে তিনিও ব্রেকফাস্ট খেতে আসেন নি, তাহলেও তাঁর আর তাঁর সঙ্গীর দুখান পাশাপাশি চেয়ার তো খালি থাকত কোনও টেবিলে। তেমনি টেবিল দেখছি কৈ সারা ঘরে?

উপরের ডেকে যাবার আগে নিজের কেবিন হয়ে গেলাম। দেখি প্রত্যেকের বিছানার উপর একখানা করে ছাপা কাগজ রেখে গিয়েছে লেসার্ডো—জাহাজের প্যাসেঞ্জার লিস্টের সংশোধন পত্র।

"টুরিস্ট ক্লাস—বার্থ নম্বর ৩১৫—প্যাসেঞ্জারের নাম—মিস এস দেবীর স্থানে, রাজকুমারী এস দেবী পড়ুন। ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।"

ভেবেছিলাম অপরের কথার মধ্যে থাকব না। জাহাজ কোম্পানী সে সঙ্কল্প রাখতে দিচ্ছে কই। যে কোনও রাজকুমারীর গতিবিধিই তো খবরের কাগজে আগ্রহ নিয়ে পড়বার মত সংবাদ। তার উপর আবার সেই রাজকুমারী প্রথম শ্রেণীর যাত্রী না হয়ে যদি টুরিস্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার

হন আমাদের মত, তাহলে তো কথাই নাই। যতই সাম্যবাদের বুকনি দিই না কেন, রাজপরিবারের লোকের নামে মনের উপর একটুখানি সুড়সুড়ি লাগবেই লাগবে।

কে ইনি? অদ্ভুত রাজকুমারী তো! টুরিস্ট ক্লাসে যান, অথচ নিজে যে রাজকুমারী এ কথাটা সকলকে জানাতে ভোলেন না। চেপে গেলেই ছিল ভাল—অন্তত আমরা তো সাধারণ বুদ্ধিতে তাই বুঝি। সংশোধনপত্র বেরুবার অর্থই হচ্ছে যে কাল ভদ্রমহিলাটি লিস্ট দেখামাত্র রেগে আগুন হয়ে ছুটেছিলেন জাহাজের অফিসে। মানবিক দুর্বলতা এত বেশী কেন এই দেবীর ভিতর? কে এই ভদ্রমহিলা? এঁকে দেখেছি নাকি খাওয়ার ঘরে? এঁকে চিনতে না পারায় মন খুঁতখুঁত করে।

মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি কানে আসে—রাজকুমারীর কথা—ডেকএ, লাউঞ্জে, খেলার জায়গায়, অফিসের সম্মুখে, নাপিতের দোকানে, সব জায়গায় তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন। কে তিনি? কেন তিনি টুরিস্ট ক্লাসে যাচ্ছেন? হুবহু যে প্রশ্নগুলো আমার মনে জেগেছিল, সেইগুলোই শুনি সকলের মুখে মুখে। শাস্ত্রে বলে বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই; তাই বোধহয় সকলে নিরঙ্কুশ পরচর্চায় মেতেছে—ইংরাজ পর্যন্ত।

ভারতবাসী এক আধজনের সঙ্গে পরিচয় হতে আরম্ভ হয়। বিলাত যাত্রার সময় পরিচয় আরম্ভ হয়—"কি আপনার প্রথমবার নাকি?" এই কথা দিয়ে। ফিরতি-মুখো আভিজাত্য আলাদা। "কতদিন পর ফিরছেন? দু বছর? আমার তো মশাই এক যুগ হয়ে গেল। প্রথম এক বছর লাগে ওদের কথা বুঝতে। আর এক বছর লাগে ওদের বুঝবার মত করে কথা বলা শিখতে। তার পরের বছর থেকে ইংলণ্ড সম্বন্ধে জানতে শেখে লোকে।" অর্থাৎ ইংলণ্ড সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। এটা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল; নইলে ৩৮৫ নম্বর বার্থের

প্যাসেঞ্জারের নাম সংশোধনের গল্পটা জমবে না ভাল করে। টুরিস্ট ক্লাস পরিবারের মধ্যে একজন থাকবেন অপরিচিতা, এ অসহ্য।

এঁর সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করা আবার একটা শক্ত কাজ? "Easy Watson!" —শার্লক হোমসের ধরনে পাইপ টেনে মিস্টার রামস্বামী চলে গেলেন স্টুয়ার্ড মহল থেকে খবর আনবার জন্য। খানিক বাদে সংবাদ আনলেন যে রাজকুমারীর কেবিনে ঐ একটাই বার্থ। ঐ ঘরটায় এতদিন কতকগুলো যন্ত্রপাতি থাকত। এইবারকার ট্রিপে জাহাজ কোম্পানী সেখানাকেও ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। কাল রাত একটা পর্যন্ত রাজকুমারী 'বার' এ বসে মদ খেয়েছেন। কিন্তু তখন কি আর কেউ জানে যে তিনি রাজকুমারী।

রাত একটা পর্যন্ত মদ খেয়েছেন! কথাটা শুনতে সে রকম মিষ্টি না হলেও এতে ৩১৫ নম্বর বার্থের চটক আরও বেড়েছে। অনেকে এই মদ খাওয়ার সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার একটু-আধটু সুযোগ নিশ্চয়ই পাবে।...জাহাজে নাচের ব্যবস্থা আছে। যারা অল্পস্বল্প নাচতে জানে, তাদের মনও একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। আজকের প্যাসেঞ্জার লিস্টের সংশোধনপত্র এক রহস্যের সোনালি তবকে মুড়ে দিয়েছে মিস এস দেবী নামটিকে। ঘুমুচ্ছেন রাজকুমারী হয়ত এখনও, এই সদ্যজাগ্রত পুরীর ঘুমকুঠুরিতে। কত অনুচ্চারিত প্রশ্ন ঠেলে উঠে আসছে সকলের মনের উপর! বেরুবে, বেরুবে, আস্তে আস্তে সব খবর বেরুবে! এই সংবাদের ব্ল্যাক আউটের বাজারে যে খবরটুকু স্টুয়ার্ড মহলের রন্ধ্রপথে ছটকে বার হতে পেরেছে, তাই নিয়েই এখনকার মত সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ...৩১৫ নম্বর বার্থ! ৩১৫ নম্বর বার্থ। সকলের মুখে ঐ একই কথা। এতগুলি বিভিন্নমুখী মন মুহূর্তের মধ্যে ৩১৫ নম্বরের সুতোয় গাঁথা হয়ে গেল। নিজের নিজের বার্থ নম্বরের চাইতেও এ নম্বর মুখস্থ হয় তাড়াতাড়ি, তার হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গেই। লাউঞ্জ

স্পিকারে অমুক নম্বর প্যাসেঞ্জারকে জাহাজ অফিসে একটা জরুরী কাজে ডাকতেই লক্ষ্য করলাম, একজন ভদ্রলোক নলচে আড়াল দিয়ে পকেট থেকে নিজের বার্থনম্বরের টিকিটখানা অর্ধেক বার করে একবার দেখে নিলেন। ওটা সড়গড় হতে দু'একদিন সময় নেবে।

দুপুরে লাঞ্চের সময় আমার নীচের বার্থের মিস্টার সিংকে দেখলাম খাবার ঘরে। সে টেবিলের বাকি সকলেই ইংরাজ! হঠাৎ অবাক হয়ে গেলাম! সেই মহিলা! টিউবট্রেনের সেই ভদ্রমহিলাটি। ইনি আর মিস্টার সিং দু'জনে এক টেবিলে জায়গা করে নেননি কেন? আশ্চর্য! আর এখন ব্যাপারটা রহস্য মাত্র নেই; কৌতূহল দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়েছে। দু'জনের কেউ পরস্পরকে চিনবার লক্ষণ তো দেখালেন না!...

এতক্ষণে আমার খেয়াল হয় যে খাবার জিনিস মুখে পুরবার পর কাঁটাটা আর নামানো হয়নি। মিস্টার রামস্বামী জিজ্ঞাসা করছেন—বলুন তো মিস্টার জ্যোতিষী এই ঘরের মধ্যে রাজকুমারী কে?

জাহাজ ছাড়বার আগে স্টল থেকে যে বইখানা কিনেছিলাম, সেখানা হস্তরেখা গণনার উপর একখানা রদ্দি বই। আমার অপরাধের মধ্যে খানিক আগে ঐ বইখানাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছিলাম 'ডেক' এ বসে। রামস্বামীর প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে যাই। অন্নসমস্যা নেই বলে কি জাহাজে সমস্যার হাত থেকে নিস্তার আছে! রাজকুমারীকে সনাক্ত করা যায়নি এখনও! এতবড় দায় এখন আমাদের জাহাজ-সমাজের মাথার উপর; আর আমি কিনা ভাবছি টিউবট্রেনের সেই অশিষ্টা মহিলার কথা!

মিস্টার রামস্বামী দেখিয়ে দিলেন যে ভদ্রমহিলাকে আমি এতক্ষণ দেখছিলাম, তিনিই রাজকুমারী।—উনিই রাজকুমারী? এস, দেবী? ৩১৫ নম্বর?

Sure ?

রামস্বামী জানিয়ে দেন যে তাঁর খবর পাকা। না না এ কি করে সম্ভব হয়! টেউরিস্টেদের সেই মহিলা রাজকুমারী হতেই পারেন না! "তার চাইতে বলুন না কেন যে আমার নীচের বার্থের মিস্টার সিং হনোলুলুর রাজপুত্তুর! সে কথা বরঞ্চ বিশ্বাস করতে রাজী আছি। মিস্টার রামস্বামী আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।"

অসীম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্লেটে ছুরি ঠুকে সংবাদদাতা উত্তর দিলেন যে তাঁর দেওয়া প্রত্যেক খবরের প্রত্যেক টুকরো নির্ভুল। আশপাশের লোকদের উপর নজর পড়ায় বুঝি যে প্লেটখানি টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও কেউ সেদিকে ফিরে তাকাতো না, তখন। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে সবাই দেবীদর্শন করছে। মুহূর্তের মধ্যে সকলে জেনে গেল কি করে, যে তিনিই রাজকুমারী ? অদ্ভুত জাহাজের কাণ্ড! সকলে খুটিয়ে দেখছে···কি সুন্দরভাবে রাজকুমারী স্থপ খাওয়ার সময় চামচখানি তুলে ধরছেন ঠোঁটের কাছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভাল লাগছে না তাঁর স্থপটা খেতে। ···কি আপদ! সমুখের টেবিলের লোকটি মাথাটি সরিয়ে এমনভাবে রাখল যে রাজকুমারীর মুখখানি ঢাকা পড়ে গেল! খাবার টেবিলের "ম্যানারস্" জানে না লোকগুলো!···ঐ হেসেছেন,···হেসেছেন রাজকুমারী! মৃদু হেসে পাশের সাহেবটিকে কি যেন বললেন!···

মৃদুগুঞ্জনে ভরে যায় ডাইনিংহল। সকলেই ফিসফিস করে কত কি বলাবলি করছে।

৩১৫ নম্বরের কথা ভাবতে গেলেই আমার মনে পড়ে মিস্টার সিংএর কথা। দেখলাম ভদ্রলোক প্লেটের উপর মুখ গুঁজে খাচ্ছেন। এত বড় ডাইনিংহলে একমাত্র তিনিই রাজকুমারী সম্বন্ধে নিস্পৃহ।

জাহাজ আটলান্টিকে থাকতে থাকতেই রাজকুমারীর দৈনিক রুটিনের নাড়ী-নক্ষত্র আমাদের মুখস্থ হয়ে গেল। আমাদের মানে, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পর্যন্ত। যে সব লোক অস্ট্রেলিয়ার জাহাজে প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করে, তাদেরও রাজপরিবারের লোকের দর্শন পাবার সৌভাগ্য হয়েছে কমই। "ভারতের রাজকুমারী! gone Communist!" 'কেবল প্রথম শ্রেণীর জন্য'—লেখা সাইনবোর্ডটা পার হয়েও তাঁরা এদিকে চলে আসেন জিজ্ঞাসা করতে, রাজকুমারী 'সুইমিং পুল'এ আসেন কি না, নাচা পছন্দ করেন কি না।

তাঁর টেবিলের সাহেবদের ইজ্জত, কদর, চাহিদা বেড়েছে, এই জাহাজের মিনাবাজারে। যে রাজকুমারীর কাছে কেউ পৌঁছুতে পারে না, এই ভাগ্যবানরা খাওয়ার টেবিলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পায়। রাজকুমারী সম্বন্ধে এদের আনা খবর একেবারে যাচাই করা সত্যি; ঐ মিস্টার রামস্বামী কিম্বা কেবিন স্টুয়ার্ডের আনা ভাসাভাসা উড়ো খবর নয়। এঁরা খবর দিলেন, রাজকুমারীর একলা একটা ঘর না হলে চলে না; আজকালকার দিনে এক বার্থের সেলুন পাওয়া এক রকম অসম্ভব; প্রথম শ্রেণীতে নেই; দুটো বার্থের ভাড়া দিয়ে, জাহাজ কোম্পানির হেড অফিসে তদ্বির করে উনি ঐ কেবিনটা পেয়েছেন; ওটাতে কি সব মালপত্র যেন থাকত এতকাল।...

তাই বল! তাঁর টুরিস্ট ক্লাসে যাওয়ার একটা কারণ খুঁজে পেয়ে জাহাজসুদ্ধ লোক নিশ্চিন্ত হয়। বিস্কে উপসাগরের নাড়ীহাটকানো "রোলিং"-এর চেয়েও, এই দুশ্চিন্তাটা তাঁদের পীড়া দিচ্ছিল বেশী। এক গবেট গুজরাটি শুধু প্রশ্ন তুলেছিল যে রাজকুমারী 'এয়ার'-এ গেলেই পারতেন। আর যাবে কোথায়! সকলে একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে ওঠে! —'এয়ার'-এ যাওয়া যে ওঁর শরীরে 'সুট' করে না—এটুকু বোঝে না এই

নিরেট লোকটা! এত স্পষ্ট, এত সরল উত্তর তবুও! স্লেটের রঙের আটলান্টিকের উপর ঢেউয়ের সাদা কিলবিলুনিতে লেখা হয়ে গিয়েছে দুই আর দুয়ে চার, তবুও! যে জেগে ঘুমুচ্ছে তাকে আর জাগাবে কি করে বল?…

এ কয়দিনে রাজকুমারীর সম্বন্ধে যেটুকু সবাই জানতে পারল, সেগুলোকে এক একজায়গা করলে দাঁড়ায়—তিনি অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোন; তাই প্রাতরাশের টেবিলে যান না; সকালে স্টুয়ার্ডেস তাঁর টেবিলে কফি দিয়ে আসে; প্রচুর বকশিশ তিনি দেন স্টুয়ার্ডেসকে; আলাপ পরিচয় এক রকম করেন না বললেই হয়; সাহেব ছাড়া আর কারও সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেখা যায়নি; এমন কি কালো চামড়ার স্টুয়ার্ডগুলোর সঙ্গে পর্যন্ত তিনি কথা বলেন না; সে জন্য কালো স্টুয়ার্ডরা সকলেই তাঁর উপর বিরক্ত; অথচ 'বার'-এর ধূর্ত সাহেব স্টুয়ার্ডটার তিনি একদিন ফটো তুলেছেন; রাতে যতক্ষণ 'বার' বন্ধ না হয়, ততক্ষণ তিনি কোণার দিকের একটা টেবিলে বসে 'সাদা ঘোড়া' মার্কা হুইস্কি খান; প্লেয়ার্স-নেভিকাট ছাড়া অন্য কোনও সিগারেট তিনি খান না; ছোট ছেলেপিলে কাউকে একা দেখতে পেলে তিনি হেসে গাল টিপে দেন—কালো হ'লেও; তাঁর কানের উপর দিককার চুলে পাক ধরেছে; কমলালেবু খেতে খুব ভালবাসেন; আজ পর্যন্ত কোনো পোষাক তিনি দু'বার ব্যবহার করেন নি; জাহাজ আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় আন্দাজ কত মাইল যাবে তা' বলবার পুরস্কার প্রতিযোগিতায় ইনি এরই মধ্যে দুইদিন সফল হয়েছেন—জাহাজের এনজিনিয়ার তাঁর নাম দেখেই ঠিক অত মাইল চালিয়েছে কি না কে জানে।…

· ·

কাম্পালা জাহাজের যাত্রীরা আজ থেকে দুইখানি কম্বলের জায়গায় একখানি করে কম্বল গায়ে দেবে। তাই বিস্কে উপসাগরকে শেষ হতেই

হ'ল, ভূমধ্যসাগরকে আসতে হল, তমঃশ্যামল সমুদ্র নীল হয়ে ওঠে; কনকনে শীত মিষ্টি হয়ে আসে; রোদ স্মৃতি জাগায় ভনজুয়ানের গোপন প্রণয়ের। ডাঙার গন্ধওয়ালা এক গণ্ডুষ নীল জল সীমাহীন আটলান্টিকের উদারতা পাবে কোথা থেকে? জিব্রাল্টার বড় সংকীর্ণ।...

এমন মৈত্রী পরিবেশের মধ্যে কথাটা প্রথম ছাড়লে, আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা লেসার্ডো। লেসার্ডোর গল্পের কোনটা ভূমিকা, আর কোনটা বক্তব্য, তা' ধরতে পারে শুধু বিশেষজ্ঞরা। সে হেসে জানায় যে ভারতীয় প্যাসেঞ্জাররা ইংরাজ স্টুয়ার্ডদের কখনও এক পাউণ্ডের কম বকশিশ দেয় না, কিন্তু ভারতীয় স্টুয়ার্ডদের বেলা দরকষাকষি করে। কেনরে বাপু, কালো স্টুয়ার্ডরা কি তোমার কাজ করে কম? এই দেখুন না আর এক ভারতীয় প্যাসেঞ্জারের কাণ্ড।

তারপর একটু চোখ টিপে ফিসফিস করে বলে যে, আমাদের কেবিনের মিস্টার সিংকে বার হতে দেখা গিয়েছে, রাজকুমারীর কেবিন থেকে!

জাহাজ অফিস থেকে লাউডস্পিকারে বলা কথাগুলোর মত স্টুয়ার্ড সরবরাহিত বে-সরকারী খবরগুলোও সকলে জানতে পারে একই সময়ে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সকলে জেনে গিয়েছে। এখন আর লেসার্ডোর মুখ বন্ধ করে কি হবে? দাড়ি কামাবার সময় নাপিতরা যখন পাড়ার সংবাদ দিতে আরম্ভ করে তখন আর কে তাদের তাড়া দিতে যায়। সেইরকম জাহাজ-সমাজের শিষ্টাচার অনুযায়ী স্টুয়ার্ডের গল্পও বন্ধ করা চলে না। মনে মনে বুঝি যে লেসার্ডোর দেওয়া সংবাদ ঠিকই। তবু মৃদু প্রতিবাদের ভান করে তাকে হেসে বলি—বুঝেছি; রাজকুমারী ইংরাজ স্টুয়ার্ডদের উপর পক্ষাপাতিত্ব করেন বলে তোমরা তাঁর উপর চটা।

লেসার্ডো অপ্রস্তুত হবার পাত্র নয়, সে সুযোগ পেয়ে কাঁদুনি গাইতে আরম্ভ করে—তার ছেলেমেয়েরা পড়ে গোয়াতে; কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা যোগাতে হয় তাদের; তার মাইনের টাকা দিয়ে ছেলেমেয়েদের মা

কায়ক্লেশে সংসার চালায়; আর প্রভু যিশুখৃষ্টের কৃপায় এখানকার বকশিশের টাকা দিয়েই চলে ছেলেপিলেদের পড়াশুনার খরচ।

স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে লেসার্ডোর গলার স্বর ভিজে এল।...... স্ত্রীপুত্র-পরিজন ছেড়ে যাদের সারাজীবন কাটাতে হয়, বড় কষ্ট তাদের।...

রাজকুমারীর রহস্যের ফিকে স্বাদ মিষ্টি হয়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যে। বোঝা যায় যে এই রকম একটা খবরের জন্যই নিজেদের অজ্ঞতার অন্ধকারে জাহাজসুদ্ধ লোক হাঁতড়ে মরছিল। ঠিক ধরবার মত জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল না হাতের কাছে। এইবারকার খবরটা বেশ জিব্রাল্টারের পাহাড়ের মত মজবুত গোছের জিনিস। রহস্যের হারানো সূত্র খুঁজতে গিয়ে মেডিটারেনিয়ান পুকুরের থিতনো পাঁক ঘেঁটে উঠেছে।

শুনতেই জাহাজের যাত্রীদের হাতে প্রচুর অবসর! এখানকার কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাওয়া শক্ত।

......ও! লাঞ্চের ঘণ্টা বেজে গেল! আমার ঘড়ি এক মিনিট স্লো হয়ে গেল কি করে! আজ সকালেই কুড়ি মিনিট ফাষ্ট করে দিয়েছি। চল, চল!......না না মিস্টার রামস্বামী আমি বুঝেছি আপনি ইচ্ছা করে ঘড়ি এক মিনিট স্লো রেখেছেন, যাতে লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে ৩১৫ নম্বরের সান্নিধ্য একটু পেতে পারেন। সব বুঝি আমরা—তিনি আসেন সবার শেষে কিনা। কিন্তু আপনি হতাশ হবেন। আপনি যতই দেরী করুন, ৩১৫ নম্বর আর এখন আপনার দিকে ফিরেও তাকাবেন না।......এই, চুপ! চুপ!......

......ছুটোছুটি করে ডেকচেয়ারগুলো এক জায়গায় জড় করে বসা হল। রাতের "তম্বোলা" খেলার হারজিতের ফাঁকে ফাঁকে অজ্ঞাতে এসে পড়ে ৩১৫ নম্বর আর সিং নামের ছোকরাটার স্ক্যাণ্ডালের কথা।...... আগে হলে তবু দল বেঁধে গিয়ে ধরা যেতে পারত রাজকুমারীকে

ছেলে-পিলেদের একটা চ্যারিটি 'বল' জাহাজে অরগ্যানাইজ করতে; টাকাটা যেত নাবিকদের ছেলেমেয়েদের ফাণ্ডে। কিন্তু এখন আর তাঁর সময় কোথায়? হি-হি-হি……যতই ছেলেপিলেদের গাল টিপে দেন না কেন……হি-হি-হি…কি বলেন মিস্টার জ্যোতিষী?

সুইমিং পুলে একটা ডুব দিয়ে নিলে হত। চল চল।……ডাইভ কর না, খবরদার! মাথায় চোট লাগতে পারে। 'বিউরো'র নোটিশ বোর্ড দেখেছেন তো?……আচ্ছা রাজকুমারীরা তুজনেই এত ড্রিঙ্ক করেন, কিন্তু ভুলেও তো কোন দিন সুইমিং পুলে আসেন না…কেন বলুন তো? সাঁতারের পোষাকে বডডো বয়স ধরা পড়ে—খিক্-খিক্-খিক্!……ড্রপ ইন, মিস্টার জ্যোতিষী। সঙ্কোচের দরকার নেই সাঁতারের পোষাক নেই বলে। mighty Splash!…খিক্ খিক্……এত জল ছিটোলে উপরের দর্শকরা যে ছুটে পালাবে।……

এমন কোনও গ্যালাণ্ট আছেন এখানে, যিনি রাজকুমারীকে তাঁর সঙ্গে নাচবার জন্য অনুরোধ করতে পারেন? সে গুড়ে বালি, জিব্রাল্টারের আগে হলেও বা কথা ছিল!…সূর্যাস্ত ফুরিয়ে যাচ্ছে! ছুটোপুটি কোলাহল করতে করতে, হঠাৎ খুঁজে পাওয়া সূর্যাস্ত দেখবার প্রোগ্রাম সারতে সবাই Top deck এ ওঠে।

একান্নভুক্ত ক্যাঙ্গারু পরিবারের এই ধরণের কাটাকাটা প্রোগ্রামের যোগসূত্র আজকাল মক্ষিরাণীর স্ক্যাণ্ডালটা। ধুয়োর মত সব কথার ফাঁকে ফাঁকে এটা এসে পড়বেই।

সত্যি করেই ক্যাঙ্গারুর পেটের জারক-রসে পড়ে এতগুলি মন গলে এক হয়ে গিয়েছে। সকলে S S Kangaro মার্কা কাগজে চিঠি লিখছে, জাহাজের নাবিকদের সৌভাগ্যের চিহ্ন একটা কালো বিড়ালকে সকলে আদর করছে, একই সঙ্গে ঘড়ির সময় বদলাচ্ছে, আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া দেখে অবাক হচ্ছে। যে জাহাজটা ঐ দূর দিয়ে আলোর সঙ্কেত জানিয়ে

চলে গেল তারা অন্য জাতের লোক—ক্যাঙ্গারু 'টোটেম্' এর গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে না। ডাঙ্গার লোকরা তো একেবারেই বিজাতীয়। তাদের বিচ্যুতি নিয়ে কে মাথা ঘামায়? কিন্তু নিজের জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যের দুটো নম্বরের কথা না ভেবে উপায় কি? এক জাহাজে চড়েও এ দুজনে ভিন্ন। Sailing on the same boat ইডিয়মটাকে পর্যন্ত নিরর্থক করে দিয়েছে এই দুটো নম্বরে মিলে। রাজকন্যার গুপ্ত প্রণয়ের কাহিনী চিরকাল অগণিত লোককে রসের খোরাক যুগিয়ে এসেছে। এ নিয়ে কত ছড়া পাঁচালি, কাব্য, উপন্যাস! সেই জিনিসই এতগুলি যাত্রী দেখছে, একেবারে চোখের উপর; প্রত্যেকে তার উপর ভাষ্যকার হবার অধিকার পেয়েছে। শান্ত নীল জলের একটানা একঘেয়েমির জন্য কুৎসার রসে আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে আরও বেশী করে। মেয়েদের রাজকুমারীর উপর রাগ, তিনি সব পুরুষ যাত্রীর মনের উপর একচেটিয়া অধিকার কয়েম করেছেন বলে। পুরুষদের অন্তরের গভীরে পোষা আছে আক্রোশ, রাজকুমারী প্রণয়ের পাত্র হিসাবে ভুল নম্বর বেছেছেন বলে। লোকটা প্রথম আলাপ জমাল কখন? এই প্রশ্নই আজকাল সবচেয়ে বেশী করে সকলের মনকে চঞ্চল করে তুলেছে। স্ক্যাণ্ডালের কাহিনী প্রত্যহ নূতন নূতন শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব রাজকুমারীর। দূর থেকে কোন প্যাসেঞ্জারের দলের দিকে তাকালেই তাদের হাসিতামাসা বন্ধ হয়ে যায়; পুরুষরা আস্তে কথা বলে; মহিলারা অধিকতর মনোযোগের সঙ্গে উল বুনতে আরম্ভ করেন। আমার নীচের বার্থের ছোকরাটি একটু লাজুক গোছের—কারও সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলেই অন্যদিকে তাকাতে চেষ্টা করে। 'বার' এ বসে একা একা মদ খাওয়া ছাড়া এঁর আর দ্বিতীয় কাজ নেই।

পরের কুৎসা করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু প্রথম দিন কয়েক তাঁদের অভদ্রতায় একটু চটেছিলাম বলে স্ক্যাণ্ডাল শোনায় একটু রস

পাচ্ছিলাম। গত কয়েক দিনের মধ্যে সেটুকু গিয়েছে। জাহাজ-সুদ্ধ লোক সামান্য ভিত্তির উপর প্রত্যহ কতকগুলো করে মনগড়া তথ্য আবিষ্কার করবার ভান দেখায়; কিন্তু কেউ জানে না যে, এই মিস্টার জ্যোতিষী সত্যিই তাদের চেয়ে অনেক বেশী জানে ব্যাপারটার সম্বন্ধে। আমি ইদানীং আবিষ্কার করেছি রাজকুমারীর চোখে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতির আভাস। ঠিক কি জানি না; আমার অনুমানও হতে পারে।...আমার কি জানি কেন মনে হতে আরম্ভ হয়েছে যে, আমি আলাপ করতে চাইলেই ভদ্রমহিলা এখন আমার সঙ্গে আলাপ করেন। 'ক্যাঙ্গারু' সমাজের অপ্রত্যক্ষ বিরোধের মধ্যে তাঁরা বোধ হয় নিজেদের একটু অসহায় বোধ করছেন। বড় মায়া হয়।...কিন্তু সে আর হয় না... আমি তোমাদের না বিরুদ্ধে না স্বপক্ষে। তবে মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হয় রাজকুমারীকে একটু অযাচিত উপদেশ দিতে, যাতে তাঁরা সকলের সঙ্গে বিশেষ করে ভারতীয়দের সঙ্গে ভাল করে মেলামেশা করেন। দূরে দূরে থাকেন বলেই তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোটা আরও মুখরোচক হয়ে ওঠে। নইলে এত বড় জাহাজে কত লোকতো কত কি করছে, তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামাতে যাচ্ছে বল।...

ক্যাঙ্গারুর জাত আজ থেকে গরম পোষাক ছেড়ে সূতীর কাপড়জামা পরবে; তাই পোর্টসেড এসে গেল। লাউড-স্পীকার গর্জে উঠল—"অ্যাটেন্‌শন্ প্লিজ! অ্যাটেনশন প্লিজ! জাহাজ বন্দরে থাকবার সময় পোর্ট-হোল ও কেবিনগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে, কারণ আরব সোমালিরা বড় চোর। জুতো দরজার বাইরে রাখবেন না। জাহাজ বন্দরে থাকবার সময় পোর্টহোল ও কেবিনগুলি......ধন্যবাদ!"

নিজের নিজের ভ্রূকুঞ্চন থেকে টম ডিক হ্যারি সাহেব নোটিশ পান যে, তাঁরা প্রাচ্যে পৌঁছে গিয়েছেন; কাল থেকে বেলা সাড়ে দশটার

সময় 'বিফ-টি'র বদলে আইসক্রীম খেতে হবে জাহাজে; আজ থেকে দরকষাকষি আর "নোংরা ভিখিরী"র রাজ্য আরম্ভ হয়ে গেল।

কেবিন আর 'বার' বন্ধ। সেইজন্য রাজকুমারীকে এসে বসতে হয়েছিল লাউঞ্জে। বেশীর ভাগ লোক গিয়েছিল শহর দেখতে। যারা জাহাজে ছিল তারা তখন নৌকার ফিরিওয়ালাদের কাছ থেকে কার্পেট আর চামড়ার জিনিস কিনতে ব্যস্ত। শুধু আমি লাউঞ্জে বসে চিঠি লিখছি দাদাকে—কোন তারিখে জাহাজ বম্বে পৌছবে সে কথাটা জানিয়ে দিতে। দাদা পুণায় মিলিটারী ডাক্তার। হঠাৎ নজর পড়ল বহু দূরের একখানি চেয়ার থেকে রাজকুমারী একটু হেসে আমায় 'নস্ত' করলেন। আমিও একটা প্রত্যভিবাদন করে আবার অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলাম। যাক! এই দায়সারা প্রত্যভিবাদনের মধ্যে দিয়ে তবু বুঝিয়ে দিতে পেরেছি যে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আমি খুব উৎসুক নই।

সাহেবরা বিরক্ত হলেও, মিশরী পুলিস সার্চ না করে ছাড়ে নি। তারপর জাহাজ সুয়েজ পার হয়েছে। গরম হাওয়ায় ক্যাঙ্গারু সমাজে ফাটল ধরায়। পথের আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের আবহাওয়াও যায় বদলে। এতদিন সবার মন ছিল একসুরে বাঁধা। এখন মুহুর্মুহুঃ তাল কাটে। পানীয় ও আচরণে মাত্রা বাঁচিয়ে চলা আর সম্ভব হয় না। সমালোচনা করবার প্রবৃত্তিটা উগ্র হয়ে ওঠে। গরমের ঠেলায় এখন চব্বিশ ঘণ্টা সকলকে 'ডেক'এ বসে থাকতে হয়—এমন কি ৩১৫ নম্বর ও ৩১৩ নম্বরকেও। স্ক্যাণ্ডালের গল্প তাঁদের কানে গেল তো বয়ে গেল— অত পুতুপুতু করে চব্বিশ ঘণ্টা কথা বলা চলে না। টম সাহেব বিগড়ে আছেন, পোর্টসেডে আরব ফিরিওয়ালার কাছে মারাত্মক রকম ঠকবার পর থেকে। সেখানে জাহাজে দুজন নতুন প্যাসেঞ্জার উঠেছিল, তারা পায়জামা পরে 'ডেক' এ বসেছে বলে, সেদিকে মেমসাহেবরা ঘেঁষছে না।

একটি অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে নিজের জাতের যুবকদের উপেক্ষা করে রামস্বামীর সঙ্গে নাচা পছন্দ করত, সেই আটলান্টিক থেকেই। এই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করে অস্ট্রেলিয়ানদের কালাআদমি-বিরোধ দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে লোহিত সাগরে এসে। অকস্মাৎ সকলের মনে পড়ছে যে, জাহাজ কোম্পানি প্রত্যহ একই রকমের ডিশ দিচ্ছে বিভিন্ন ফরাসী নাম দিয়ে। সাঁতারের পোষাক না পরে কেউ নামুক তো দেখি আজকাল সুইমিং-পুলে! আমার কেবিনের মিস্টার লায়ন্স নামের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানটিকে তিনজন অস্ট্রেলিয়ান ঘিরে ধরেছে, সে নির্ধারিত সময়ের আগে ফ্ল্যাশ খেলার টেবিল থেকে উঠে এসেছে বলে। দূরের রুক্ষ পাহাড়ের সারি মনকে রুক্ষ করে দিচ্ছে আরও বেশী করে। এক টুকরো লেবুর জন্য এক গ্লাস বিয়ার কিনতে হচ্ছে। এর মধ্যে কি মাথার ঠিক থাকে?

এই গরম আর গরমিলের বাজারে আত্মবিস্মৃত ক্যাঙ্গারু জাতি হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য লুপ্ত সুরসঙ্গতি খুঁজে পেল, এডেনে পৌঁছবার ঠিক আগেই। জাহাজে লণ্ড্রি বিলের পয়সাটা দিতে হয় 'বার'এর কাউণ্টারে। রাজকুমারী নাকি সেখানে ৩১৩ নম্বর বার্থের প্যাসেঞ্জারের বিলটাও চুকিয়ে দিয়েছিলেন।

'তাই নাকি!'

আহা শেষ করে শুনুনই না ব্যাপারটা। তারপর ৩১৩ নম্বর নিজের লণ্ড্রি বিলের পয়সা দিতে এসে দেখে যে, আগেই সেটা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। সে কেরানীকে বলে যে, নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে, কেননা তার মনে আছে সে পয়সা দেয় নি। কেরানী একটু মুচকে হেসে শুধু বলেছিল যে, ৩১৫ নম্বর পয়সাটা দিয়ে গিয়েছেন। আর যাবে কোথায়! ৩১৩ নম্বর নেশার ঝোঁকেই ছিল না কি—হুঙ্কার দিয়ে উঠে কেরানীকে মারতে যায়। সবাই মধ্যে পড়ে থামিয়ে দিয়েছে। সে এক কাণ্ড

মশাই ! জাহাজের কাপ্তেনকে পর্যন্ত আসতে হয়েছিল। তিনি স্বয়ং বলেন, কেরানী অপরের কাছ থেকে বিলের টাকাটা নিয়ে টেকনিকাল অন্যায় করে ফেলেছে ঠিক ; তবে প্যাসেঞ্জারকে অপমান করা তার উদ্দেশ্য ছিল না কখনই ; এই ভুলের জন্য অবশ্য জাহাজ কোম্পানি দুঃখিত। এই করে তো কোনরকমে মিটেছে ব্যাপারটা।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখেই এই এ কথা শোনা যেতে লাগল—যেন একই রেডিও প্রোগ্রাম দেশসুদ্ধ লোক নিজের নিজের রেডিও-সেটে ধরছে। প্যাসেঞ্জাররা অমন চটকদার স্ক্যাণ্ডালটার সমর্থনে এতদিনে লিখিত প্রমাণ পেল একেবারে বারের লেজার বইতে লেখা হয়ে গিয়েছে। সে রাত্রে কোনও প্যাসেঞ্জার ঘুমোয় নি। ভোরের আলোয় রুক্ষ পাহাড়ের কোলে এডেনের শান্ত সবুজ সমুদ্র দেখবার সময় ক্যাঙ্গারুর জাত নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ববিরোধ ভুলেছিল। নজরে পড়েছিল পেট্রো-লিয়ামের ডিপোতে ভরা বন্দরের সমুদ্রে তেল ভাসছে রামধনু রঙের।

আরব নামের সঙ্গেই বুঝি পর্দা আর অতঃপুরের সম্বন্ধ ; তাই আরব সাগর আসবার নামেই কেবিনের ঘুলঘুলিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল। মৌসুমী বায়ুর গন্ধ পেয়ে আরব সাগর ক্ষেপে উঠেছে। এডেনের বাজারে জিলিপি আর পানের খিলি দেখেই বোধ হয় ভারতীয়দের সুপ্ত জাত্যভিমান জেগে উঠেছিল। বিলাতে থাকাকালে এরা ভারতের হাইকমিশনারের অফিস থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজখানা নিয়মিত পড়ত। তার থেকে জেনেছিল যে আজকাল ভূস্বর্গ ভারতে দুধ আর মধুর স্রোত বইছে ; দরকার শুধু এখন ঢেউ নেওয়ার আনন্দে অংশীদার হবার দেবাদেবীর।

সেই ভারতের মুখে চুণ-কালি দিল কিনা ৩১৫ নম্বরের এস. দেবী। রাজকুমারী না রাজকুমারীর ছিবড়ে ! বিদেশীদের চোখে ভারতীয়দের খেলো করে দিচ্ছে। ভারতের নৈতিকতার ঐতিহ্যকে এমনভাবে আরব

সাগরের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া যায় না! সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে তো? এ বিষয়ে প্রত্যেক ভারতবাসীরই একটা দায়িত্ব আছে। ধর্মান্ধ আরবের অসহিষ্ণুতার ছোঁয়াচ লেগেছে সবার মনে। ডেকে, লাউঞ্জে, বারে, যেখানেই ৩১৫ নম্বর কিম্বা ৩১৩ নম্বরকে দেখতে পাওয়া যায়, তার কাছাকাছি গলা-খাঁকার বা বিড়ালের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। পাত্র-পাত্রীকে শুনিয়ে টীকা-টিপ্পনীর অন্ত নেই। এক পাঞ্জাবী ছোকরা তো একদিন সিনেমায় হিন্দী গানের এক কলি…"সো জা রাজকুমারী, সো জা—"৩১৫ নম্বরের সম্মুখে বেশ অঙ্গভঙ্গী করে গেয়ে দিল। এই সূক্ষ্ম রসিকতায় সবাই প্রাণ খুলে হাসল। হাসবে না? অশ্রুর দ্বার বাবেলমণ্ডব যে পার হয়ে গিয়েছে। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। সেইজন্য পারতপক্ষে আমি রাজকুমারীর কাছাকাছি থাকি না। তিনি ডেকের যেদিকটাতে বসেন, আমি সেদিকটা এড়িয়ে চলি।

স্টুয়ার্ডরা হঠাৎ বম্বের প্যাসেঞ্জারদের দূরের যাত্রীদের চেয়ে বেশী খাতির দেখানো আরম্ভ করেছে। বকশিসের লোভে তারা খাবার টেবিলে ভারতীয়দের প্রতি খোলাখুলিভাবে পক্ষপাতিত্ব দেখায়। সাহেবগুলো রাগে গরগর করে।

খালি ভারতীয়রা যে ক্যাঙ্গারু 'টোটেম' এর থেকে বেরিয়ে এসেছে তা নয়। অন্য সকলের মধ্যেও পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা সুয়েজের পর থেকেই বাড়ছে। জাল দিয়ে ঘিরে 'বি ডেক'এ ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল—ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া। সেখানে খেলার মধ্যে হঠাৎ হাতাহাতি হবার উপক্রম। ইংরাজরা ভাবে যে, যত ক্রিকেটই খেলুক, অস্ট্রেলিয়ানরা কালাপানির সাজা পাওয়া ডাকাতদের বংশধর—ভদ্রতা শিখবে কোথা থেকে। অস্ট্রেলিয়ানরা ভাবে যে, একবার সিঙ্গাপুরটা পার হতে দে না, তারপর না বুঝবি!

একটী মালয়ের ছেলের সঙ্গে একজন সিংহলের যুবকের ডেক চেয়ারের দাবি নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল। এক পক্ষ নাকি চেয়ারের উপর বই রেখে তার স্বত্ব কায়েম করে গিয়েছিল। ইংরাজ আর অস্ট্রেলিয়ান মেমরা মন কষাকষি ভুলে, মুখটিপে হাসে—গরম হাওয়া গায়ে লেগে এদের উপরের পালিশ খসে পড়তে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে।

বিকালের চায়ের সময়, যে টেবিলে ইচ্ছে বসতে পারা যায়। একটা টেবিলে সিঙ্গাপুরযাত্রী দুজন সাহেব-মেম মালায়ার বর্তমানের 'ডাকাতদের আন্দোলন' এর গল্প করছিলেন। একটি নিরীহ মালায়ার ছাত্র তাঁদের সম্মুখ থেকে চিনির পাত্রটা নেবার সময় হেসে বলে দিল—"এইবার আপনাদের ভাণ্ডারে মালায়ার ডাকাত পড়ল।" সাহেব মেম দুজনেই বিস্ময়ের আতিশয্যে হাসতে ভুলে যান।......এই রকমই চলছিল।

বম্বে পৌঁছুবার আগের রাত্রে ভারতীয় প্যাসেঞ্জারদের সম্মানার্থে জাহাজ কোম্পানি গ্যালাডিনারের ব্যবস্থা করেছে। খাওয়ার টেবিলে প্রত্যেকে একটি করে কাগজের টুপি ও ছবিওয়ালা স্যুভেনির মেনু পেল। মেনুর উল্টো পিঠে সকলে অন্তরঙ্গ সহযাত্রীদের দস্তখত নিচ্ছে। সাহেবরা সবাই রাজকুমারীর স্বাক্ষর নিল। ভারতীয়রা কেউ তাঁর কাছ দিয়েও ঘেঁষল না। শুধু সেই ডেঁপো পাঞ্জাবী ছোকরাটা এক টিন সিগারেট বাজি রেখে রাজকুমারীকে বলে এল যে, কালির আঁচড়ের বদলে তিনি যদি স্যুভেনির হিসাবে একটি লিপস্টিকের ছাপ দেন কাগজে, তাহলে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে।......এত দূর থেকেও মনে হল যে, রাজকুমারীর মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, যেন পাঞ্জাবীটির কথা শুনতেই পান নি।......আমি আশা করেছিলাম তিনি ক্ষেপে উঠবেন কথাটা শুনে। কিন্তু দেখলাম যে এতবড় অপমান সহ্য করে গেলেন রাজকুমারী মুখ বুঁজে।......বড় মায়া হয় তাঁর

অসহায় অবস্থা দেখে। দেশের কাছে এসে তিনিও বদলে গিয়েছেন নাকি ?......এত মুষড়ে পড়ার কি হয়েছে! ...৩১৩ নম্বরও দেখছি ডিনারে আসে নি। সামুদ্রিক পীড়া নয়ত ? সেই লণ্ড্রি বিলের ব্যাপারটার দিন থেকেই কি এঁদের মনোমালিন্য চলছে ? কে জানে হবেও বা!

সেটা ফ্যান্সি পোষাকে নৃত্যের রাত। সারারাত চলবে। সারারাত বার খোলা থাকবে। যারা নাচবে না, তারা জমিয়ে বসেছে দেখবে বলে। আমার এত হৈ-চৈ ভাল লাগছিল না। গরমের জন্য কেবিনে থাকবার জো নেই, নাচের জন্য 'ডেক'এ বসবার উপায় নেই। লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম একখান নভেল নিয়ে। জাহাজের লাইব্রেরির বই ; আজই ফেরত দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। শেষ হয় নি বলে দিতে পারি নি। আজ রাতের মধ্যে শেষ করতেই হবে।

কতক্ষণ বইখানি পড়েছি ঠিক খেয়াল নেই ; রাজকুমারী দেখলাম এসে কোণার দিককার একখান চেয়ারে বসলেন। তাঁর আদরের বারস্টুয়ার্ড ট্রেতে করে পানীয় দ্রব্যাদি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাজির। বুঝলাম গ্যালানৃত্যের রাতে 'বার'এ নিরিবিলি জায়গা পাওয়া শক্ত, তাই তিনি এসেছেন লাউঞ্জে।

বইখানা ভালভাবে পড়বার চাইতে শেষ করবার দিকে আমার ঝোঁক বেশী। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যতবার রাজকুমারীর দিকে নজর পড়ল, দেখলাম তিনি মদ খেয়ে চলেছেন।......কি সিগারেটই খেতে পারেন ভদ্রমহিলা! ডেকের মিউজিকে তালে তালে ইনিও দেখছি অন্যমনস্ক হয়ে মধ্যে মধ্যে পা ঠুকছেন। ওঁর সিগারেটের ধোঁয়া অনবরত হাওয়ায় উড়ে এসে আমায় বিরক্ত করে মারলে।......বইখানার পাতা গুণে দেখলাম আরও কত পাতা বাকি আছে।......টপ ডেক-এ গিয়ে শুলে হয়।......আবার নতুন করে নাচ আরম্ভ হ'ল।

ঘড়িতে দেখি রাত দেড়টা। দূর ছাই, বলে বইয়ের শেষকালটায় কি আছে দেখে নেবার মনস্থ করি।

...আবার ট্রে নিয়ে এল স্টুয়ার্ড রাজকুমারীর জন্য।...মারবে নাকি লোকটা আজ রাজকুমারীকে মদ খাইয়ে!...

সেদিকে তাকাতেই দেখি রাজকুমারী আমাকে দেখে হেসে অভিবাদন করলেন। হাসিটা ঠেকলো একটু অস্বাভাবিক গোছের। আমি হেসে জবাব দিতেই, তিনি চেয়ার ছেড়ে ওঠেন, আমার দিকে এগিয়ে আসবার জন্য। দেখলাম তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। ঝোঁক সামলাতে গিয়ে একটা কাঁচের গ্লাস তাঁর টেবিল থেকে পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর টেবিলের দিকে যাই। বারের ওয়েটার কাঁচের টুকরোগুলো কুড়োতে কুড়োতে আমায় চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল যে ভদ্রমহিলার এখন হুঁশ নেই। হয়ত কথাটা ঠিকই, কেন না তিনি শিষ্টাচার অনুযায়ী গ্লাস ভাঙবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন না। শুধু নিজের ব্যাগটা আগিয়ে দিলেন ওয়েটারের দিকে—সে যাতে পানীয়ের দাম নিয়ে নেয়।...এ জ্ঞানটুকুতো আছে দেখছি। ওয়েটারটারই অসুবিধা; নিজে পয়সা বার করে নিতে হলে বকশিশের পয়সাটা নেওয়া শক্ত।...সে আমার দিকে তাকায়—আমার কোন পানীয়ের দরকার কি না। তাকে বারণ করি। ভাবলাম যে বলি, রাজকুমারীর জন্যও আর এনো না; দেখছো না ওঁর অবস্থা।......কিন্তু তাঁর ভালমন্দ দেখবার অধিকার আমায় কে দিয়েছে? সেই জন্য বলি বলি করেও বারস্টুয়ার্ডকে বলতে পারলাম না কথাটা। সে আন্দাজে বোধ হয় বোঝে। যাবার সময় বলে যায়—কাল বম্বেতে কোন পানীয় পাওয়া যাবে না কি না—তাই।...

নেশার প্রতিক্রিয়া এক একজনের উপর এক এক রকম হয়। রাজকুমারীর চোখ দিয়ে দেখি জল পড়ছে।

"আমার হাত দেখে বলুন তো মিস্টার জ্যোতিষী আমার বরাতে কি আছে।······কোনও ওজর শুনবো না, আপনার।······আপনার সমুদ্র-পীড়া হয় না?······আমি জানি মিস্টার জ্যোতিষী খুব ভাল লোক। না না অস্বীকার করলে চলবে না, আমি লোক চিনি।······আমার পয়সা নেওয়া কি এত পাপ?······আজ তিন দিন থেকে আমার সঙ্গে কথা বলে না।···সামান্য পয়সা।···এয়ার এ যাবার পয়সা, সে না হয় না নিলেও বুঝি; বেশী টাকার ব্যাপার!···বিলাতে তবু দেখা হত।"···এই অপ্রকৃতিস্থ মহিলার অসংলগ্ন কথার কি জবাব দেব। এখন কোনও রকমে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। উঠবার চেষ্টা করতেই রাজকুমারী আঙ্গুল দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে আমায় বসে থাকতে হুকুম দিলেন—যেন উঠলে এখনই প্রহরীকে ডেকে গর্দান নেবার হুকুম দেবেন, এমনি ভাব।

···এতক্ষণে হয়ত নাচের মজলিসে সবাই বলাবলি করছে যে মিস্টার জ্যোতিষী ওস্তাদ লোক; আজ জমিয়েছে শেষ মরসুমে······প্রত্যভিবাদন করতে গিয়ে ভাল বিপদে পড়া গেল! কতক্ষণে ছাড়া পাব এঁর হাত থেকে জানি না।

রাজকুমারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি—যে তাঁর কথা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছি। কথার মধ্যে তো এখন দাঁড়িয়েছে, ঐ একটা কথাই বার বার বলা—মিস্টার জ্যোতিষী খুব ভাল লোক, আমি জানি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর তিনি একটু ঝিমিয়ে এসেছেন দেখে বলি, "চলুন রাজকুমারী, আপনাকে কেবিনে পৌছে দিয়ে আসি।"

"রাজকুমারী কি! রাজকুমারী কি আমার নাম?" বিলক্ষণ চটে উঠেছেন তিনি।

···নিজেই প্যাসেঞ্জার লিস্ট সংশোধন করিয়ে রাজকুমারী লেখান, আবার রাজকুমারী বললে চটেন! তাঁকে কি বলে যে

ডাকতে হবে মনে পড়ে না তাড়াতাড়িতে। ......"দুঃখিত, দুঃখিত"

"মিস্টার জ্যোতিষী খাঁটি ভদ্দর লোক। লোক চিনি আমি।"

"চলুন আপনাকে কেবিনে পৌছে দিয়ে আসি।" রাজকুমারী ওঠেন। জাহাজের দোলানির মধ্যে তাঁকে ধরে আস্তে আস্তে সাবধানে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাই......গরম গুমোটে মনে হচ্ছে, জাহাজের খোলের ঘূর্ণিপাকের ভিতর কে যেন আমাদের জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।... নিশ্চয়ই একশ জোড়া কৌতূহলী চোখ চারদিক থেকে আমাদের দেখছে। ...ভাগ্যে কালই বোম্বাই পৌছে যাব! আমার পিছনে লাগবার সময় পাবে কখন?......ডান হাত দিয়ে রাজকুমারীকে ধরে রয়েছি। বাঁ হাত দিয়ে রাজকুমারীর কেবিনের ছিটকিনিটি খুলে, ভিতরের আলো জেলে দিলাম।......সম্মুখেই দেখি, টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে রয়েছে, ৩১৩ নম্বর! তাড়াতাড়ি রাজকুমারীর কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম।...... নজরে না পড়লেই ছিল ভাল! জানা ব্যাপার, তবু মনটা খারাপ হয়ে গেল। একজন ঘুমিয়ে, আর একজন নেশায় চুর; মাঝ থেকে যেটুকু অপ্রস্তুত হবার হতে হ'ল আমাকেই!......রাগ পড়েছে; তাই বোধ হয় প্রতীক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ...বাকী রাতটুকু 'টপ্ ডেক্'-এই কাটানো যাক।...

ভোর বেলাতেই সব স্টুয়ার্ডদের বকশিশ দিয়েছিলাম। লেসার্ডো খুব খুশী—সব ভারতীয় প্যাসেঞ্জাররা এমনি হয় তবে না! এই দেখুন না ৩১৫ নম্বর বারের সাদা চামড়ার স্টুয়ার্ডকে নিশ্চয়ই তিন চার পাউণ্ডের কম দেবেন না; কিন্তু স্নানের ঘরের কালো স্টুয়ার্ডকে দেবেন মেরেকেটে দশ শিলিং—দেখবেন, এই আমি বলে রেখে দিলাম।...আপনাদের

বকশিশ আছে বলেই স্ত্রীপুত্রের মুখে দুটো অন্ন দিতে পারি, নইলে এ চাকরি করে আর কাউকে সংসার চালাতে হয় না।······

লেসার্ডো আমার লটবহর ডেক-এ নিয়ে যাবার পরই হাঁপাতে হাঁপাতে এল একজন রান্নাঘরের গোয়ানিজ স্টুয়ার্ড।

"সার, যদি লেসার্ডোকে কিছু বকশিশ দেবার মনস্থ করে থাকেন, তাহলে সেটা হেড স্টুয়ার্ডের কাছে জমা করে দিলে ভাল হয়। লেসার্ডো টাকা পেলেই মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে বোম্বাইয়ে নামেই না। একথা জাহাজের ক্যাপ্তেনও জানেন। লেসার্ডো আমাদের গ্রামেরই লোক। তাই আমার এত মাথাব্যথা।···"

লেসার্ডোর স্ত্রীর জন্য দশ শিলিং এই স্টুয়ার্ডটির হাতে দিয়ে নিষ্কৃতি পাই।······নিজের চোখে দেখা জিনিস ছাড়া আর কারও কথায় বিশ্বাস নেই!······

সিঁড়ি দিয়ে ঠিক আমার আগে আগে নামছে ৩১৩ নম্বরের ছোকরাটি। সেই প্রথম দিনের মতই গম্ভীর—একটা বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত করেনি কাউকে।···

অথচ একজন সিঙ্গাপুরের সাহেব বিদায়ের ছলে রসিকতা করলেন, "মিস্টার জ্যোতিষী আমি গুণে বলে দিতে পারি, আপনি আজ জাহাজ থেকে নামবেন।"

"শেষ সিঁড়ি পর্যন্ত নামবার আগে বিশ্বাস নেই।"

হাসির ধুম পড়ে যায়।

দেখি, দাদা এসেছেন আমায় নিতে। বললেন, বম্বেতে একটা সরকারী মিটিঙে এসেছিলাম। তোর আগেই যে ছোকরাটি সিঁড়ি দিয়ে নামলো সেটার সঙ্গে আলাপ-সালাপ হয়েছে তো? পাশ করেছে না কি?

—কে? ৩১৩ নম্বর? মিস্টার সিং? ওকে জান না কি?

—জানি মানে! বিলক্ষণ জানি। ও আমাদের মিলিটারি স্কুলে বছরখানেক পড়েছিল। একেবারে জালাতন করে মেরেছে। রোজ ওর 'মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডস্' এ ব্রাণ্ডি আর কুইনাইনের প্রেসক্রপশন চাই। টিকতে পারলে না স্কুলে। বলল বিলেত যাবে অ্যাকাউন্টেণ্টসিপ না কি যেন পড়তে। এক বছরের মধ্যে তো দেখছি ফিরে এল। ঐ গবেট ছেলে বিলেত গিয়ে কিছু পাশ করে থাকলে আশ্চর্য হব। ওর কথা সকলের বেশী মনে থাকে অন্য কারণে। যুক্তপ্রদেশে সেই পিথৌরার রাজকুমারীর sensational কেস হয়েছিল মনে কাছে? তোদের মনে না থাকবারই কথা। বিখ্যাত 'সোসাইটি গার্ল' পিথৌরার রাজকুমারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি তাঁর প্রণয়ীকে দিয়ে স্বামীকে হত্যা করিয়েছিলেন। মহা হৈ-চৈ এই নিয়ে সে সময়কার কাগজে! রাজকুমারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ অবশ্য প্রমাণিত হয়নি! তিনি তারপর থেকে বিলাতেই থাকেন শুনেছি। এই ছোকরাটি হচ্ছে সেই রাজকুমারীর ছেলে। ছোটবেলা থেকে পুণাতেই সাহেবী স্কুলে পড়ত! কেসের ঐ স্ক্যাণ্ডালটার জন্য দূর দেশে রেখেছিল বাড়ীর লোকে।......ও ছেলের কোনকালে কিচ্ছু হবে না—আমি লিখে দিতে পারি।......"

এই প্রথম ৩১৩ নম্বরকে অন্য দৃষ্টিতে দেখলাম। সহানুভূতিতে মন ভরে ওঠে তার উপর। বুঝি, কেন সে ছুটে গিয়েছিল বিলাতে মিলিটারি স্কুল ছেড়ে। থেকে গেল না কেন এরা বিলাতে? সেখানেও কি বেচারীরা তাদের হারানো সুর খুঁজে পায়নি? এক যুগ আগেকার একটা স্ক্যাণ্ডালের ব্যবধান মা আর ছেলের মধ্যে! সমাজ আর তাদের মধ্যেও!......

গাঁক্ গাঁক্ করে জাহাজের লাউডস্পীকার গর্জে উঠ্‌ল—"অ্যাটেন্‌শন্ প্লিজ্! অ্যাটেন্‌শন্ প্লিজ্। একটি ছোট ছেলে বহুক্ষণ থেকে নার্সারিতে কাঁদছে। তার মা যেখানেই থাকুন শীগ্‌গির যেন তাকে

এসে নিয়ে যান। একটি ছোট ছেলে বহুক্ষণ থেকে..... থ্যাঙ্ক ইউ!"

চেয়ে দেখি গ্যাংওয়ে দিয়ে নামছেন রাজকুমারী। নিঃসীম রিক্ততা ভরা দৃষ্টি। সম্মুখের "গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া"র দিকে তাকিয়ে আছেন অথচ যেন দেখছেন না। ভারতের তোরণে কপাট নেই, অর্গল নেই। ......কিন্তু সে কেবল ঐ দেখতেই!

রথের তলে

চোদ্দ বছর পর আজ ভৈরো নাট জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে।

আজ আর আসবার দিনের বাবরি চুলের বাহার নেই। ছোট ছোট করে ছাঁটা তার মাথার সাদা চুলগুলোর কথা এতদিনে তার খেয়ালই হয়নি। আজ সকালে স্নানের পর হাত দিয়ে মাথার জলটা ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ সে কথাটা মনে পড়ে যায়। নাটের মাথায় বাবরি চুল নেই? তার উপর আবার সে জাতের সর্দার। সর্দারের মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুল ছড়িয়ে পড়বে কাঁধের উপর পাক খেয়ে খেয়ে—বটের ঝুরির মত। তাই না তাদের জাতে সর্দারকে বলে বুড়োবট। তার ছায়ায় এসে বস, রঙ্গ তামাসা কর, জিরিয়ে নাও, কিন্তু খবদ্দার আগাছা জন্মাতে দেবে না বটের আওতায়।...

জেল অফিসের সব বাবুরা তাকে চেনেন; মেট পাহারা, কয়েদীদের ত কথাই নেই। জেলের জাঙ্গিয়াটা ছেড়ে সে পরল জেল থেকে পাওয়া ছ' হাত কোরা মার্কিনের টুকরোটা। এতদিন অনভ্যাসের পর কাপড় পরে কেমন যেন জবর-জং গোছের লাগে। শীতের সকালে কম্বলের হাত-কাটা কোটটা খুলে দেওয়ার সময় একটু মন খারাপ হয়ে যায়। এইতো সেদিন জেল ফ্যাক্টরী থেকে উল এনে সেটাকে নিজে হাতে রিফু করেছে;—এখনও দিনের বেলায় সে অনায়াসে সূচে সূতো পরাতে পারে এই আটষট্টি বছর বয়সেও। একখান মোটা খাতায় তার টিপসই নেবার সময় ডেপুটি জেলরবাবুর নজর গিয়ে পড়ে তার দেহের দিকে। এই বয়সেও গায়ের চামড়া কুঁচকে আসেনি; সাদা রোম-ভরা দেহের

পেশীগুলি এখনও শিথিল হয়ে পড়ে নি ; এতখানি চওড়া হাতের কব্জি। হাড়গুলো কি মোটা ! টিপসই দেওয়ানোর সময় বেঁটে জেলরবাবুর হঠাৎ মনে হয় যে, লোকটির বুড়ো আঙ্গুলের গোড়াটা ধরতে গেলেই তার হাতের মুঠোর বেড় ফুরিয়ে যাবে। আলবাৎ হাট্টা-কাট্টা জোয়ান ছিল লোকটি কম বয়সে !

"কিরে, বড় খুশী, না ? শীত করছে খালি গায়ে ? কম্বলটা গায়ে দিয়ে নে, ওখান আর ফেরত দেবার দরকার নেই। তোর কি কি জিনিস ছিল মনে আছে ? একটা চাঁদির কবচ ? এই নে। কাপড়খান পোকায় ধূলি ধূলি করে দিয়েছে ও আর নিয়ে কি করবি ? ওকি আর পরা যাবে ? তোর সঙ্গে কিছু টাকা ছিল নাতো জেলে আসবার সময় ? এই নে তোর নামে জমা আছে উনচল্লিশ টাকা আট আনা—মেট থাকবার জন্য সরকার বাহাদুর দিয়েছে মাসে আট আনা করে। গুণে নে ভাল করে। তুই বুড়ো মানুষ, তোর টাকা থেকে আর আমাদের দস্তরিটা কেটে নেবো না। এই নে খোরাকির পয়সা ; আর এই নে রেল টিকিটের পুঁজি। খেয়েছিসতো আজ সকালে ?"

তারপর ডেপুটি জেলরবাবু তার সঙ্গে রসিকতা করেন।

"ছাড়া পাওয়ার দিনের জলপানের খরচ সরকার বাহাদুর দেবে না। কেটে নেবো নাকিরে তার জন্য এক আনা ? কাগজে মোড়া ওটা কিরে ? পুদিনার চারা। জেলের জিনিস চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?"

রসিকতার দমকে ডেপুটি জেলরবাবুর কালো পান খাওয়া দাঁতের মাড়ি সুদ্ধ বেরিয়ে আসে।

এত প্রশ্নের কোনটির জবাব দেয় না ভৈরো নাট। জেলসুদ্ধ প্রত্যেকটি লোকের সহানুভূতিতে আজ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে।

জেল অফিসের কয়েদী মেটটা তার সকালের জলপান—একটি গ্লাস-ভরা ভিজে ছোলা ভৈরোর কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিল—"খোরাকির পয়সাটা বাঁচিয়ে নিস ভৈরো।"

ওয়ার্ডার হেসে মেটকে জিজ্ঞাসা করে, "পোকাড়ে নাকি রে ছোলাগুলো?"

অমন দত্যির মত লম্বা চওড়া চেহারা ভৈরোর, কিন্তু তার মধ্যেও এমন একটা জিনিস ছিল যে, সে যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ—সে দশ দিনের মেলাতে পর্যন্ত। ওয়ার্ডাররা পর্যন্ত এই বুড়ো কয়েদীটিকে সমীহ করত। গেট থেকে বেরুবার সময় গেটের ওয়ার্ডার বলে, "বিবির কাছে যাওয়ার জন্য বুড়োর আর তর সইছে না। গিয়ে দেখবি বিবি অন্য কারও সঙ্গে ঘর করছে। বিবি নেই কিরে? ছেলে পিলে তো আছে? বলিস কি! তাও নেই! এত বড় জোয়ান মরদ তুই; তোর ছেলে নেই কিরে? তা তোর যা শরীর এখনও গিয়ে তিনটে শাদি করতে পারিস।"

"কি যে বলেন হুজুর। একবার গাঁয়ে পৌছুতে পারলে হুজুর আর বুড়ো বয়সে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হবে না। পরিবার না থাকুক, গাঁ খানা তো আছে। আমাদের বেবুদপুর পাঁচমিশেলী গাঁ নয়; সব আমাদের জাত বেরাদার, আপনার জন।" নিজের গাঁয়ের আরও কত কথা বলতে ইচ্ছে করে ভৈরোর।

সে চলে আসবার পরও ওয়ার্ডার আর কয়েদীরা বলাবলি করে যে, এবারকার 'লাইফার'দের ওয়ার্ডের হোলি আর জমবে না। এবার আর ভৈরো নাটের মত "যোগিরা" গান গাইবে কে? কি কোমরটাই না ঘুরোয় 'যোগিরা' নাচের সময়, এই বয়সেও। মনে নেইরে, সেই—

"রামগড়ের জোড়া কেল্লা ভেঙে গড়েছে,

বললেন, ভেঙে গড়েছে,

গুরুজী বললেন, ভেঙে গড়েছে,

বললেন গুরুজী, আরও মজা আরও মজা।"

তারপর নাচতে নাচতে থালায় চাঁটি মেরে কি তবলার বোলই না বের করতো বুড়োটা!······

অন্তরের ভিতর থেকে কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল 'লাইফার'দের—ভৈরো নাট জেলগেট থেকে বেরিয়ে আসবার সময়।

যেদিন সে জেলে আসে, সেদিন তার গাঁয়ে কারও উনুনে আগুন পড়েনি ; আর যেদিন তার মোকদ্দমার রায় বেরোয় সেদিনও তার গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সকলের চোখের জল পড়েছিল তার জন্য।

······ভুট্নীটার জন্য একখান শাড়ি নিয়ে গেলে হয়। কতদিন পর গাঁয়ে যাচ্ছে ; একেবারে খালি হাতে গাঁয়ে ফিরবে? কিছু বাতাসা-টাতাসা কিনে নিয়ে যাওয়া উচিত গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য। এখনকার ছোট ছেলেপিলেরা কেউ তাকে চিনতেই পারবে না। যাদের এতটুকু দেখে এসেছে, তারা আজ বড় হয়ে রোজগার আরম্ভ করে দিয়েছে। নাটদের মেয়েরা চোদ্দ বছর বয়সের আগেই নাচ-গান শেখা শেষ করে রোজগার করতে আরম্ভ করে। রোজগারের বয়স তো মোটে দশ বার বছর। তিরিশের পর নাচতে পারে কটা 'নাট্টীন'। তবে হ্যাঁ গানটা বাজনাটা চলতে পারে তাদের দিয়ে ; কিন্তু নাচতে না পারলে কেউ কদর করে না সে নাট্টীনকে, কেউ কদর করে না।······

এই চোদ্দ বছর ধরে যখনই সে তার গাঁয়ের কথা ভেবেছে—আর ভেবেছেতো প্রায় অষ্ট-প্রহর—তখনই তার মনে পড়েছে ভুট্নীর কথা। এখন হয়ত সেই নাকে নথওয়ালা, ছোট্টটো চোদ্দ বছরের ভুট্নীটা

ক' ছেলের মা। তার মেয়েরাই হয়ত এখন রোজগার আরম্ভ করেছে।......

জেলের মধ্যে আর দশজন কয়েদীর মত সেও শুনেছিল কাপড় চাল ডাল আক্রা হবার কথা; কিন্তু যেখানে ভাত কাপড়ের কষ্ট নেই, সেখানে দরকার কি ও সব জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিয়ে! এক কান দিয়ে শুনেছিল, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল; মনে দাগ কাটে নি। .....একখান শাড়ির দাম যে এত হতে পারে তা সে ধারণাই করতে পারে নি। যত আগুন দামই হোক, সে ভুট্‌নীর জন্য একখান শাড়ি নেবেই। আবার পাড়ার অন্য মেয়ে, নাতনীরা এ নিয়ে ঠাট্টা না করে। না বলে এ নাতনীটার উপর এত একচোখোমি কেন? গুজরা নাট্টীনের মেয়েটা বড় কটকট করে কথা বলে। সেটা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করে বলবে, সর্দার দাদুর সাদা চুলের সঙ্গে ভুট্‌নীর কালো চুল, কালো পাড়ের শাড়ির মত মানাবে। তোমার দিব্যি করে বলছি। সেরে ফেল সর্দার দাদু এবার!......বেবুদপুরের নাট্টীন ছাড়া এত মিষ্টি করে মজার কথা বলতে আর কেউ পারে না। দেখেছে তো সে ছিষ্টি সাত মুল্লুক ঘুরে।......

জেলের থেকে পাওয়া টাকা মায়া করে লাভ নেই। কি করবে সে টাকা নিয়ে বুড়ো বয়সে। গাঁয়ে ফিরে গেলে গাঁয়ের লোকেই সর্দারকে খাওয়াবে, দেখাশুনা করবে। ভুট্‌নীটা তো তা'কে মাথায় করে রাখবে। কি ভালই বাসত ঐ এক ফোঁটা মেয়েটা তাকে! একেবারে সর্দার দাদু বলতে অজ্ঞান। যখনই তাদের বাড়িতে মেহেদির পাতা বাঁটা হ'ত, তখনই এক খাবলা নিয়ে এসে সর্দার দাদুর নখে দিয়ে দেওয়া চাই-ই চাই। তারপর কি কড়া শাসন! কুষ্ঠরুগীর মত আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে ঝাড়া দু ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। ভুট্‌নী ততক্ষণে সর্দার দাদুর চোখে সুর্মা লাগিয়ে দেবে; চুল আঁচড়ে দেবে, মাথার পাকা চুল তুলে দেবে।...ওরে

পাগলী, কত আর বাছবি? সর্দারের বাবড়ি চুলের গোছা হলেই মানায় ভাল। কে তার কথায় কান দিত। যা যা তোর বাবা চটবে, সে হয়ত সারেঙ্গী নিয়ে বসে রয়েছে এতক্ষণ তোর জন্যে।

খিলখিল করে হেসে, দুষ্টু মেয়েটা হাঁ করে সর্দারকে দেখায় যে, এখন সে গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে মিছরী খাচ্ছে। তার মা দিয়েছে, সত্যি সে চুরি করেনি। গান শেখা আরম্ভ হবার এখনও অনেক দেরী। বাবা রাতে খুব শরবত খেয়েছে; এখনও তার ঘুম ভাঙবার ঢের দেরী।... নীচের ঠোঁটটা উল্টে বলত ঢে-এ-এ-এর দেরী—......

মনে হয় এ সব এই সেদিনের কথা।......নিজের ভবিষ্যতের জন্য, পয়সা বাঁচিয়ে লাভ নেই। ফাঁসির হুকুম হয়ে গেলে এতদিন সে থাকত কোথায়। সত্যি কথা বলতে কি, এখন তো তার জীবনের ফাউটুকু চলছে।

কাপড়ের খুঁট থেকে সে একখানা দশ টাকার নোট বের করে দেয় দোকানদারকে। শাড়িখানার সঙ্গে দুআনা পয়সাও ফেরত দেয় দোকানদার। লোক ভাল দোকানদারটা, এ দুআনা ফেরত না দিলেই বা সে কি করত।...

বহুকাল পান খাওয়া হয়নি। চিরকাল ছিল পান-জর্দা খাওয়ার অভ্যাস। নাটদের জাতে ছেলে বুড়ো কারই বা পান-জর্দা খাওয়ার অভ্যাস নেই? আর জেলার মধ্যে সেরা পান সাজিয়ে বলে নাম আছে বেবুদপুরের 'নাট্টীন'-দের (নাট মেয়েদের)।

এই দু-আনারই সে পান-জর্দা খাবে আজ। দাও তো হে এক আনার 'মাঘী' পানের খিলি, বেশ সাদা দেখে। গয়ার মাঘী পান তো? আর এক আনার 'বাংলা' পান। মাঘী পানের সঙ্গে জর্দাটা জমে না।

পানওয়ালা বোঝে যে, লোকটি সমঝদার। নারকোল ছোয়ারা হুজুর দেব না তো পানে? সে হুজুরের গলার স্বরেই বুঝেছি। বাংলা পানের খিলির মধ্যেই জর্দাটা দিয়ে দেব নাকি?

যাক্ এখনও অপরিচিত লোক তাকে দেখলে 'হুজুর' বলে,—এই ছ' হাতি মার্কিন পরে থাকলেও। বেশ নতুন নতুন লাগে হুজুর কথাটি। জেলের ওয়ার্ডারদের একচেটিয়া প্রাপ্যটুকু সে চুরি করে নিয়ে এল নাকি জেল থেকে বেরুনোর সময়।

আশ্চর্য লাগে ভৈরো নাটের। একটা মাঘী পান দিয়েছে এক আনায়। বাংলা পান এক আনায় দু' খিলি মোটে! পানওয়ালাটা তাকে পাড়াগেঁয়ে ভেবে ঠকাচ্ছে; তাই এত হুজুর হুজুর। যাকগে পড়ে পাওয়া কাঁচা পয়সা ভৈরো নাটের। পানওয়ালাটা তাকে খাতিরও দেখিয়েছে খুব। দরদস্তরের কথা উঠিয়ে আর সে নিজেকে খেলো করতে চায় না এখন।...না, পানগুলো আর চিবুবার জো নেই দাঁত গিয়ে। জেলে এসে পাঁচটা দাঁত প'ড়ে গিয়েছে। বেবুদপুরে গেলে ভুটনীটা নিশ্চয়ই পান ছেঁচে দেবে তার জন্যে। কি ঠাট্টাটাই করবে ভুটনী, তার ফোক্‌লা দাঁত নিয়ে।...

ও ভাই ইস্টিশনের রাস্তা কোনটা?......কখন ট্রেণের সময় তা' সে জানে না। যখনই গাড়ি পাওয়া যাবে তখনই চড়া যাবে। ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই।...

সেই সন্ধ্যার সময় গাড়ি। সারা রাত তাকে থাকতে হ'বে ট্রেণে। শেষ রাত্রে কাটিহার, ভৈরোরা সকলে বলে 'জকসন'। জকসন থেকে অন্য লাইনের গাড়িতে সে চড়বে। তারপর গড়মোগলাহা ইস্টিশানে নেমে তাকে যেতে হবে সাত কোশ।

এত লোক! নতুন নতুন মুখ বেশ লাগে দেখতে। তাদের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করে। এরা আবার তার মার্কিন আর কম্বল দেখে বুঝে ফেললো না তো সে কোথা থেকে আসছে।...সব জিনিস দেখতে ভাল লাগে; পথের ধারের বুড়ী ভিখিরীটা পর্যন্ত। বাইরের রোদ্দুরটাও জেলের রোদ্দুরের চেয়ে মিষ্টি। অনেককাল পর মেয়েমানুষ দেখে কেমন

যেন নতুন নতুন লাগে। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। ফিরিওয়ালাদের কাছে কমলালেবু, পেয়ারা, আর নারকুলি কুল দেখে জিভে জল আসে। বুড়োবয়সে তার লোভ বেড়ে গেল নাকি ? যত লোভই হোক সে আর এক পয়সাও খরচ করবে না এখানে। কাটিহারে গিয়ে কেবল, গাঁয়ের ছেলেপিলেদের জন্যে বেশ দেখেশুনে কিছু মিষ্টি-টিষ্টি কিনে নেবে।...

সম্মুখের বেঞ্চের একটা ছেলে পেয়ারা খাবে বলে কাঁদছে। কতদিন ছোট ছেলেপিলে দেখেনি। ছেলেটির গাল টিপে একটু আদর করতে ইচ্ছে হয়। সে ভিড় ঠেলে জানলা দিয়ে দুটো পেয়ারা কিনে ছেলেটির হাতে দেয়। একজন আজানা লোকের কাছ থেকে পেয়ারা নেবার জন্যে তার মা ছেলের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকায়। ভৈরোর ইচ্ছে করে যে, এক তাড়া দেয় ঐ এক ফোঁটা ছেলের মাটাকে। রাগ তার বেড়েছে বুড়ো হয়ে। আগেই বা কি কম ছিল ! সে নিজেকে সামলে নেয়।

তুমি আমার নাতনীর সমান। নাতনীর ছেলেকে দুটো পেয়ারা দিয়েছি, তাই নিয়ে ছেলেকে বকছো ? কি যে আজকালকার দুনিয়ার দস্তুর হয়ে উঠেছে, বুঝিও না। সেকেলে লোক আমরা।...ছেলের মা অপ্রস্তুত হয়ে হাসে। ছেলের বাপ ভৈরো নাটের সঙ্গে গল্প জমবার চেষ্টা করে।

ভৈরো গল্প করে তার গাঁয়ের। কত পুরাণো কথা।...

...বেবুদপুর জানো না। ঐ যে গো গড়মোগলাহা ইস্টিশানে নেমে যেতে হয়। ইস্টিশানের সেই লাল লাল করবী ফুলগুলো, আমরা যখনি গাঁয়ে যাই তুলে নিয়ে যাই মেয়েদের জন্যে। কতবার ডাল নিয়ে গিয়ে লাগালাম বাড়িতে কিছুতেই লাগলো না।...বল কি লিব্‌ড়ী নদীর নাম শোনোনি ? লিব্‌ড়ী নদী একেবারে পাকিয়ে ধরে আছে বেবুদপুর গাঁ-খানাকে, ঠিক যেমন করে এস্রাজের কানগুলোকে তার জড়িয়ে ধরে

থাকে। এপারে বেবুদপুর, ওপারে মুড়ষাণ্ডা। নদী ছোট হলে কি হবে বোশেখেও এক হাঁটু জল থাকে। আর সে নদীর মজা জানোতো? জলের নীচের 'দাম'-গুলো তামার মত রং, আর শীতের শেষে হয়ে ওঠে আলতা আবীরের মত লাল। জলে হালকা ঢেউ লাগলেই দুলে দুলে ওঠে;—বললে বিশ্বাস করবে না একেবারে ঠিক, নাচের সময়ের, ঘাঘরার পাড়টার মত দেখতে লাগে। এই নদীই যেখানে গিয়ে বারণ্ডি নাম হয়ে গিয়েছে, সেখানকার 'দাম'-গুলো দেখবে মিশকালো। ঐ জল যিনি খেয়েছেন তাঁরই গলগণ্ড। কিন্তু বের কর দেখি একটা গলগণ্ডওয়ালা লোক বেবুদপুরে। ওপারের মুড়ষাণ্ডায়, নদীর ওপরই খাঁ সাহেবদের দেউড়ি। খাঁ সাহেবদের নাম শোনোনি? বরসৌনির নবাব পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা তাদের; জেলার মধ্যে অমন খানদানী আর ক'জন আছে।...

সম্মুখের ছেলেটার বাবা হাই তুলতে তুলতে বিড়ি ধরায়। তার আর এই বুড়োর একটানা ভ্যাজর-ভ্যাজর গল্প ভাল লাগছে না। সে জন্য কথা পাড়বার জন্যে বলে—কি আস্তে আস্তে গাড়ি চলছে; কাটিহার যে কখন পৌছুবে, কে জানে! সকাল হয়ে যাবে বোধ হয়। এঞ্জিনের ডেরাইভারগুলো সব ভেগেছে পাকিস্তানে,—মুসলমান ছিল কি না! এখন কি ভিড় চলেছে কাটিহারে। হিন্দুরা কেউ পার্বতীপুরের গাড়িতে যাচ্ছে না, কাটিহার হয়ে ঘুরে যাচ্ছে। পূবের গাড়িতে হিঁদু মেয়েছেলেদের বেইজ্জত করে গয়না কেড়ে নেয়, বাক্স-পেঁটরা খুলে জিনিস বার করে নেয়। তাই পূবের গাড়িতে আজকাল চড়ে খালি মুসলমানেরা...

ভৈরো বুঝতেই পারে না আজকালকার ছেলেদের এই সব নতুন নতুন কথা। তাদের জাত হিঁদু-মুসলমানের তফাৎ করেনি কোনদিনই। গানবাজনার আবার হিঁদু-মুসলমান কি? সে জন্যই না বামুনছত্রিরা ঠেস দিয়ে বলে যে কেবল গলার স্বরটুকু বেচলেই যদি নাট্টীনদের দিন

চলতো, তা'হলেই ওরা মোছলমানকে মোছলমান ভাবতে পারত। পারবে কোথা থেকে ?···

আজব বদলে গেছে দুনিয়াটা, এই ক'বছরে।···সে আবার নিজের গাঁয়ের কথা পাড়ে।

···আজকালকার মূড়ষণ্ডার জমিদারের নাম জিজ্ঞাসা করছ ? আমজাদ আলি খাঁ। আহা, বেঁচে-বর্তে থাকুক, বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক। বয়স হল—বিশ আর চোদ্দ এই চৌত্রিশ বছর হবে। তার বাবা শকুর খাঁ ছিল ভারি ভাল লোক। কড়ার কাছে কড়া, নরমের কাছে নরম। থরথর করে কাঁপতো তার নামে আশপাশের জমিদাররা। যেমন চড়তে পারত ঘোড়ায় তেমনি ছিল তার বন্দুকের নিশানা। চলতি ঘোড়া থেকে বুনোহাঁস মারত বন্দুক দিয়ে। দারোগা পুলিস তার নাম শুনে ডরাতো। সবাই জানত যে সে ডাকাতদের বন্দুক আর ঘোড়া ধার দেয়, নামজাদা ডাকাতদের বরকন্দাজ রাখে, তবু কলেক্টরের দম ছিল না তাকে ধরবার। একবার কলেক্টরের শিকারের তাঁবু পড়েছিল বেবুদপুরে। রাতে, তাঁবুতে খানা খাওয়ার সময়, কলেক্টর সাহেব, ঐ নিয়ে, কি যেন বলেছিল খাঁ সাহেবকে। আর যাবে কোথায় ! মরদের ব্যাটা চীৎকার করে বলে উঠেছিল,—জানেন কলেক্টর সাহেব, আপনি এখন রয়েছেন আমার এলাকায়। এখন যদি আপনাকে মেরে গুমও করে দিই তা'হলেও দশ মাইলের মধ্যের একটি লোকেরও সাহস হবে না পুলিসে খবর দেবার। লিব্‌ড়ির লাল দামগুলো দুটো ভুড়ভুড়ি কেটে আপনার লাসটাকে ঢেকে নেবে···

তারপর স্বর মোলায়েম করে নিয়ে বলে,—এটা সদর কলেক্টরী নয়। আমার রাজ্যে আপনার দাম ঐ দুটো ভুড়ভুড়ির বেশী না। আপনি আমার অতিথি আজ ; তাই জীবনে এই প্রথম অপমান বরদাস্ত করতে হচ্ছে শকুর খাঁকে। এরজন্য হয়ত আমার বাপঠাকুরদারা আমাকে

ক্ষমা করবেন না কোনো দিন।...সে আজ বহুদিনের কথা হল।...হ্যাঁ, তা বছর চল্লিশেক হবে বৈকি।...

সম্মুখের লোকটি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসে,—বুড়োটা মহাগপ্পে।...

ভৈরো নাট বোঝে যে এরা তার কথায় অবিশ্বাস করছে। চটে ওঠে সে...

হাসি কি? আমি নিজের কানে শুনেছি, আর তোমরা বিশ্বাস না করলেই হল। ভুট্নীর মা গুলিয়ার তখন সবে উঠতি বয়স। সে, আমি আর ভুট্নীর বাবা তিনজনেই ছিলাম তাঁবুর মধ্যে। আমার হাতে সারেঙ্গী; ভুট্নীর বাবা বসেছে ডুগিতবলা নিয়ে।......সেদিন আর গুলিয়ার নাচগান জমেনি তেমন, তারপর।...

সহযাত্রীদের মুখে-চোখে একটা প্রশ্নের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেয়েটির কৌতূহলই সব চাইতে বেশী।—কলেক্টর সাহেবের তাঁবুতে রাতে গান গায় এদের মেয়েরা, এ সঙ্গে সঙ্গে সারঙ্গী ধরে!

...তোমরা কোন জাত?

নাট্। নাট্। আমাদের সারা গাঁথানাতে নাট্ ছাড়া আর অন্য কোন জাত নেই। সকলেরই জমি আছে; শকুর খাঁর ঠাকুর্দা সকলকেই দু'চার বিঘা করে দিয়ে গিয়েছিল। এখন তার থেকে যে যা রাখতে পেরেছে, তার তাই আছে। শকুর খাঁর ঠাকুর্দার আমল থেকে আমাদের কারও খাজনা লাগে না।...

নাট্। তাই বল। শ্রোতাদের মুখচোখ পাথরের মত কঠিন হয়ে ওঠে। কেউ নিস্পৃহভাবে খয়নি ডলতে বসে, কেউ আলোর কাছে টিকটিকির পোকা খাওয়া দেখে; তাদের অনেক সময় নষ্ট করিয়েছে এই বুড়ো নাট্টা। ছোট ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে মাথা দিয়ে। একটা পেয়ারা এখনও তার হাতের মধ্যে রয়েছে। মা সেটাকে

ঘুমন্ত ছেলের মুঠো থেকে বার করে নিয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ফেলে দেয়।

ভৈরো বোঝে সব। চুলগুলো তার রোদে পাকেনি। নিজের জাতের কথাটা এত লোকের মধ্যে বলা, সত্যিই ভুল হয়েছে তার। গল্পে গল্পে কখন বলে ফেলেছে, ঠাহর করতে পারেনি। বুড়ো বয়সে এত আটঘাট বেঁধে কথা বলাও শক্ত।...আচ্ছা, দুনিয়াটা এত বদলাচ্ছে, তার জাতের সম্বন্ধে লোকের মত বদলায় না কেন? এদিকে তো ভোজে-কাজে, বিয়ে-পরবে সব বড়লোকের বাড়িতে তাদের ডাক পড়ে। মেলায় মেলায় নাট্টীনদের তাঁবু পড়ে। ঘুঙুরের শব্দ শুনলেই ছেলেবুড়ো মেয়ে-পুরুষ তাঁবুগুলোর ওপর ভেঙ্গে পড়ে। নাট্টীন নাচে, নাটু বাজায়, নাট-নাট্টীন দু'জনে মিলে গান গায়। কত ছকরবাজি, ভমর, বলবাহি, যোগিরা, বিদেশিয়ার নাচ। এর মধ্যে হতশ্রদ্ধা করবার কি আছে লোকেদের? গানের কলি শেষ হওয়ার পর, নাট্টীন যখন থালা হাতে করে নাচতে নাচতে দর্শকদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তখন কে না একটু মিষ্টি হাসি দেখবে বলে, দু'চারটে পয়সা ফেলে দেয় থালার ওপর। অবধপুরের মাইফেলে, গুজরী নাট্টীনকে কে বেশী পয়সা দিতে পারে তাই নিয়ে মনোহর মিসির পত্তনীদার, আর তার ছেলেকে রেষারেষি করতে দেখছি।......বিহিপুরায় অলখ্‌প্রসাদ আর তার শরিক, কি যেন তার নাম, নামধাম কি আর কিছু মনে থাকে আজকাল,—দু'জনেরই বাড়িতে একই দিনে পড়েছিল বিয়ে। বিয়েতে মুজরার বায়না করতে দু'জনেই এসেছিল বেবুদপুরে। খোশোনাট্টীনকে কি খোশামোদ, কি খোশামোদ! অত উঁচু জাতের লোকটা। অলখ্‌প্রসাদ পা জড়িয়ে ধরেছিল খোশোনাট্টীনের। বলেছিল যে খোশো যদি তার শরিকের বাড়িতে সেদিন মুজরা গাইতে যায়, তাহলে নাকি দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে অলখ্‌প্রসাদকে।...আরও কত কি দেখেছে ভৈরো।

ঐ মোটা মোটা পৈতেওয়ালা বামুন-ছত্রিদের। সব কথা বলবারও না।...
কারে সিংয়ের পাগড়ী-পরা ছেলেটা, যেটা নিজের রাজপুতগিরি ফলানোর জন্যে মাইফেলের মধ্যে হাঁটু তুমড়ে বীরাসন হয়ে বসে, সেটার পেটে এক ঢোক পড়ার আগেই সে বলতে আরম্ভ করত যে, গুজ্‌রী নাট্টীন যতক্ষণ না তার নিজে হাতে সাজা পানের খিলি এঁটো করে দিচ্ছে ততক্ষণ সে পান খাবে না; কিছুতেই না।...কত দেখেছে ভৈরো।

আরে শ্রাদ্ধের ভোজে এক লাইনে বসে খেতে বলছি না...কথা বলতেও কি ছোঁয়াচ লাগে নাকি? আমার কথা শুনলেও কি কানে ফোস্কা পড়্‌বে? তোদের মত আমরাও গেরস্ত, ছিলেপিলে নিয়ে ঘরসংসার করি, চাষবাস করি। বেবুদপুরের কোন্ নাট্‌টার জমি নেই বল!...আচ্ছা বাবা, শীতের মধ্যে রেলের জানালা দিয়ে অন্ধকার দেখলেই যদি তোদের উঁচুজাতের উঁচু ইজ্জত বাঁচে, তবে বাঁচিয়ে নে সেটুকু।...

সত্যিই, শীতটা বড় বেশীই লাগছে। গল্প করতে পারলে একটু কমতো। জোরে গান ধরবে নাকি, একটু অন্যমনস্ক থাকবার জন্যে? না, থাক। নাটের নাম শুনেই এরা নাক সিটকেছে, গান শুনলে এরা কি যে করবে ভেবে পাবে না।......একখান কম্বলে কি শীত যায়। একেবারে হাড়সুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলছে। রক্তের জোর কমে আসছে তার। জেলের মধ্যে আর যাই হোক শীতের ভয় ছিল না। পুরোনো লাইফার কয়েদী সে, তার উপর মেট; চারখানা কম্বল জোগাড় করেছিল সে।...ভুট্‌নীর জন্যে কেনা শাড়িখান একপাট কম্বলের নীচে দিয়ে নিলে হয়। ওখানকার আবার পাট ভাঙ্গবে ব্যবহার করা জিনিসটা ভুট্‌নীকে দেবে নাকি? এখনো এমন কিছু জমে যায়নি শীতে সে। কাপড়খানাতো সঙ্গেই আছে, সেরকম দরকার পড়লে তখন গায়ে দিলেই হবে।...শাড়িখান ঠিক আছে তো? চোর ডাকাতের মধ্যে থাকতে থাকতে সে সকলকে আর বিশ্বাস পায় না।

অন্যদিকে তাকিয়েই সে নতুন কাপড়খানার উপর হাত দেয়।… একি! একেবারে ভিজে গিয়েছে! পুদিনার গাছটার শিকড়ের কাছের ভিজে কাদার তালটা থেকে বহুক্ষণ ধরে ঘোলাটে জল চুঁইয়ে পড়েছে শাড়িখানার উপর। একেবারে নতুন কাপড়খানার উপর কাদার ছোপ পড়ে গিয়েছে। ছি ছি! কি করে দেবে সে এ কাপড় ভুট্নীর হাতে?

সব রাগটা গিয়ে পড়ে পুদিনার গাছটার ওপর। ঐটাইতো যত নষ্টের গোড়া! কেন মরতে গিয়েছিল সে, ওটাকে জেল থেকে আনতে! টান মেরে সে ফেলে দেয় কাগজে মোড়া গাছটাকে গাড়ির জানলা দিয়ে।

কতকালের সাথী তার এই গাছটা। আজ কত বছর থেকে তিনি নম্বর ওয়ার্ডের উঠনে এটাতে প্রত্যহ জল দিয়েছে! গাছটার উপর একটা মায়া বসে গিয়েছিল বলেই এটাকে সঙ্গে এনেছিল। ভেবেছিল বেবুদপুরে তার বাড়ির কুয়োর ধারে ঐটাকে পুঁতবে, গরমের সময় তার অঙ্গনে গাঁয়েব নাট্-নাট্নীনরা 'বলবাহি' নাচের মহলা দিতে এলে সকলকে পুদিনার শরবত খাওয়াবে। সত্যিই তো, গাছটা কি দোষ করেছিল?…সমাজের মাথার কি এত রগচটা হওয়া সাজে! সর্দার সে! সারা নাট সমাজের ভাল-মন্দ দেখবার ভার তার ওপর। তার মাথা রাখতে হবে ঠাণ্ডা। চোখ কান রাখতে হবে খুলে। ধৈর্য ধরে সকলের কথা শুনতে হবে, বিচার করতে হবে, পরামর্শ দিতে হবে। নইলে লোকের তার কাছে এসে লাভ কি! সমাজের অছিগিরি তার হাতে সঁপে দিয়ে, তার বাপ-পিতামোর আত্মারা স্বর্গে দেবতাদের সম্মুখে গান-বাজনা করছেন। আর সে যদি রাগের মাথায় নিজের জাতের কাজ ঠিকমত না করতে পারে, তাহলে কি আর তাঁদের মনে সে শান্তি থাকবে?…

তবে পনের বছর আগে রাগের মাথায় সে যে কাজটা করে ফেলেছিল, তার জন্যে সে অনুতপ্ত নয়। নিজের সমাজের জন্য তাকে ওকাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু তবু···তবু মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে বেঁধে মাঝে মাঝে।···খাঁ সাহেব লোকটা ছিল ভারি উঁচুদরের। বেবুদপুরের সব প্রজাদের নিজের ছেলের মত ভালবাসতো। শীতের শেষে যখন পশ্চিমে ধুলোর ঝড় আরম্ভ হত, তখন নাট্টীনরা সব মেলা সেরে ফিরে আসত গাঁয়ে। খাঁ সাহেব তখন নিজে এসে ভৈরোর বাড়িতে সব নাট-নাট্টীনদের ডেকে পাঠাতেন। গরীবের বাড়িতে খুদকুঁড়ো যা জুটতো খেতেন। তারপর সব নাট্টীনদের বখশিস করতেন। অন্য জমিদারদের মত না; সেগুলোতো প্রজাদের বাড়ি গেলে, তাদের কাছ থেকে নজরানা নেয়। কি মিষ্টি রসিকতা করে হেসে কথা বলতেন, নাট্‌-নাট্টীনদের সঙ্গে সেদিন! চোপে ছানিপড়া খোশো নাট্টীনের বুড়ী মা-টা পর্যন্ত তাঁর মিষ্টি কথা থেকে বঞ্চিত হত না।···গুণীর আদর জানতো শকুর খাঁ। জেলার সব জমিদারের দরবারে যাবার সুযোগ হয়েছে ভৈরো নাটের; খাঁ সাহেবের মত নাচগানের সমঝদার লোক সে দেখেনি। বেবুদপুরের প্রত্যেকটি নাট্‌-নাট্টীনই জানে যে খানদানী মুসলমানরাই নাচ-গানের কদর সব চাইতে ভাল বোঝে।···খালি মুড়ষাণ্ডায় কেন, চকসিকান্দার, নাগড়া, মোয়াজ্জেমগছ, বিরসৌনী, যেখানে খুশী যাও; সব জায়গার মুসলমান 'রইস'রা গুণীর আদর করতে জানে। কিন্তু বেতালা পা ফেলুক তো একটা নাট্টীন নাচের সময়। সঙ্গে সঙ্গে তবকমোড়া পানের রেকাবী আসবে নাট্টীনের সামনে; থামো, তোমার পালা শেষ হয়েছে; বখশিস নিয়ে চলে যাও। বৈঠক-খানায় অন্য মুজরার দলের ডাক পড়বে।···এইজন্যই না নাটরা হিঁদু-মোছলমানের মধ্যে তফাত করে না। এইত বেবুদপুরের নাট্‌রা হিঁদু, আর এই যে থাপদা আছে না, জেলার মধ্যে সবচাইতে বড়

নাট্‌দের গাঁ। সেখানকার নাট্‌রা আবার মোছলমান। ভোজে কাজে ভৈরোরা নেমতন্ন পর্যন্ত খেয়েছে, খাপদার নাট্‌দের ওখানে।...

বাপঠাকুর্দার কাছে আর দশজন নাটের মত ভৈরো নাট্‌ও ছোটো-বেলায় শুনেছে তাদের সমাজের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা। দেবতারা তাদের গান শুনতেন। রাজরাজড়ারা ধনদৌলত উজাড় করে ঢেলে দিতেন নাট্টীনদের পায়ে। তাদের সলা নিয়ে রাজ্য চলত। বামুনরা পর্যন্ত তাদের ইজ্জৎ দেখানোর জন্যে, তাদের দুয়োরে এসে বসতো।... আর এখনকার বামুন-ছত্রিরা বলে,—নাট্‌দের সমাজের আবার বিধি-বিধান!...করুক তো দেখি বেবুদপুরের কোন লোক বিয়ে, নাট্‌জাতের বাইরে। তাকে আর গাঁয়ে ফিরতে হবে না তা'হলে। অন্য জাতের মেয়ে ঘরে এলে, গান গাইতে পারবে নাট্টীনদের মত? কাসিমগড়ের কুমারসাহেবও যদি কোন নাট্টীনকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে সে পর্যন্ত সর্দারের অনুমতি পাবে না। গান শোনবার জন্যে কোন নাট্টীনকে খাস রাখতে চায় কুমারসাহেব, তা সে পেতে পারে। বাপপিতামোর পেশা চালানো, কেবল নিজের পেট চালানোর জন্য নয়, ওতে যে সাত পুরুষের আত্মার তৃপ্তি হয়। নাট্টীন নাচগান বন্ধ করলে যে তাঁদের নরকে পচতে হবে।...শকুর খাঁ ছাপার অক্ষরে লেখা এত্ত বড় বই দেখে বলেছিল যে, সেকালেও নাট্টীনরা দেবতাদের গান-বাজনা শোনাতো, কিন্তু বিয়ে করত না!...ভারি পণ্ডিত লোক ছিল শকুর খাঁ। মৌলবীর কাছে ফার্সী পড়ে এসেছিল পশ্চিম থেকে ছোটবেলায়।...এমন লোকটার কথা ভাবতে গেলে, হয়ত একটু অনুতাপের গ্লানি জমে ভৈরোর মনের মধ্যে।...কিন্তু সমাজের ভালমন্দ সর্দার না দেখলে আর দেখবে কে? ঐ আজকালকার ছেলে-ছোকরারা? ঐ যে কিস্থন নাটের ছেলেটা, যেটা গানের আসরে বাবুর মদের গেলাসে সেঁকোবিষ দিয়ে দিয়েছিল, ঐ সবতো আজকালকার ছেলে। এক ওয়ার্ডের মধ্যে এক সঙ্গে থেকেও,

এতদিনের মধ্যে ভৈরো তার সঙ্গে কথা বলেনি—ঘেন্নায় ।...ফুদিয়া নাট্টীনের স্বামীটা ; সেটাও তো আজকালকার ছেলে। সেটা আবার বলে কিনা ফুদিয়াকে মেলায় আর মুজরাতে গাইতে দেবে না। এইতো আজকালকার সমাজের ছেলের নমুনা! ফুদিয়া কেঁদে-কেটে আকুল ; এসে কেঁদে পড়ে ;—তুমি একটা এর বিহিত কর সর্দার !...সে কি আজকের কথা হল !...

বেবুদপুরে এত নাট্টীন আছে ; সকলেই তো তার মেয়ে কিংবা নাতনী ; কিন্তু তার মধ্যেও ভুটনীটাকেই সব চাইতে ভাল লাগে কেন ? সত্যিই এটা তার একটু একচোখোমি বই কি। ভৈরো দোষ কাটানোর জন্য মনকে প্রবোধ দেয়, মা-বাপেই ব'লে নিজের সব ছেলেমেয়েকে সমান চোখে দেখতে পারে না, তার আবার সর্দার। ভাল লাগা না লাগাটুকু নিক্তির ওজনে সমান করে ভাগ করে দেওয়া বড় শক্ত। সে পারতো সেকালে সর্দাররা, বাপঠাকুর্দার কাছে যাদের গল্প শুনেছে, তারা ছিল অন্য মানুষ। সে সব কি আর ভৈরো-টৈরোর মত সামান্য লোকে পারে ? আর ভুটনী নাট্টীনের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কও আছে ভৈরো সর্দারের ! ভুটনীর ঠাকুর্দা ছিল ভৈরোর খুড়তুতো ভাই ! মেয়েটার আবার কার সঙ্গে বিয়ে হল কে জানে ! ফুদিয়া নাট্টীনের মত সন্দেহবাতিক স্বামী আবার তার না জোটে ! বড় মিষ্টি গলা ভুটনীর। কত নাট্টীনকেই তো সে নাচগান শিখিয়েছে ! কিন্তু ভুটনীটার মত অত তাড়াতাড়ি শিখতে আর কেউ পারেনি ! বল্লে বিশ্বাস করবে না, এক দিনের মহলায় সে"রামগড়ের জোড়া কেল্লা"র নাচ আর গানটা শিখেছিল ! তখন তার কতই বা বয়েস ! ওদের পরিবারটার সকলকারই অমনি বুদ্ধি—গলা ভাল, আর রঙের জেল্লার তো কথাই নেই ! সাধে কি আর এই পরিবারের সেরা মেয়েরা আবহমান কাল থেকে মুড়ষাওার খাঁ সাহেবদের গান শোনাবার জন্যে বাঁধা নাট্টীন থাকে ! সে মেয়েকে মেলায় আর মাইফেলে

যেতে দেওয়া হয় না। দরকারই বা কি ? যতদিন বাঁচবে, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে আসবে মুড়ষাগু্ডা দেউড়ি থেকে !

ভুট্নীর মা ভারি চালাক। মেয়ের চোদ্দ বছর না পেরোতেই তাকে করে দিল মুড়ষাগুার জমিদার বাড়ির খাস নাট্নীন। মেয়ে পাবে পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে, মা-ও পাবে পঞ্চাশ টাকা করে পেন্সন। বড় মজা ! আরে, শকুর খাঁ-ই কি আর এ চালাকি ধরতে পারেনি ? লোক চরিয়ে খায় সে। ব্যবস্থাটা তারও মনের মত হয়েছিল। তাই সে, না করেনি।

সেটা ছিল শ্রাবণ মাসের কথা। বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছে। খাঁ সাহেবের বৈঠকখানায় মা-মেয়ে দু'জনেই হাজির ছিল গান শোনাবার জন্য। শকুর খাঁর এক গেলাসের ইয়ার, চক-ইসমাইলের মোয়াজ্জেম মিয়াও হাজির ছিল, ঐ জলসাতে। শকুর খাঁ কি একটা ফার্সী ছড়া কেটে তার মানে বুঝিয়ে দিলেন ;—"ঝরা পাতার বোঁটার খাঁজ থেকে বেরিয়ে আসে নতুন পাতার কলি, এরই নাম দুনিয়া।" মালিকের ছেলে আমজাদ আলি খাঁ আতরদান এগিয়ে দিল ভুট্নীর দিকে, মালিক নিজে পানের রেকাবী তুলে ধরলেন ভুট্নীর মায়ের সামনে। সব মনে আছে ভৈরো নাটের।...এর মাসকয়েক পরই তো ঘটলো সেই ভীষণ কাণ্ড— সেই ফাগুনেই। হোলির দিন। ফাগুন নয়, কাল-ফাগুন বলে তাকে ভৈরো নাট্। হোলিই বটে ! সত্যিকারের হোলি খেলেছি ভুট্নীদের বাড়ির সমুখের রোদে ঝলসানো মাঠটায়। সে কি লাল ! কি লাল ! শুকনো বালি-মাটি, এত বালি যে, লাল করবীর গাছ লাগে না তা'তে। সে মাটিও টেনে শুষে শেষ করতে পারেনি সেদিনকার লালটুকুকে। তাজা খানদানী খুন কিনা ! এক মুহূর্তের বেশী সময় লাগেনি তার ভাবতে, আর সেই অনুযায়ী কাজ করতে। তারই জের টেনে চলেছে সর্দার আজ পর্যন্ত।...যত নষ্টের গোড়া ঐ চক ইসমাইলের মুয়াজ্জেম মিঞা। সেই

বছর। তাতে দু-দশজন ইয়ার-বন্ধুকেও নেমন্তন্ন ক'রে আনা হয়। বিসরৈলীর সিনহেশোয়ার মণ্ডল, সর্সির দুখমোচন সিং, আরও কাছেপিঠের অনেক গেরস্ত জমিদারের পায়ের ধুলো প'ড়ে সেদিন মুড়ষাণ্ডার হোলির জলসায়। তবু খাঁ সাহেব বলেছিল যে, এ বছরটা হোলির মাইফেলে ভুটনীর মা গুলিয়াই গাইবে। সে ছিল একটা লোকের মত লোক। সব বুঝত। সে কখনও ঐ একরত্তি ভুটনীটাকে হোলির মাইফেলের নেশাভাঙের ভিড়ের মধ্যে আসতে দেয়? আমজাদ আলির তো একথা শুনেই মুখ এই এত্তখানি গোমড়া হয়ে ওঠে। তার তখন মোচ উঠেছে। ইয়ার-দোস্ত জুটেছে। তারাও সব আসবে মাইফেলে। সে কি ঐ পেটমোটা গুলিয়া নাট্টীনের নাচ দেখতে? কিন্তু তার আব্বাজানকে কিছু বলার সাহসও নেই। ভৈরোকেই এসে ধরেছিল, মালিককে ব'লে ভুটনীকে হোলির দিন মুড়ষাণ্ডায় গাইতে দেবার জন্যে। হাজার হলেও মালিকের ছেলে; দু'দিন পর সেই হবে মালিক। সর্দারের দুয়োরে এসে দাঁড়িয়েছে একটা অনুরোধ নিয়ে। তবু সর্দার তার বাবরি-চুলভরা মাথাটা নেড়ে তাকে বলেছিল, "সে হয় না বাবুসাহেব। কিই-বা ওর বয়েস? হোলির মাইফেলের ধকল কি অতটুকু মেয়ে সইতে পারে?" মাথা নীচু ক'রে ফিরে গিয়েছিল আমজাদ আলি। তোমরাই ত মালিক; তোমরা তো রোজই ভুটনীর গান শোন। হোলির দিন না শুনলে কি হয়? আরে, আর এক-আধ বছর পরেই তো সে গাইবে, তোমাদের হোলির জলসায়। ছোকরাটার জন্যে সর্দারের দুঃখ হয়; ইয়ার-দোস্তদের কাছে একটু মাথা হেঁট হবে তার, নেমন্তন্ন ক'রে এনে ভুটনীর গান শোনাতে না পারলে। কিন্তু কি করতে পারে সর্দার। সর্দার তো নয়; সমাজের ভাল-মন্দর ঠিকেদার। জাতের বিধি-বিধান, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব তার কাছে আমানত রয়েছে। যখের ধনের মত সে আগলে থাকবে এগুলোকে, যতদিন বাঁচবে।

বিশ্বাসভঙ্গ সে করতে পারে না। সমাজ হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ে না; ঝুরঝুর ক'রে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে ঝরে পড়ে, একটু একটু ক'রে। সেই জন্যে না দরকার রাশ কসবার। কড়া শাসনে রাখতে হবে সকলকে; একটু ঢিল দিয়েছ কি আর ভাঙ্গন সামলাতে পারবে না।...

ভুটনী নাট্টীনের চক-ইসমাইলে যাওয়ার কথা ঠিক হ'য়ে গিয়েছে হোলির মুজরা গাইতে, এ খবর পেল ভৈরো নাট্ হোলির দিন ভোরবেলা। সূর্যিঠাকুর তখন সবে ফাগের খেলা আরম্ভ করেছেন লিব্‌ড়ীর ওপারের তাল আর শিশু-গাছগুলোর মাথায়। প্রাত্যহিক পশ্চিমে ধুলোর ঝড়টা তখনও আরম্ভ হয়নি। হঠাৎ বাড়ির দাওয়ার উপর থেকে, তামাকের ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে, ভৈরো নাটের নজর পড়ে নদীর ঘাটের দিকে। মালিকের গাড়ি না! বলদের 'খ্যাম্‌পনি'— স্প্রিং লাগানো—এত উঁচু যে, গাড়ির পিছনটাতেও জল লাগল না নদীর মাঝখানে—চকচকে পালিশ করা গাড়ির গা থেকে ভোরের আলো ঠিক্‌রে পড়ছে—লাল মখমলের পর্দা দেওয়া গাড়িতে—গাড়ির পিছনে উর্দী-পরা বরকন্দাজ হেঁটে আসছে। এ খাঁ সাহেবের গাড়ি না হয়ে যায় না। এ গাড়িখানা শকুর খাঁর খাস নিজের ব্যবহারের জন্যে। অন্য কাউকে চড়তে দেয় না। এক ছোট মালিক মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে চড়ে, বাপ বাইরে গেলে। পশ্চিম থেকে আনিয়েছিলেন বলদজোড়া। একেবারে উড়ে চলে। নদী পার হচ্ছে ব'লে এখন আস্তে চলছে। আস্তে হাঁটাওতো ওদের! নাক ছিঁড়ে যাবে তবু থামবে না। মালিকের খাস ব্যবহারের গাড়ি ব'লেই না বরকন্দাজটা গাড়িতে না চড়ে হেঁটে আসছে।...

সর্দার দেখে যে, গাড়ি এইদিকেই মোড় ঘুরলো।... ..ভুটনীর মাকে নিতে এল নাকি? এখান থেকে এইখানে; সে তো ওবেলা গেলেও

চলবে। এত তাড়া কিসের? ভৈরো নাগরা জুতো-জোড়া পরে, ভুট্নীদের বাড়ির দিকে যাবে ব'লে।

গাঁয়ের পথে তখনও লোক-চলাচল আরম্ভ হয়নি। বুড়োবুড়ীরা ছাড়া গাঁয়ে আর আজ আছেই বা কে? সব গিয়েছে ভিন গাঁয়ে, হোলির দিনের মুজরার বায়নায়। এইসব দিনগুলো ভৈরো সর্দারের ভারি ভাল লাগে। তার গাঁয়ের লোকদের এগুলো রোজগারের দিন। অঘ্রান, পৌষ, মাঘ—বছরের মধ্যে এই তিনটি মেলার মাস তাদের আসল রোজগারের সময়। তাও যেবার কার্তিক-অঘ্রানে জর-জারী বেশী হয়, সেবার সেটাও বন্ধ হ'য়ে যায়। এই জরকে নাট্টীনরা বড় ভয় করে। একবার ধরলে বচ্ছরকার মত রোজগার বন্ধ। তাই না ভৈরো সর্দার আশ্বিন থেকে ঘরে ঘরে ছাতিমের ছাল পৌঁছে দিয়ে আসে, নিজে হাতে। যাক্, বলতে নেই, রামজীর কৃপায় এবছর জর-জারীটা ছিল কম। নিশ্চয়ই ঐ সময়মত ছাতিমের ছাল বিলোনোর জন্যে। সর্দারের মন প্রসন্ন হযে ওঠে। সর্দার হওয়ার ধকল কি কম! সময়-মত ঠেক্না না দিলে সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে কি করে! জাতের মাথা সে। সমাজের জন্যে ভাবনা-চিন্তা তার থাকবে না ত কার থাকবে? তার গাঁয়ের লোকগুলো যখন পয়সা থাকে হাতে তখন মিছরী-গোলমরিচ-ঘি খুব খায়, আর যখন পয়সা থাকে না, তখন মালিকের বাড়ি গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ায়। এদের কি হিসেব ক'রে চলার ক্ষমতা আছে? সে উন্নতি কিছু না করতে পারুক সমাজের, অন্তত আগের সর্দারের কাছ থেকে যে অবস্থায় সমাজটাকে পেয়েছিল, তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় তার ওয়ারিশের হাতে ছেড়ে যেতে পারে না। সে ছোটবেলায় যত নাট্টীন দেখেছিল, এখন তার অর্ধেক দাঁড়িয়েছে। এটা সর্দারের পক্ষে কম লজ্জার কথা নয়! মুড়ঝাণ্ডার হাকিমসাহেব বলে যে, রক্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে নাট্টীনদের; তাই গাঁয়ে লোক কমে যাচ্ছে এত;

পারা শোধন করা অত সোজা না; মানা করি, গো-বস্তিগুলোর কাছ থেকে পারা কিনো না, তা সর্দার, তোমার গাঁয়ের লোকেরা শুনবে না।...হাকিম সাহেবকে শকুর খাঁ আনিয়েছিল দিল্লী থেকে, নিজের পরিবারের চিকিৎসার জন্যে।...

বলদের গলার ঘণ্টার শব্দ শুনে সর্দার থামে। ভুট্নীদের বাড়ির সমুখে পৌঁছে গিয়েছে সে! মুড়ষাণ্ডা দেউড়ির বলদ-জোড়াকে গাড়োয়ান পোয়াল দিচ্ছে তখন। বরকন্দাজটা ভুট্নীদের বারান্দায় পাতা খাটিয়া-খানায় ব'সে সবে খয়নি ডলবার যোগাড় করছে।

"কি মিঞা, গাড়ি এখানে যে ভোরে ভোরে?"

"কেন জান না? ভুট্নীর বাপ বলেনি? ওতো গিয়েছিল পরশু দিন মালিকের কাছে। মালিক ওকে বলে দিয়েছিলেন যে, ভুট্নীকে আজ হোলির মাইফেলে যেতে হবে চক-ইসমাইলে।"

বলে কি লোকটা! "ভুট্নীকে? মালিক বলেছেন?" বিশ্বাস হয় না ভৈরো নাটের।

বরকন্দাজ ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে দেয়—"ইয়ার-দোস্ত কোন জিনিস চাইলে, না করবে, এমন তরিবৎ মুড়ষাণ্ডার খাঁ-রা শেখেনি কোন কালে। হাত পেতে চাইছে একটা জিনিস তার দোস্ত। ইচ্ছা না থাকলেও না বলতে খানদানের ইজ্জতে বাধে।" ফাগের রঙ খেলে যায় সর্দারের চোখে।

"খবরদার! চোদ্দ বছরের নাট্নী যাবে হোলির মুজরা গাইতে? হোলির দিনের মাতলামীর-পাগলামীর মধ্যে যাবে ঐ একরত্তি মেয়ে? বলে দিগে যা ইজ্জৎবালা মালিককে যে ভৈরো সর্দার যেতে দেবে না ভুট্নীকে চক-ইসমাইলে।"

"ওরে, ও ভুট্নী।"

ভুট্নী বেরিয়ে আসে। বরকন্দাজটা তাকে ঝুঁকে সেলাম করে। মালিকের খাস নাট্টীনকে মালিকের মতই খাতির দেখানো রেওয়াজ।

ভৈরোর মনে হয় ভুট্নী ভয় পেয়েছে। "না রে, ভয় পাসনা ভুট্নী। তোকে যেতে হ'বে না চক-ইসমাইলে।"

ভুট্নীর বাবা গাড়ি ফিরে যেতে দেখে বলে—"মালিক আজ আর তোমাকে আস্ত রাখবে না।"

"ওরে আমার মালিকরে!" একখান কঞ্চি উঠিয়ে ভৈরো গাড়ির বলদ-জোড়ার পিঠে মারে।

"ভাগ্ জলদি আমার সমুখ থেকে।"

তারপর ভুট্নীর বাপকে শাসায়—"আজ বচ্ছরকার দিন না হলে তোকে জুতিয়ে ঠিক ক'রে দিতাম। মেয়ের বাপ হয়েছিলেন। আমাকে লুকিয়ে মেয়ে পাঠাচ্ছিলি চক-ইসমাইলে হোলির মাইফেলে! কত টাকা কবলেছে মোয়াজ্জেম মিঞা তোর কাছে? বল্, শীগ্‌গির বল্। এতক্ষণ গাড়োয়ান আর বরকন্দাজ এই বাইরের লোক দুটো ছিল ব'লে তোকে কিছু বলিনি।"...

ভৈরো তার হাত চেপে ধরেছে।

ভুট্নীর বাপ ধপ্ ক'রে মাটিতে ব'সে ভৈরোর পা জড়িয়ে ধরে। সকলেই জানে পা জড়িয়ে ধরতে পারলে, সর্দারের রাগ এক মিনিটে জল হয়ে যায়।

"নচ্ছার কোথাকার!"

পা ছাড়িয়ে নিয়ে রাগে গজরাতে গজরাতে ভৈরো দাওয়ায় উঠে বসে।

"কি যে কুড়ের বাথান হয়েছে গাঁখান! 'ভালা' (ভল্ল)-খান ভোরে উঠবার সময় আর তুলে রাখবারও ফুরসৎ হয়নি বাবুর।"

এদেশে সকলেই রাত্তে শোবার সময়, খাটিয়ার পাশে বর্শা, বল্লম, ভালা (ভল্ল) বা অন্য কোন হাতিয়ার হাতের কাছে নিয়ে শোয়।

ভুটনীর বাপ তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে ভালাটাকে মাথার উপর চালের বাতায় গুঁজে রাখে।

গুলিয়া তামাক সেজে মেয়েকে বলে, ভুটনী তুইই দিয়ে আয় সর্দারকে। সর্দারের রাগ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। রাগতেও দেরী লাগে না, রাগটা পড়তেও দেরী লাগে না তার। ভুটনী আবীর নিয়ে আসে বচ্ছরকার দিনে সর্দারকে প্রণাম করবার জন্যে। ভৈরোর মুখে হাসি ফুটে ওঠে!

"সারঙ্গী আর ডুগী-তবলায় আবীর ছুঁইয়েছিস ত আগে?"

সে আর ভুটনীকে বলতে হবে না।

যা নাছোড়বান্দা মেয়েটা! সেখানেই দাঁতন ক'রে মুখ ধুয়ে চারটি জলপান খেতে হয় সর্দারকে। এ-গল্পে-সে গল্পে এক পহর বেলা উতরে যায়। যে দুটো-চারটে বুড়োবুড়ী পাড়ায় ছিল, সেগুলোও গুটিগুটি এসে জোটে সর্দারের সঙ্গে গল্প জমাতে। কাল সকাল থেকেইতো মাইফেল-ফেরত নাট্টীনদের-আনা ঘিয়োর, ঠিকরি, মণ্ডার ছড়াছড়ি প'ড়ে যাবে গ্রামে। আজ কোন সময় দুটি চালে-ডালে ফুটিয়ে একবার খেয়ে নিলেই হবে।...আর সবচেয়ে বড় কথা, ভুটনীদের বাড়ির জর্দাটাও ভাল— 'লাখ্‌নৌপাত্তি' ছাড়া অন্য জর্দা, তার মা খায় না।...

বুড়োবুড়ীদের নিজেদের বয়সকালের হোলির দিনের গল্প সবে একটু জমে এসেছে। হঠাৎ তাতে বাধা পড়ে। ঘোড়ার খুরের শব্দ না? সকলের মুখে শঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে আসে। এত গল্প-গুজবের মধ্যেও সকলেই এই রকমই একটা কিছুর আশা করেছিল। নাটের হাতের অপমান বরদাস্ত করবে শকুর খাঁ! যে লোকটা কলেক্টরের দর ফেলেছিল লিব্‌ড়ির জলের দুটো ভুড়ভুড়ি!

…এতো অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ! কাছে এসে পড়েছে একেবারে, মোড়ের দেবদারু গাছটার কাছে,—কুয়োতলার কাছে!… ঘোড়ার খুরের শব্দতো নয়, যেন চুল্লীর উপরের ফুটন্ত লোহার টগবগানির শব্দ! বয়ে নিয়ে আসছে আগুনের হলকা রুক্ষ পশ্চিমে বাতাসে। ত্রস্ত উত্তেজনায় সকলে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কেবল দাঁতে দাঁত চেপে সোজা হ'য়ে বসেছে ভৈরো সর্দার খাটিয়ার ওপর,—ঝুরিভরা বুড়োবট হোলির হাওয়ায় ভেঙে পড়তে পারে না। ভয় দেখাতে এসেছে শকুর খাঁ? রামগড়ের জোড়া কেল্লার কালো পাথরের ওপর ঘোড়ার খুর আঁচড়ও কাটতে পারবে না; আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়লেও না! ঐ ক'টা ঘোড়ার খুরের ধুলোর সঙ্গে তার সমাজের এতকালের নিয়ম-কানুনগুলো, সে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে উড়িয়ে দিতে পারে না; এ কি হোলির ফাগ পেয়েছ? তাকে ওখান থেকে না নড়িয়ে ঢুকুক তো দেখি কেউ ভুটনীদের বাড়িতে।

শকুর খাঁর ঘোড়াটা ঘেমে কালো হয়ে উঠেছে; মুখ দিয়ে গেঁজলা বেরুচ্ছে। সঙ্গের বরকন্দাজ ক'টাও ঘোড়ার পিঠে। খাঁ সাহেবের হাতের মুঠোখানাকে চামড়ার বিনুনী করা চাবুকটা সাপের মত জড়িয়ে ধরেছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামে শকুর খাঁ। কেউটের মাথায় পা পড়েছে। কোথায় সেই কম্‌বখৎ ভৈরোটা! এত বড় আস্পর্দ্ধা, তার নিজের প্রজার!

ঝুঁকে সেলাম ক'রে সকলে পথ ছেড়ে দেয়। ভৈরো সর্দার খাটিয়া থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"আদাব হুজুর!"

কোনোদিকে তাকায় না শকুর খাঁ। আবার আদাব হুজুর! ঠাট্টা করছে বোধ হয় ভৈরো সর্দারটা।

কাটাঘায়ে নুনের ছিটে !

কমবখৎ ! মরদুদ ! হারামজাদা ! নেমকহারাম কোথাকার ! এই নে, আদাব হুজুর ! আদাব হুজুর ! আদাব হুজুর !

হোলির দিনে লাল বিন্নুনীর ছাপ পড়ে ভৈরো সর্দারের বুকেপিঠে।

সে কোন কথা বলে না। চালের বাতা ধ'রে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। মালিককে সে বেইজ্জৎ করেছে ঠিকই। অতবড় একটা লোক চটেছে; রাগটা পড়লে বুঝিয়ে বলবে তাকে। মালিকের হাতে মার খেলে কোন অপমান নেই সর্দারের পর্যন্ত। সাঁই সাঁই করে শব্দ হচ্ছে চাবুকটার। প্রতিবার শব্দটা হবার আগেই ভৈরো নিজের অজ্ঞাতে চোখদুটো বুজে ফেলছে, আর উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে ধরছে। কাছের সব লোক ক'টাই বোধ হয় তাই করছে।...

হাত ব্যথা হ'য়ে গেলে শকুর খাঁ থামে। বারান্দা থেকে নেমে সে ভুট্নীদের বাড়ির সদর দরজার দিকে যায়। "ভুট্নী কোথায় ? ভুট্‌নী ! সাজ-পোষাক নিয়ে চড় শীগ্‌গির গাড়িতে। এই গাড়োয়ান, বলদ খুলতে হবে না। তিন ঘণ্টায় পৌছে দিতে হ'বে ভুট্‌নীকে চক-ইসমাইলে। না হ'লে একটা শরীফ পরিবার বেইজ্জত হয়ে যাবে আজ। জলদি।"

"খবরদার !"

ক্ষেপে উঠেছে ভৈরো সর্দার। মাথার বাবারি চুলের বোঝা ফেঁপে ছড়িয়ে পড়েছে ঘাড়ে, কাঁধে, দু-চার গোছা মুখের দিকেও; ঠিক সিংহের কেশরের মত। পাহাড়ের উপর থেকে পশুরাজ নীচের নগণ্য মানুষের মত জানোয়ারটাকে একবার দেখে নিল। একবার মাথাটায় এক ঝাঁকি মেরে মুখের দিকে পড়া চুলের গোছাটাকে সামলে নেয়। মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটে যায়। চালের বাতা থেকে হেঁচকা টান মেরে সে বার ক'রে

নেয়, উপরে গোঁজা 'ভালা'টা। তার মালিকের ইজ্জৎ, আর তার সমাজের ইজ্জৎ দুটোর মধ্যে, একটাকে সে বেছে নিয়েছে। মন স্থির করতে সময় লাগেনি তার মোটেই। বরকন্দাজ দু'জন হাঁ হাঁ ক'রে দৌড়ে আসবার আগেই, 'ভালা'টার মনসাপাতার মত ফালাটুকুর সঙ্গে একটুকরো রোদের ঝলক ছুটে যায়। এতগুলো লোকের চোখের বিজলী তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। একটা ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে পড়ে যায় শকুর খাঁ।...

কাল-হোলি বলে এদিনটাকে ভৈরো।

হাকিমের কাছে সে সব কথা স্বীকার করেছিল বিচারের সময়।

সে আজ চোদ্দ বছর আগের কথা।...গাড়িতে তখনও হিন্দু-মুসলমান, পাকিস্থান-হিন্দুস্থানের একটানা গল্পের জের মেটেনি। ঝিমুনীও আসে না লোকগুলোর! একটুও সময় নষ্ট হবার জো নেই এদের!...

একটা ঝাঁকানি খেয়ে ট্রেণখানা থামে!...

কাটিহার! কাটিহার!

আরে জকসন এসে গিয়েছে এরই মধ্যে! এতক্ষণ সময় কি ক'রে কেটে গেল তা' সে খেয়ালই করেনি।

"গড়মোগলাহার গাড়ি কখন বলতে পার?"

কর্মব্যস্ত সহযাত্রীদের এখন আর উত্তর দেবার সময় নেই।

ভৈরো নাট তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে। সঙ্গের শাড়িখানা পাট ভেঙ্গে গায়ে দেয়নি এত শীতের মধ্যেও, তার জন্য মনটা খুশী হয়ে ওঠে। রাগের মাথায় তখন পুদিনার গাছটা না ফেলে দিলেই হত!...

প্লাটফর্মের ভিড় ঠেলে যাওয়া শক্ত। হিঁদুরা পার্বতীপুর লাইনের গাড়িতে কেউ যাবে না, তাই প্ল্যাটফর্ম লোকারণ্য হয়ে উঠেছে। একথা ভৈরো ট্রেণেই শুনেছিল।

পাশের ট্রেণখানায় এঞ্জিন লাগলো। তাহলে আর গাড়িখান ছাড়বার দেরী নেই। নিশ্চয়ই গড়মোগলাহার গাড়ি। সেদিকে ছুটে চলে ভৈরো।

টিকিট! টিকিট দেখাও।

এতটা পথ এসেছে ট্রেণে! কেউ এখন পর্যন্ত টিকিট চায়নি তার কাছে। ডেপুটি জেলরবাবু তাকে রেলের টিকিট ব'লে যে কাগজখান দিয়েছিলেন সেখান বের ক'রে দেয় ভৈরো। এই নিন্।

টিকিটবাবু কাগজখান দেখে বলেন, টিকিট কই? এতো জেলের কাগজ। এই কাগজ সেখানকার স্টেশনে দেখালে তাতে টিকিট পেতে সেখানে।

"আমিতো আর রেলকে ফাঁকি দিইনি হুজুর।" রাগে জলে ওঠেন টিকিটবাবু। "যত সব চোর-ডাকাত নিয়ে কারবার হয়েছে! আবার জেলে ঠুকে দেব। কিছু পয়সা-টয়সা আছে নাকি? ঐতো কাপড় দেখছি ভাঁজ করা।"

কেঁপে ওঠে ভৈরো নাটের মন। ভুট্‌নীর জন্যে কেনা শাড়িখানার ওপর দেখছি টিকিটবাবুর নজর। যা ভাড়া লাগে দিয়ে দিতে রাজী আছে সে।

"এই জল ফেলছ কেন গায়ে?" পাশেই গাড়ির জানলা থেকে একজন মেয়ে বদনার জল দিয়ে মুখ ধুচ্ছে। স্ত্রীলোকটি অপ্রস্তুত হয়ে সেদিকে তাকায়।

কে? সর্দার না। সর্দার দাদা।

ভুট্‌নী! দেখেই চিনেছে সর্দার।

তিন-চারটে টাকা যা হাতে ওঠে টিকিটবাবুর হাতে দিয়ে ছুটে আসে সর্দার সেই গাড়িতে।

কত দিন পরে দেখা! ভুট্‌নী তাকে প্রণাম করে। একটু গায়ে মাংস লেগেছে মেয়েটার। এতক্ষণে ভাল ক'রে দেখে সর্দার ভুট্‌নীকে। পোযাক-আশাক এমন কেন? মুসলমান মেয়েদের মত সালোয়ার-পিরান পরণে, তার উপর চাদর। একটা বোরকাও ঢিবি ক'রে রাখা হয়েছে পাশে। একটু কেমন কেমন যেন লাগে সর্দারের। সে হাসিখুশীই বা কই? সিঁদুর কই সিঁথিতে? বিধবা হয়েছে নাকি মেয়েটা এরই মধ্যে?

"একা যে?"

"না, একা না। আমজাদ আলী গিয়েছে চা খেতে।"

"তাই বল। মালিকও সঙ্গে আছে তাহ্‌লে। কতকাল তাকে দেখিনি। সে আবার আমার সঙ্গে কথা বলবে ত—?" সেই কাল-ফাগুনের কথা মনে পড়ে ভৈরোর।...

"হ্যাঁ। কত কথা বলেন তোমার।"

"কোথায় গিয়েছিলি তার সঙ্গে। আজকাল একা একাই মালিকের সঙ্গে হিল্লি ডিল্লি করে বেড়াচ্ছিস বেশ। ভাল মালিক পেয়েছিস! নতুন মালিক জমিদারীর কাজকর্ম চালাচ্ছে কেমন? আমাদের গাঁয়ের ওপর সু-নজর আছে তো বাপ ঠাকুর্দার মত? গাঁয়ের খবর কি? সিরি নাট বেঁচে আছে? সে আর আমি এক বয়সী। গুজরী নাট্টীন? ফুদিয়া নাট্টীনের কি ছেলে-মেয়ে?"

ভুট্‌নীর ছেলেমেয়ে বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে ভৈরোর। কিন্তু কি জানি মেয়েটার স্বামী যদি মারা গিয়ে থাকে ও সব কথা আর পথের মধ্যে জিজ্ঞাসা ক'রে মন খারাপ করবে না। সে নিজেকে সামলে নেয়।

সর্দারের অজস্র প্রশ্নের কোন্‌টার উত্তর দেবে ভুট্‌নী।...সর্দারদাদু তার সেই জেল যাওয়ার আগের পুরানো দুনিয়াতেই আছে। প্রশ্নগুলির সত্যি জবাব দিয়ে বুড়োর মনে দুঃখ দিতে মন সরে না ভুট্‌নীর। কি

জবাব দেবে তা সে ভেবে পায় না! ক্ষমতার মধ্যে থাকলে সে এখনও ফিরে যেতে চায় তার গ্রামে; এই বুড়ো সর্দারের সঙ্গে।...

...বড় অসহায় মনে হত তা'র, ভাঙ্গন ধরা গাঁয়ে। সমাজ চুরচুর হয়ে গিয়েছে। সর্দারের বাড়ির ইঁদারাটাকে বেড় দিয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড বটগাছ। আসবার সময় ভুট্‌নী সেই গাছটায় ঝুলিয়ে এসেছে তার ঘুঙুরগুলো। গুজরীদের পরিবার চলে গিয়েছিল খাপদায়, পাঁচ-সাত বছর আগে; সেখানে মুসলমান নাটদের গাঁয়েই সংসার পেতেছিল নতুন করে। আজ কোথায় কে জানে! সিরি নাটের নাতনীটার কি সুন্দর গলা হয়েছিল! সেটা ধরমগঞ্জ মেলায় যে থিয়েটার কোম্পানী এসেছিল তার ম্যানেজারটার সঙ্গে চলে গিয়েছে। খোসো নাট্টীনের ছেলেটা মাথায় পাগড়ি বেঁধে শহরে চেনাচুর বেচে। হরবঁশিয়া নাট্টীনের ছোট নাতিটা এই কাটিহার স্টেশনেই গান গেয়ে গেয়ে বই বিক্রি করে! ফুদিয়ার মেয়েটা পান বেচে গড়মোগলাহার বাজারে। হোলিয়া জলসা করা, দশ-বারো বছর আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল, সব মুসলমান 'রইস'রা—মুড়ষাণ্ডার বাবুরা পর্যন্ত।...সাধে কি আর সে নিজের সমাজ ছেড়েছে, নিজের গাঁ ছেড়েছে। কিন্তু এত কথা বুড়ো সর্দারকে বলতে মায়া লাগে,—বড় আঘাত পাবে। সর্দারের বুকে-পিঠেই মানুষ সে ছোটবেলায়। তারই জন্যে সে এত বছর জেল খেটেছে। জেল থেকে বেরিয়ে সর্দার তার বিয়ে ঠিক করে দেবে, এইজন্য প্রথম বয়সটায় বিয়েও করেনি ভুট্‌নী।...তার ওপর ছিল আমজাদ আলী। বাপ মারা যাওয়ার পর তার খানদানের আভিজাত্য বজায় রাখতে সে একটুও ত্রুটি করেনি। নিরবচ্ছিন্ন সোহাগের মধ্যে সে ডুবিয়ে রেখেছিল ভুট্‌নীকে, ভুট্‌নীরও তাকে ভাল লাগত খুব। কিন্তু নাটদের সমাজের কথা মনে ক'রে, সর্দারের কথা মনে ক'রে, সে আমজাদ আলীকে বিয়ে করতে রাজী হয় নি। আমজাদ আলী তখন ভুট্‌নীর জন্যে পাগল। তার মা ছেলের

মতিগতি দেখে ভুট্‌নীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। শেষে একজন নাট্রীনকে বিয়ে করবে তাঁর ছেলে! কেঁদেছিলেন ভুট্‌নীর কাছে, তাকে অনেক টাকা দিতে চেয়েছিলেন। ভুট্‌নী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল— আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন মালকাইন। মুসলমান ব'লে নয়। খাপদার মুসলমান নাটকে আমি দরকারে পড়লে বিয়ে করতে পারি। তাতে আমার সর্দার খুশী না হলেও চটবে না। কিন্তু বিয়ে ক'রে নিজের নাচ গানের পেশা ছেড়ে দেওয়া, একথা শুনলেই সর্দার রেগে আগুন হ'য়ে উঠবে। টাকা দেবার দরকার নেই মালকাইন। আপনাদের নিমক খেয়েই তো বেঁচে আছি। মালকাইন তাঁর পুরোনো এক জোড়া মাকড়ি তার কানে পরিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। এখানেই এ পর্বের শেষ হ'য়ে যায়নি। আমজাদ আলী তার মাকে দেখানোর জন্যে বনিয়ারী-শরীফের পীরসাহেবের কাছ থেকে ফতোয়া এনেছিল যে, নাট্রীনকে মুসলমান ক'রে নিয়ে বিয়ে করায় পুণ্য আছে। তবু ভুট্‌নী নিজের মতের নড়চড় হতে দেয়নি, কেবল সর্দারের কথা ভেবে। তাদের পরিবারে তখন এক ভুট্‌নীই বেঁচে; আর তার পরিবারই, নাট সমাজের মধ্যে আভিজাত্যের মর্যাদায় সব চাইতে বড়। সর্দার গিয়েছে জেলে, তাদের সমাজের ইজ্জৎ বাঁচাবার চেষ্টা করার অপরাধে। কাজেই কবে কি করে ভুট্‌নীর মাথাতেই এসে পড়েছিল, সর্দারের দায়িত্বটুকু তা' সে বুঝতেই পারেনি। ভেবেছিল সর্দার ফিরে আসুক, তারপর তার আমানতী বোঝা ফেরত দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে! গাঁয়ের আর জাতের দেখাশুনো করা কি মেয়েমানুষের কাজ! সামলাতে পারবে কেন সে? তবু সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। বছর কয়েক পর বেবুদপুরে গুজব রটল যে সর্দার জেলে মারা গিয়েছে। বয়সও তো হয়েছিল! আহা নিজের গাঁয়ে মরতে পেল না, নিজের জাত বেরাদারের হাতের আগুন পেল না! এ খবরে একবারে মুষড়ে পড়ে ভুট্‌নী। এরই জন্যে কি সে একটি একটি ক'রে দিন

শুনছিল এতদিন ধ'রে!···এরই মধ্যে মহাত্মাজীদের রাজত্ব হয়েছে দেশে। আমজাদ আলী বলে যে, তারা নাকি জমিদারী কেড়ে নেবে। আরে, জমিদার না থাকলে নাট্টীনদের নাচ গান শুনবে কে? ঐ যে গঞ্জের বাজারে যে সব মাড়োয়ারী গোলাদারগুলো আছে সেইগুলো? ওগুলো গান শোনে না, নাচ বোঝে না; ওরা চায় অন্য জিনিস।···এই আপদ যখন ভুট্‌নীদের মাথার ওপর তখন দুনিয়ায় তছনছ কাণ্ড হয়ে গেল। সে সব ভুট্‌নী বুঝতে পারে না, বলতে পারে না, ভাবতে পারে না। আমজাদ আলীরা, চক-ইসমাইলের বাবুসাহেবরা, চকসিকান্দারের জমিদাররা, বিরনৌনীর নবাব পরিবার, সব ভাল মুসলমানরা পালিয়ে গেল পূবের গাড়িতে চ'ড়ে।

তারপর আর নাট্টীনদের নাচগানের সমজদার থাকল কজন? মেলায় যেগুলো লাঙ্গলের ফাল আর উখলী সামাট কিনতে আসে, সেইগুলো? আচ্ছা, না হয় তাদের গান শুনিয়েই কোন রকমে নিজের নিজের পেটটা চালিয়ে নেবে নাট্টীনরা। এতদিনে ভুট্‌নীর নিজের গাঁয়েও আঁচ লাগতে আরম্ভ হয়েছে। আমজাদ আলীরা চ'লে যাওয়ার পর তার মাসহারা গিয়েছে বন্ধ হয়ে। আর দশজন নাট্টীনদের মত তাকেও রোজগার ক রে খেতে হ'বে মেলায় মেলায়। তবু সে মাথা খাড়া ক'রে রেখেছিল, এই আঁধি তুফানের মধ্যেও। একটুতে ভেঙ্গে প ড়বার মেয়ে সে নয়।··· সর্দারের মতন অমন একটা লোক নিজেকে শেষ করে দিয়েছে, তাদের সমাজটাকে জীইয়ে রাখবার জন্যে। নিজের প্রাণ দিয়েও সে আগলে থাকবে সেই নেড়া দেউলটিকে!···

···আবহমানকাল থেকে নাট্টীনদের রোজগারের আদ্ধেক এসেছে নাগড়ার মেলা থেকে। নাগড়ার আজকালকার জমিদার ছেলেমানুষ, তাই সরকার বাহাদুর চালাচ্ছেন তার জমিদারী। দুনিয়া উল্টে গিয়েছে আজকাল। মহাত্মাজীর লোকদের মন রেখে চলতে হয় আজকাল

কলেক্টর সাহেবকে। তাই কলেক্টর সাহেবের হুকুম হয়ে গিয়েছে যে, নাগড়া মেলায় নাট্টীনদের ঘর ভাড়া দেওয়া হবে না।···আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল ভুট্নীর মাথায়, এই খবর শুনে।

সেখান থেকে ভুট্নীরা যায় করমগঞ্জ মেলায়। সেখানে মহাৎমাজীর চেলারা কোন লোককে আসতে দেয়নি, তাদের গান শুনতে। যারা গান শুনতে আসতে চায়, তাদের তারা পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকে, হাতে-পায়ে ধ'রে, হাত জোড় ক'রে বক্তৃতা দেয়। ভুট্নীরাও 'মহাৎমাদের' পায়ে মাথা কুটেছিল। তারা ছিটকে দূরে সরে গিয়েছিল ; বলেছিল, আপনারা আমাদের মা-বোন ; আপনারা পায়ে হাত দেবেন কেন আমাদের ?

কিছুই বুঝতে পারেনি ভুট্নী। মা-বোনেদের না খাইয়ে মেরে ফেলতে বলেছেন নাকি মহাৎমাজী। কিস্নজী ঝুলনের দিন গান শোনেন ; গান-বাজনা না হ'লে রামলীলা হয় না! যে বারে বেবুদপুর গাঁ শুদ্ধু সবাই গিয়েছিল মহাৎমাজীকে দর্শন করতে সদরে, সেবার সে নিজে কানে শুনে এসেছে গান, মহাৎমাজীর দরবারে।···কিছু বুঝতে পারে না ভুট্নীরা। কেন তাদের গান-বাজনা বন্ধ ক'রে দিতে চান মহাৎমাজীরা। ভিন্ দেশের রকম রকম পাখী এক গাছে রাত কাটায়। মেলা হচ্ছে তাই। এর মধ্যে আবার হাত জোড় করা কি ?···তারপর কমাস বড় কষ্টে কেটেছে ভুট্নীর। যে ক'জন নাট-নাট্টীন বেঁচেছিল গাঁয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে কে কোথায় চলে গিয়েছে রোজগারের ধান্ধায়, তা জানবার স্পৃহা পর্যন্ত ছিল না তার। জীবনের অনেকখানি এখনও তার সমুখে প ড়ে। সারেঙ্গী, আতর দান, ওগলদান বেচে আর ক'দিন চলবে! সে ভেবে কিছুই কূলকিনারা পায় না।···

এরই মধ্যে এল আমজাদ আলী খাঁ, পাকিস্থান থেকে। সে রংপুরে বাড়ি কিনেছে। এখানকার বিষয় সম্পত্তি তাদের কায়কুন বনোয়ারী-

লালের হাতে ছেড়েই তারা পালিয়েছিল। এখন এসেছিল জমি জিরেৎ বিক্রি করতে; যা' দাম পাওয়া যায়।...বয়স হ'য়ে আসছে ভুট্‌নীর। এতদিন তবু একটা ঘুনধরা সমাজের অবলম্বন ছিল তার; এখন তাও গিয়েছে। সারেঙ্গীই যদি বেচতে হল, তবে আর কেন? আর কোন উপায় হাতড়ে পায়নি ভুট্‌নী,—আমজাদ আলীকে বিয়ে করা ছাড়া।

তাই ভুট্‌নী শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার পরেছে। আমজাদ আলী খাঁ-দের খানদানী পরিবারের মেয়েদের শাড়ি পরা বারণ।...

সর্দারের কোন্ প্রশ্নের জবাব দেবে ভুট্‌নী? তার চোখ জলে ভরে আসে। কোন কথা যোগায় না মুখে। জেল থেকে ফিরতে একটু দেরী করে ফেলেছে সর্দার। কি করে ভুট্‌নী বোঝাবে সর্দারকে যে সে দোষ করেনি।...সর্দারকে দেখামাত্র ঝোঁকের মাথায় ডেকে ফেলেছে সে। না ডাকলেই ছিল ভাল। সর্দার গাঁয়ে ফিরে গিয়ে নিজের চোখেই সব দেখতো; সব বুঝতো! সেই ছিল ভাল। গাড়ির এঞ্জিন লেগেছে। আর কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারলেই হয়ত গাড়িখানা ছেড়ে যাবে। আমজাদ আলী আসবার আগেই, সর্দার নেমে গেলে এখন সে বাঁচে।...

হঠাৎ চায়ের ভেণ্ডরকে সঙ্গে নিয়ে আমজাদ আলী এসে কামরায় ঢোকে। ঐ কোন একটা নতুন লোকের সঙ্গে ভুট্‌নী গল্প করছে না! পুরুষদের গাড়িতে ওকে না চড়ালেই হ'ত। কিন্তু যা দিনকাল, একটু লোকজনওয়ালা বেটাছেলেদের গাড়িতে চড়াই ভাল। বোরকাটা আবার দেখছি পাশে খুলে রেখে দিয়েছে। হাজার হলেও অভ্যাস নেই। এখন বহুদিন লাগবে তাদের বাড়ির তরিবৎ ভুট্‌নীকে শেখাতে। কে ঐ লোকটা? বড় বেহায়াতো!...

আমজাদ আলীকে দেখে ভুট্‌নী আরও অপ্রস্তুত হয়ে যায়। হঠাৎ বলে, "এই যে আমজাদ আলী আসছে। সর্দার, আমি আমজাদ আলীকে বিয়ে করেছি।"

প্রথমে বিশ্বাস হয় না ভৈরো নাটের। দুষ্টু মেয়েটা আবার তামাসা করছে নাতো বুড়োদাদুকে নিয়ে? না, তা'তো নয়!

"তুই সমাজের বাইরে বিয়ে করেছিস?"...

হাতুড়ির আঘাত খেয়ে, লাল লোহাটার থেকে, আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ল।

"হারামজাদী!"—চীৎকার ক'রে ওঠে ভৈরো নাট। এই দেখবার জন্যে কি সে একটা একটা ক'রে, জেলের ভিতর দিন গুনেছে। তার সমাজের আশা-ভরসা সব সে কল্পনায় এই বজ্জাত মেয়েটার মধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছিল! তবু, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলতে পারে না সে।

...যত নষ্টের গোড়া এই আমজাদ আলীটা। সোজা হ'য়ে দাঁড়ায় সর্দার, আমজাদ আলীর মুখোমুখি। উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। হাতের আর কাঁধের পেশীগুলো তার শক্ত হয়ে উঠেছে, সেই একদিন চালের বাতায় গোঁজা একটা 'ভালা' টেনে নেবার সময় যেমন হয়েছিল। চোদ্দ বছর আগের হোলির দিনের ভৈরো সর্দার আবার ফিরে এসেছে, 'ভালা'র উপরের রোদ্দুরের ঝলকটুকু চোখে নিয়ে।...

দোষীর মত মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আমজাদ আলী খাঁ। দুটি চারটি করে গাড়ির জানলার সম্মুখে লোক জমতে আরম্ভ করেছে—মুসলমানে নিয়ে যাচ্ছে হিঁদুর মেয়েকে পাকিস্তানে। রেলের পুলিশকে খবর দে, স্টেশন মাস্টারকে ডাক!

ভুট্‌নী হঠাৎ পা জড়িয়ে ধ'রে সর্দারের।—"আমার কথাটা আগে শুনে নাও সর্দার।...মেলায় নাটনীদের নাচগান বন্ধ করে দিয়েছে মহাৎমাজীরা।"...

তারপর ভুট্‌নী কাঁদতে কাঁদতে ব'লে যায় নাট্টীনদের দুঃখের কাহিনী ;...নাচগান...মহাৎমাজীর চেলারা...কলেক্টর সাহেব...নাগড়া মেলা...ধরমগঞ্জের মেলা।

ভৈরোর চোদ্দ বছর ধ'রে গ'ড়ে তোলা সৌধের পাথর শাবল দিয়ে খুঁড়ে খসিয়ে ফেলছে একখান একখান ক'রে।

"সারেঙ্গী পর্যন্ত বেচতে হয়েছিল সর্দার"...

আর বলতে হবে নারে ভুট্‌নী, আর বলতে হবে না। কথা কয়টা বলবার চেষ্টা করল কয়েকবার। গোঙার কাতরানির মত একটা আওয়াজ বেরোয় গলা থেকে। কিসে যেন ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে কথাগুলোকে ভিতরে। চোখের আগুন ঝিমিয়ে এসেছে কোমলতার ছায়ায়।

"...আর কোন উপায় ছিল না সর্দার।..."

দারোগা সাহেব পুলিশ-টুলিস নিয়ে কামরায় ঢোকেন। সকলে পথ করে দেয় তাঁদের জন্য।

"কোথায় মেয়েটি ?"

"এটি আমার নাতনী, আর ঐটি আমার নাতজামাই!" বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে দারোগাসাহেবের মনে হয় সে মিথ্যা কথা বলবার লোক নয়। চোখের কোণে জল এসে গিয়েছে বুড়োর। দারোগাবাবু একটু অপ্রস্তুত হন। দর্শকরা হতাশ হ'য়ে দারোগা-সাহেবকে অনুরোধ করে দুপুরের নামাজকে কি বলে সেই কথাটা মেয়েটাকে প্রশ্ন করতে।

দারোগাবাবু ভৈরোর পিঠ ঠুকে সান্ত্বনা দেন, কোনো ভয় নেই বুড্‌হা তোমার নাতনীর আর নাত জামাইয়ের। তিনি চলে যাবার পর গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দেয়।

"তুমি নেমে পড় সর্দার দাদু। গাড়ি ছাড়বে এবার।"

"কোথায় যাবে এ গাড়ি? গড়মোগলাহার গাড়ি না এটা?"

"পার্বতীপুর।"

সর্দার-দাদুকে নিজের হাতে সাজা পান পানদান থেকে বের ক'রে এক খিলি খাওয়াতে ভুট্‌নীর ভারি ইচ্ছে করে—আর তো দেখা হবে না জীবনে। ...একটা সঙ্কোচের ব্যবধান এসে গিয়েছে দু'জনের মধ্যে, আমজাদ আলীর সম্মুখে। আমজাদ আলী খাঁর ঘরানা মেয়েছেলের পক্ষে বাইরের লোককে হাতে ক'রে পান দেওয়াটা শোভন হবে কিনা তা ভুট্‌নী বুঝতে পারে না।...কত ভেবে চলতে হয়!...বড় ভালবাসত পান খেতে সর্দার দাদু!...

প্ল্যাটফর্মের উপর কম্বলটা বিছিয়ে, পাটভাঙা শাড়িখান মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে ভৈরো নাট, গড়মোগলাহার গাড়ি যখন খুশী ছাড়ুক। যে গাড়িখান ছেড়ে গেল, তার ধোঁয়ায় এই বিস্বাদ জগৎটুকু এখনও ঢেকে রয়েছে। বইওয়ালাটা গান গেয়ে গেয়ে চার পয়সা দামের বই বেচছে।...

"রামগড়ের জোড়া কেল্লা ভেঙে গড়েছে"...ভেঙে গড়েনি রে, ভেঙে গড়েনি—ভেঙে পড়েছে। বড় বড় পাথরের ইটগুলো ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে।...কত 'ছকরবাজি', 'বলবাহি', 'যোগিয়া', 'ভমর', 'বিদেশিয়া'... শাড়িখান তার বুকে বোঝার মত চেপে বসেছে, ভৈরোর ইচ্ছে করে ছুটে চলে যায় সেই টিকিটবাবুর কাছে,—শাড়িখান দিচ্ছি হুজুর আপনাকে, আমাকে আবার জেলে পাঠিয়ে দেন—সেখানকার জগৎটা তবু তার চেনা। দূর! তা কি বলা যায়। পাগল ভাববে।...পাথরগুলোর নীচে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে কত সারঙ্গী, এস্রাজ, হাতীর পায়ের তলায় দেশলাইয়ের বাক্সর মত।...থেঁতলে যাচ্ছে ভিজে মেদিপাতাবাঁটা দেওয়া আঙুলগুলো।...পিষে যাচ্ছে কত লাল লাল করবীর থোবা...বুদ্বুদ ফাটার আঁধিতে তছনছ ক'রে দিচ্ছে মেলার তাঁবুগুলো...উপড়ে পড়ছে

ঝুরি ভরা বটগাছ।...লিব্ড়ীতে বান ডেকেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সর্দার।

"...বললেন গুরুজী, আরও মজা, আরও মজা..."

স্তূপাকার কাপড়ের বাণ্ডিলের পাহাড় ঠেলাগাড়িতে ক'রে কুলীরা নিয়ে এসে সে যেখানে শুয়ে আছে তার পাশেই রাখে। লুকিয়ে এগুলো পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছিল লোকেরা, পার্বতীপুরের গাড়িতে। একজন এক ভুড়ভুড়ি না দু ভুড়ভুড়ি দামের হাকিম এখনই এগুলোকে দেখতে আসবেন, তারই তৈয়ারী চলেছে। সামান্য একটু সরিয়ে রাখলে, বুড়ো ভৈরো এই শীতের সকালের রোদ্দুরটুকু পেত।

ষড়যন্ত্র মামলার রায়

সরকার বাহাদুর

বনাম—

(১) অরুণকুমার দে

(২) ভুনেশ্বর প্রসাদ

(৩) কর্তার সিং

অভিযুক্ত (৪) শেখ ইদ্রিস

ব্যক্তিগণ (৫) ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী

(৬) কপিলেশ্বর মাথুর

(৭) মিহিরবরণ রায় ওরফে ভোঁদা

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রের ধারা, সরকার বাহাদুরের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাদের ভিতর অসন্তোষ প্রচারের ধারা, সশস্ত্র ও হিংসাপূর্ণ উপায়ে বর্তমান সরকারের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টার ধারা, প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইনের শান্তিভঙ্গের প্রচেষ্টার ধারা এবং ডাকাতির ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে, অভিযুক্ত হইয়াছেন।

এই রোমাঞ্চকর মকদ্দমা ইতিমধ্যেই আন্তর্প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রমামলা নামে প্রেস ও পাবলিকের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সারা দেশ ইহার রায় শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে। ফাটকা বাজারে ভদ্র জুয়াড়ীরা মামলার ফলাফলের উপর বাজি রাখিয়াছে, এরূপ খবরও

'দৈনিক দেশবার্তা'র সম্পাদকের (সরকারী সাক্ষী নং ৪৭) জবানবন্দীতে প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ণ ছেষট্টি কার্যদিবস এই মকদ্দমা চলিয়াছে। একশ তেরোজন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের কৌঁসিলিগণই যোগ্যতা ও পদোচিত নিষ্ঠার সহিত কোর্টকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের অকুণ্ঠ পরিশ্রমের জন্যই এই মামলা এত সত্বর শেষ করা সম্ভব হইয়াছে।

কোর্টের নথীতে প্রাপ্ত উপকরণ হইতে অবান্তর প্রসঙ্গাদি বাদ দিলে সরকারের কেস সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়।—

অভিযুক্তরা সকলেই অগ্রণী-রক্তবিপ্লব দল নামক একটি রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই দলের উদ্দেশ্য সশস্ত্র আক্রমণ দ্বারা গভর্ণমেণ্ট হস্তগত করা। এই দুর্বৃত্তদের বর্তমান কার্যসূচী, দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর শান্তিকামী নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ ও ঘৃণার ভাব উদ্দীপ্ত করা, কপর্দকহীন ভিক্ষুকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের স্বার্থে নিয়োজিত করা, অপরিণতবয়স্ক সরলমতি বালকবালিকাদিগকেও রোমাঞ্চকর পুস্তিকাদি পড়িতে দিয়া কুপথে লইয়া যাওয়া। এই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নারীর সম্মান রাখিতে জানে না, আমাদের নিজস্ব প্রতিভা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সকলপ্রকার নৈতিক মানের মূলোচ্ছেদ করিতে চায়। স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ অফিসারের (সরকারী সাক্ষী নং ১৩) বহুল তথ্যপূর্ণ সাক্ষ্য এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ গত ৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় 'টাউন হল'-এ সশস্ত্র বিপ্লব করিয়া, গভর্ণমেণ্ট হস্তগত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। পরে আন্দাজ সাড়ে ছয়টার সময় সম্মুখস্থ পার্কে ষড়যন্ত্র কার্যান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে বিশদ কূটচক্রান্তে যোগদান করে।

ফার্ষ্ট-ইনফরমেশন-রিপোর্ট দায়ের করিয়াছিলেন মৌলবী নবী বক্স, জেলা-খাসমহল-অফিসার (সরকারী সাক্ষী নং ১)। তাঁহার সাক্ষ্যে

প্রকাশ যে গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় তিনি তাঁহার পত্নী সমভিব্যহারে পার্কে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মেদবাহুল্য রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ডাক্তার তাঁহার স্ত্রীকে উন্মুক্ত বায়ুসেবন করিতে বলিয়াছেন। সেইজন্য সন্ধ্যার অন্ধকারের পর তিনি ঐ পর্দানশীন ভদ্রমহিলাকে পার্কে আনিয়াছিলেন। তাঁহারা পার্কে ঢুকিতেই, কয়েকজন লোক পার্কের গেট হইতে বাহির হইয়া, সম্মুখের টাউনহলে প্রবেশ করে। টাউনহলের দরজাগুলি বন্ধ ছিল। দরজা খুলিয়া তাহারা ভিতরে ঢোকে। লোকগুলি অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশই বা করিল কেন, আর ভিতর হইতে দরজা বন্ধই বা করিয়া দিল কেন, তাহা এই দম্পতিকে বিশেষ সন্দিগ্ধ করিয়া তোলে। স্বতঃই তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে ইহারা কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিতেছে না তো? তাহার উপর আবার শীঘ্রই একটি তছনছ কাণ্ড ঘটিবে, এইরূপ আভাস এতদিনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ স্পেশালব্রাঞ্চ-বিভাগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়াছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ গোপনীয় ছাপ দেওয়া চিঠিতে, জেলার সব অফিসারদের চোখ ও কান খুলিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যে লোকগুলি টাউনহলে ঢুকিয়াছিল, পথের আবছা আলোতে দূর হইতে তাহাদিগকে স্কুল-কলেজের ছাত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল। মুহূর্তমধ্যে তাঁহারা বুঝিয়া গেলেন যে ইহা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কিছু নয়। তাঁহাদের একমাত্র সন্তান মহবুবের জন্য তাহার মাতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন ;—সে আবার ঐ দলের মধ্যে নাই তো? কিছুদিন হইতে তাহারও রকম-সকম ভাল বলিয়া মনে হইতেছিল না। ইনকিলাব, বিপ্লব, সংঘর্ষ, লড়াই প্রভৃতি কথায় ভরা কতকগুলি চোতা কাগজ-পত্রিকাদি তাহার পড়ার টেবিলের উপর কিছুদিন হইতে দেখা যাইতেছিল। মহবুবের মাতার আগ্রহাতিশয্যে সাক্ষী নবীবক্‌সুকে তখনই পুত্রের খোঁজে টাউনহলে যাইতে হয়। একদল গুপ্তচক্রান্তকারীদের মধ্যে

যাইতে তাঁহার বেশ ভয় ভয় করিতেছিল, কিন্তু পত্নীর সম্মুখে তিনি তাঁহার এই মানসিক দুর্বলতা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা টিপিয়া টিপিয়া টাউনহলের বারান্দায় উঠেন। সেদিন কনকনে উত্তরে বাতাস বহিতেছিল। পার্কের দিকে মহবুবের মাতা ছাড়া জনপ্রাণীও আছে বলিয়া মনে হইতে ছিল না। নবীবক্সের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল,—শীতে নয়; বিপদে পড়িয়া চীৎকার করিলেও কেহ সাহায্য করিতে আসিবে না এই ভাবিয়া। সাবধানের মার নাই; তিনি মাথা ও কান ঢাকিয়া মাফলারটি গালপাট্টার মত করিয়া জড়াইলেন। দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ছিল না। দরজার ফাঁক দিয়া ভিতরের ব্যাপারটি কি তাহা দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

—অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না; একজন প্রাণের আবেগে ওজস্বিনী ভাষায় কি সব যেন বলিতেছে; বোধ হয় দলের পাণ্ডা হইবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া কান পাতিয়া কথাগুলি শুনিবার চেষ্টা করিলেন। সব পরিষ্কার শোনা যায়না। তবু যেটুকু শোনা গেল…

"এদের জাতকে নির্মূল করে দিতে হবে। এই রক্তশোষকের দল তিলে তিলে আমাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছে। এই রক্তবীজের ঝাড় কবে, কি করে বিতাড়িত হবে! আপনারা বোধ হয় জানেন যে পৃথিবীর কতকাংশ থেকে এদের বিতাড়িত করা সম্ভব হয়েছে সেখানকার লোকের চেষ্টায়। তাঁরা এই ঘৃণ্য পরভুকদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিতভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। কোন বাধা তাদের সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে টিকতে পারেনি। কিন্তু আমাদের দেশে কি তা' সম্ভব হবে? কেন হবে না! 'পারিব না' এ কথাটি কেবল কাপুরুষদের অভিধানেই পাওয়া যায়। অপরেও যা' পেরেছে, আমরাও তা' পারব না কেন। এ কাজের জন্য চাই ত্যাগ, চাই সংগঠন, চাই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, চাই প্রচার, চাই

অর্থ,—আর চাই সমাজের মণি, নির্ভীক অক্লান্তকর্মী তরুণের দল, যারা মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজেদের আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছে। এ সংঘর্ষে অহিংসার স্থান নেই। চিরবৈরী রক্ত-শোষকদের রুধিরে আপনার হাত রক্তরঞ্জিত হয়ে যাক ; প্রধূমিত গন্ধকের ধোঁয়ায় আকাশ, বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠুক ; তাতে পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। দেশমাতৃকা এই রক্তপাতে, বহ্নুৎসবে সন্তুষ্টই হবেন। আপনারা বোধ হয় জানেন যে রোমের ক্যাপিটলের ভিত্তিপ্রস্তর নরবলির রক্ত দিয়েই স্থাপিত হয়েছিল সেটাকে বেশী মজবুত করবার জন্য। আমাদের রাষ্ট্রীয় ইমারতের ভিত্তিও প্রাণীহিংসার উপরই স্থাপিত করতে হবে। চতুর্দিকের এই অনাহারক্লিষ্ট পাণ্ডুর শীর্ণ নরকঙ্কালগুলি কি আপনাদের কাহারও মনে সাড়া জাগায় না? আপনারাও তো ভুক্তভোগী, তবু কি আপনারা এরূপ উদাসীন থাকবেন? দরখাস্ত, কাকুতি-মিনতি, খোসামোদ আমরা বহুকাল করেছি। ওতে কিছু ফল হবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন "দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া"। সবল, সতেজ, বলদৃপ্ত কণ্ঠে বলতে হ'বে—"আমরা আসমুদ্র-হিমাচল প্রতি গ্রামে গ্রামে সংগঠন করব। আমাদের সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে যেই 'সূর্য গেল অস্তাচলে' অমনি আরম্ভ হ'ল এদের রাজত্ব! কোথায় সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি, আর কোথায় এই পরভুকদের রণঐকতান বাদন! উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!..."

সাক্ষী নবীবক্স্ ভাবিলেন, এই জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহাদের মহবুব কি আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিবে? কি যে দিনকাল পড়িয়াছে! ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের যুগের ছেলেদের নেশাভাঙ করিয়া বখাটে হইয়া যাওয়া অনেক ভাল ছিল। তিনি হলের দরজা সামান্য ফাঁক করিতেই, একটি উজ্জ্বল সাদা আলোর ঝলক, ঘরের জমাট অন্ধকারের বুক চিরিয়া চলিয়া গেল। এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার

হৃৎস্পন্দন দ্রুত হইয়া গেল ;—ইহারা কি জানিতে পারিয়াছে যে কোন অনাহুত, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি তাহাদের গুপ্ত বৈঠকে উপস্থিত হইয়াছে, আর তাহাদের কথাবার্তা আড়ি-পাতিয়া শুনিতেছে?—এই বুঝি তাঁহারই দিকে সার্চলাইটের মত আলোটি ফেলে—তার পর ব্রেনগানের গুটিকয়েক কট্‌কট্‌ শব্দ মাত্রর অপেক্ষা!...

মহবুবের চিন্তা মাথায় চড়িল। খোদাতাল্লার নাম লইয়া পলাইবার সময় তাঁহার মনে হইল যে হাঁটু দুইটি অবশ হইয়া গিয়াছে, পা দুমড়াইয়া আসিতেছে। কিছু দূর আসিয়া তাঁহার মহবুবের মায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁহার কথা সাক্ষী এতক্ষণ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, পার্কে ফিরিয়া গিয়া দেখেন যে তিনি অঝোরে কাঁদিতেছেন। ভয়ের কোন কারণ নাই বলিয়া তাঁকে সান্ত্বনা দিবার সাহস পর্যন্ত তখন সাক্ষীর ছিলনা। তাঁহারা বাড়ী পৌছিবার কিছুক্ষণ পরই, মহবুবকে বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়া নবীবক্‌স্ নিশ্চিন্ত হন। জিজ্ঞাসা করায় মহবুব বলে যে সে একজন বন্ধুকে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে গিয়াছিল। এতক্ষণে সাক্ষী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। তখন হঠাৎ সরকারী অফিসার হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা মনে পড়িয়া যায়। গাড়ী বাহির করিয়া তখনই তিনি পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট ছোটেন। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, এস ডি ও সাহেব ও নবীবক্‌স্ কিছুক্ষণের মধ্যেই সশস্ত্র পুলিসবাহিনী সঙ্গে করিয়া দুইটি পুলিসভ্যানে টাঁউনহলের নিকট গমন করেন। টাউনহলটি পুলিসবাহিনী ঘেরাও করে। পুলিসেরা বন্দুক ও অফিসার কয়জন রিভলভার লইয়া, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক হলের ভিতর প্রবেশ করেন। প্রতিমুহূর্তে তাঁহারা আততায়ীদের আক্রমণের আশঙ্কা করিতেছিলেন। একটা কিসের যেন শব্দ হয়!...“যে কেহ থাক, নড়াচড়া না করিয়া হাত উঁচু কর, নতুবা গুলি করা হইবে,”—এই কথা বলিয়া পুলিসসাহেব

হলের ভিতর টর্চ ফেলেন। একটি শীর্ণ শীতার্ত কুকুর সাক্ষী নবীবক্সের হৃৎকম্প বর্ধিত করিয়া, তাঁহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া কেঁউ কেঁউ করিতে করিতে পলাইল। এই কুকুরটি ব্যতীত ঘরে আর কেহ ছিল না। পুলিসসাহেব তখন নবীবক্সের দিকে হাতের আলো কেন্দ্রিত করিলেন। নবীবক্স ভয়ে ঘামিতে আরম্ভ করিতেছেন। সাহেব আলো ফেলিয়া দেখিতেছিলেন যে খবর দিবার সময় খাসমহল-অফিসার অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন কিনা। সাহেবের দোষ নাই। খাসমহল-অফিসারের নিজেরই ক্ষণিকের জন্য নিজের উপর সন্দেহ উপস্থিত হইল।

সকলে টাউনহলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই, একজন পুলিস খবর দিল যে পার্কের ভিতর ষড়যন্ত্রকারীর দল তখনও বসিয়া সলা-পরামর্শ করিতেছে। নবীবক্স্ এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন;—আর পুলিস-সাহেবের তাঁহাকে মিথ্যাবাদী কিংবা কল্পনাপ্রবণ বলিয়া ভাবিবার অধিকার নাই।...

সকলে মিলিয়া পার্কের দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্কের পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে যে পাবলিকের বসিবার বেঞ্চগুলি আছে, ঐদিক হইতেই মানুষের কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল। পিছন হইতে নিঃশব্দে নিকটে গিয়া ইঁহারা তাহাদের কথাবার্তা শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গলার স্বরে বোঝা গেল যে তাহারা বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। টাউনহলের সেই জ্বালাময়ী ভাষণকে একটি বিশেষক্ষেত্রে কি করিয়া কার্যকরী করিতে হইবে তাহারই বিশদ আলোচনা চলিতেছে। শীতের রাত্রের অন্ধকার ও নির্জ্জনতার সুযোগ পাইয়া তাহারা কূট চক্রান্তে মশগুল হইয়া পড়িয়াছে। কানে আসিল..."এজেণ্টটা কি আমাদের একেবারে ভেড়া ভাবে নাকি? নিজে করিস ভুল, আর আমাদের ভয় দেখাস 'ফায়ার' করবি ব'লে। I don't care if I am fired। ও বেটার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। কালকে

ক্যাশ মিলোনোর পর ও যখন গাড়ীতে চড়তে যাবে সেই সময় বুঝলে ? আর সেক্রেটারীকে ব্যাপারটা আজ জানিয়ে রেখেছি। এসব ঐ রাস্কেল স্পাইটার কাজ।"

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বোঝেন যে একজন সরকারী agent provocateur-এর অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে। আর দেরী না করিয়া তিনি ষড়যন্ত্রকারীদিগকে গ্রেপ্তারের হুকুম দেন। অরুণকুমার দে, ভুনেশ্বর প্রসাদ, কর্তার সিং ও শেখ ইদ্রিসকে এইস্থানে গ্রেপ্তার করা হয়। শেখ ইদ্রিস পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হইতে পারে নাই। অরুণকুমার দের পকেটে একটি কাগজমোড়া গোলাকার বোমার মত জিনিস পাওয়া যায়।

ইহাদের পুলিসভ্যানে পৌছাইয়া, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দল পুষ্করিণীর অপর পারের দিকে অগ্রসর হয়েন। সেখানে ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী ও কপিলেশ্বর মাথুর (আসামী নং ৫ ও ৬) পুষ্করিণীর রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া ষড়যন্ত্র করিতেছিল। তাহারা বলাবলি করিতেছিল যে একখানি জাল টেলিগ্রাম পাঠাইতে পারিলে হাতের কাজটির অতি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। সরকারী পক্ষ হইতে আরও বলা হয় যে, উপরোক্ত আসামী দুইজন নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিতেছিল যে মাড়োয়ারীর বাচ্চা পাঁচ লাখ টাকার শোক সহ্য করিতে পারিবে না বোধ হয়। গদীর ম্যানেজারকে সাজসে আনিবার সম্বন্ধে যে সময় তাহারা সলাপরামর্শ করিতেছিল, সেই সময় তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। একদল পুলিস ইহাদেরও পুলিসভ্যানে পৌছাইয়া দিয়া আসে।

তাহার পর পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিক হইতে লোকজনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পার্টি সেইদিকে অগ্রসর হয়। সেখানকার ষড়যন্ত্রকারীরা বোধ হয় দূর হইতেই ইহাদের দেখিয়া ফেলিয়াছিল।

নবীবক্সের সাক্ষ্যে প্রকাশ যে চক্রান্তকারীদের মধ্যে একজন লোক আবৃত্তির মত স্বরে—"যায় যাবে যাক্ প্রাণ" বলিয়া ঘাটের চাতালের উপর হইতে জলে ঝাঁপ দিল। তাহার তিন চারজন সঙ্গী, দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। আগের আসামীদ্বয়কে ভ্যানে পৌছাইয়া দিয়া পুলিশেরা তখনও ফেরে নাই। তাই পুলিসসাহেবের দল, ঐ তিনচারজন পলায়মান চক্রান্তকারীকে তখন অনুসরণ করা সমীচীন মনে করিলেন না। জলের ভিতরের ঐ বিপজ্জনক বিপ্লবীটিকে কি করিয়া ধরা যায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহার হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না জানা নাই। তবে সে এখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে নিশ্চয়ই। কেহই এই অন্ধকারে এই মারাত্মক আসামীটিকে ধরিবার জন্য জলে নামিতে রাজী নয়। হঠাৎ পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মাথায় এক বুদ্ধির ঢেউ খেলিয়া যায়। তিনি পুষ্করিণীর চারিদিকে সকলকে ছড়াইয়া পড়িতে বলেন। শীতের মধ্যে লোকটি কয়ঘণ্টা আর জলে থাকিতে পারিবে? লোকটিও বোধ হয় গতিক ভাল নয় বুঝিয়া আর একটুও দেরী করিল না। "তোর গায়ের কাপড়খানই এখন পরতে হবেরে দেখছি, ঘ্যাণ্টা" এই বলিতে বলিতে সে সেই ঘাটের সিঁড়ির উপরই ওঠে। তখন সে পুলিস দেখিয়া স্থদক্ষ অভিনেতার ন্যায়, বিস্মিত হইবার ভান দেখায়। পুলিস আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এই যুবকটিই অভিযুক্ত নং ৭, মিহিরবরণ রায় ওরফে ভোঁদা।

নবীবক্সের আসামীদের গ্রেপ্তারের সম্বন্ধে উপরোক্ত সাক্ষ্য, পুলিস সাহেব (সরকারী সাক্ষী নং ৬৮) এবং পুলিস সাবইন্সপেক্টর (সরকারী সাক্ষী নং ৬৯) এর জবানবন্দী দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়।

ইহাই সংক্ষেপে সরকারপক্ষের কেস।

আসামীরা বলে যে তাহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। আসামী পক্ষের কৌসিলি প্রথমেই আপত্তি জানান যে, বিভিন্ন আসামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইয়াছে ; এগুলির একত্রে বিচার আইনসঙ্গত নয় এবং ইহা অভিযুক্তদের ন্যায়বিচার পাইবার পক্ষে হানিকারক হইবে। আমার মতে এ আপত্তির কোন সারবত্তা নাই। যে মূল তথাকথিত ষড়যন্ত্র, টাউনহলে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই এই মামলার ভিত্তি। বলা হইতেছে যে পার্কের ছোট ছোট উপদলীয় ষড়চক্রান্তগুলি উহারই কার্যকরী অঙ্গমাত্র।

এইবার এক এক করিয়া অভিযুক্তদের কেস লওয়া যাউক।

একই আইনজীবী, অরুণকুমার দে, ভুনেশ্বর প্রসাদ ও কর্তার সিং এই তিনজন অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। অরুণকুমার দের বাড়ী চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে। ভুনেশ্বর প্রসাদের দেশ সাহাবাদ জেলায় এবং কর্তার সিং সিয়ালকোটের লোক। ইহারা তিনজনই স্থানীয় ব্যাঙ্কের কেরাণী। কর্তার সিং অল্প কিছুদিন মাত্র এখানে আসিয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের দাঙ্গার সময় সে ব্যাঙ্কের সিয়ালকোট শাখাতে কাজ করিত।

আসামী পক্ষের প্রথম সাক্ষী প্রভাস পালের সাক্ষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্থানীয় ব্যাঙ্কের কেরাণীদের একটি ইউনিয়ন আছে। তিনি উহার সেক্রেটারী। গত বৎসর পূর্বভারতের ব্যাঙ্কগুলির কেরাণীরা ধর্মঘট করিয়াছিল। সেই হইতে এখানকার ব্যাঙ্কের 'এজেন্টের সহিত কেরাণীদের ঠিক বনিবনা হইতেছে না। ব্যাঙ্কের স্থানীয় বড় সাহেবকে 'এজেন্ট' বলে। কেরাণীদের মধ্যে একজন, যে পূর্বোক্ত ধর্মঘটে যোগ দেয় নাই, তাহাকে অন্য কেরাণীরা স্পাই' বলে। এই 'স্পাই টী যে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় 'এজেণ্টের' বাড়ীতে যায় এবং অন্য কেরাণীদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার সংবাদ তাঁহাকে দেয়, তাহার প্রমাণ সেক্রেটারীর কাছে আছে। 'এজেন্ট' সাহেব ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে কিছু বলিতে সাহস করেন না, কিন্তু অন্য কেরাণীদের সহিত অভদ্র ব্যবহার করেন।

সময়ে অসময়ে 'ফায়ার' করিব অর্থাৎ চাকরী থাইব বলিয়া ভয় দেখান। এখানে ব্যাঙ্কই সরকারী ট্রেজারীর কাজ করে। কলেক্টরের অফিস হইতে প্রতি সপ্তাহে ছাপা-ফর্মে, ফসল ও চাষবাসের অবস্থা, বারিপাত, গো- মড়ক প্রভৃতি নানা তথ্যপূর্ণ একটী রিপোর্ট ব্যাঙ্কে আসে। প্রতি দুই সপ্তাহের সরকারী রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক নিজের হেড অফিসে পাক্ষিক রিপোর্ট পাঠায়। 'এজেন্ট' সাহেব স্বহস্তে এই পাক্ষিক রিপোর্ট লেখেন।

সাক্ষী প্রভাস পাল আরও বলে যে গভর্ণমেণ্টের ফর্মগুলির একপিঠ সাদা থাকে। কেরাণীরা নিয়মিত বাজে কাগজে চিঠি-পত্রাদির খসড়া লিখিয়া, এজেন্টের ঘরে অনুমোদনের জন্য পাঠায়। সংশোধিত ও অনুমোদিত হইয়া আসিলে তবে উহা ভাল কাগজে টাইপ করা হয়। উক্ত ৫ই জানুয়ারী তারিখেও একটি বহু পুরাতন কলেক্টরের অফিসের রিপোর্টের উল্টা পিঠে, একখানি জরুরী চিঠির নকল লিখিয়া, কর্তার সিং 'এজেন্টের' কামরায় পাঠাইয়া ছিল। 'এজেন্ট' ফসল ও চাষবাসের রিপোর্ট দেখিয়াই হেড অফিসে পাঠানোর জন্য পাক্ষিক রিপোর্ট লিখিতে বসিয়া যান। তাড়াতাড়িতে তিনি কলেক্টরের অফিসের রিপোর্টের তারিখটি লক্ষ্য করেন নাই। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া 'এজেন্ট' সাহেব তাঁহার পাক্ষিক রিপোর্টটি তৈয়ারী করেন। দিনান্তে রিপোর্টটি কর্তার সিংএর হাতে ফিরিয়া আসিলে, সে হাসিবে কি কাঁদিবে ঠিক করিতে পারে না। সে সাতিশয় নম্রতার সহিত, 'এজেন্ট' সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার ভুলটি দেখাইয়া দেয়। ইহার জন্য কোথায় 'এজেন্ট' সাহেব কর্তার সিংএর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন, তা নয় তিনি এইসব অকর্মণ্য উদ্বাস্তু পাঞ্জাবীদের চাকরী হইতে 'ফায়ার' করিবার ভয় দেখান। এই দুর্ব্যবহারে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এক পিঠে অন্য চিঠি লেখা কলেক্টরের অফিসের উল্লিখিত

রিপোর্টটি, এবং উহারই আধারে এজেণ্ট দ্বারা লিখিত ভুল পাক্ষিক রিপোর্টটি, এই সাক্ষী কোর্টে দাখিল করিয়াছেন। ঐ কাগজগুলি সময়ে এজেণ্টের বিরুদ্ধে কখনও কাজে লাগিতে পারে বলিয়া, ইউনিয়নের সুযোগ্য সেক্রেটারী, ওগুলিকে বাজে কাগজের ঝুড়ি হইতে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রভাস পালের সাক্ষ্যের আলোকে, ফার্ষ্ট-ইনফরমেশন রিপোর্টে উল্লিখিত প্রথম তিনজন আসামীর মধ্যের কথাবার্তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এই আসামীদের কৌসিলির জেরার উত্তরে, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বীকার করেন যে, আসামী অরুণ দের পকেট হইতে যে সন্দেহজনক গোলাকার পদার্থটি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা গভর্ণমেণ্টের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার পরীক্ষার রিপোর্টটি বোধ হয় ভুলক্রমে নথীতে দাখিল করা হয় নাই। তাঁহার যতদূর স্মরণ হয়, বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছিলেন যে ঐ গোলাকার পদার্থটির উপকরণ বিজ্ঞানের পরিচিত কোন বিস্ফোরক নয়। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেরায় আরও স্বীকার করেন যে ঐ দ্রব্যটি সরকারী কেমিক্যাল এনালিষ্টের নিকটও রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তাঁহার পরীক্ষার রিপোর্টটিও বোধ হয় ভুলক্রমে কোর্টে দাখিল করা হয় নাই। তাঁহার রিপোর্টে কি লেখা ছিল তাহা সাক্ষীর স্মরণ নাই। ঐ কাগজখানি এত তাড়াতাড়িতে পুলিস অফিসে খুঁজিয়া পাওয়াও শক্ত।

বহুক্ষণ জেরার পর আসামীপক্ষের উকিল তাঁহাকে মনে করাইয়া দিলে পুলিস সাহেবের আবছা আবছা মনে পড়ে যে ঐ রিপোর্টে লিখিত ছিল, গোলাকার বস্তুটিতে কাপড়কাচা সাবানের উপকরণ ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যায় নাই। উহাতে আরও লিখিত ছিল যে বস্তুটি বহুকালের

প্রাচীন হওয়ায় উহার রং ঐরূপ কালচে হইয়া গিয়াছে। কেরাণীরা অফিস হইতে ফিরিবার পথে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি কিনিয়া লইয়া যায় কিনা সে খবর সাক্ষী জানেন না। কাপড়কাচা সাবান কোন কেরাণী পরিবারের আবশ্যক দ্রব্যাদির মধ্যে পড়ে কিনা তাহাও তিনি বলিতে পারেন না।

এইবার আসামী নং ৪ শেখ ইদ্রিসের কেস লওয়া যাউক। পার্কে ঐ সময় প্রথম তিনজন আসামীর নিকটবর্তী বেঞ্চে বসিয়া থাকা এবং পালাইবার চেষ্টা করা ছাড়া, তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আর কোন প্রমাণ নাই। তাহার উকিল স্বীকার করেন যে ইদ্রিসের আদি বাড়ী ফায়জাবাদে; সে একজন পেশাদার পকেটমার এবং ইতঃপূর্বে পকেট মারিবার অপরাধে তাহার পাঁচবার সাজা হইয়াছে। আমাদের এতকালের জজিয়তীর জীবনে আসামী পক্ষের উকিলের এইরূপ ডিফেন্স লওয়া, সত্যই এক নূতন অভিজ্ঞতা। গ্রেপ্তারের সময় তাহার পকেট হইতে একটি ক্ষুরের ব্লেড পাওয়া যায়, যাহা কোর্টে দাখিল করা হইয়াছে। তাহার উকিল বলেন যে গত হিন্দুমুসলমান-দাঙ্গার পর হইতে গাঁটকাটার পেশা আর খুব অর্থকরী নাই। নিজের ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি ব্যতীত অপরের পকেট মারিবার পূর্বে ইদ্রিসকে আজকাল তিনবার ভাবিয়া লইতে হয়। এই ব্যবসায়িক মন্দার সহিত ইদ্রিস বীরের মত লড়িতেছে। বিনা পুঁজিতে অর্থোপার্জনের সে নানাপ্রকার উপায় আবিষ্কার করিয়াছে এবং এইগুলি দিয়াই সে তাহার খানদানী পেশার সঙ্কুচিত আয় পূর্ণ করিবার চেষ্টা করে।

ঘটনার তারিখে সে বিকাল তিনটা হইতেই রেলষ্টেশনে 'চন্দৌসী মেল'-এর একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্টের বাঙ্কের উপর শুইয়া ছিল। মেল ট্রেনটি এখান হইতেই বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় ছাড়ে। ঐ ট্রেনটিতে অসম্ভব ভিড় হয়। ইদ্রিস প্রত্যহই আগে হইতে বাঙ্কের

উপর শুইয়া থাকে। কোন প্যাসেঞ্জারের নিকট হইতে দুই, এক টাকা যাহা পাওয়া যায় লইয়া, তাহাকে ঐ বাঙ্কের উপর শুইবার স্থান করিয়া দেওয়া, ইহা তাহার প্রাত্যহিক কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। উপরোক্ত 'অকুর' দিবস তাহার পক্ষে অত্যন্ত অশুভ ছিল। তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে ঐদিন তাহাকে একটি শক্ত পাল্লায় পড়িতে হইয়াছিল। মুসলমানী টুপি পরিহিত একটি যুবক, আর একটি যুবককে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গিয়াছিল। বাঙ্কের স্থান এতক্ষণ আগলাইয়া রাখিবার পারিশ্রমিক বাবদ একটি টাকা প্রথমোক্ত যুবকটির নিকট চাহিবামাত্র সে কামরার ভিতর ভীষণ হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দেয়। শীর্ণকায় ইদ্রিসকে বেশ কয়েক ঘা উত্তম-মধ্যম প্রহার দিবার পর সে তাহাকে টানিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর নামায়। তাহার পর যুবকটি ইদ্রিসকে রেলওয়ে পুলিসের হাতে সঁপিয়া দিয়া যায়। ষ্টেশনের পুলিস কনষ্টেবল্দের সহিত ইদ্রিসের বহুকালের পরিচয়। বাঙ্কের দরুণ এক টাকা প্রাপ্যের মধ্যে, দুই আনা করিয়া রেল পুলিসকে ইদ্রিস নিয়মিত দিত। কাজেই যুবকটি চলিয়া যাইবার পরই পুলিস তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। সে মনের দুঃখে আন্দাজ ছয় ঘটিকার সময় পার্কের বেঞ্চিতে আসিয়া বসে।

আপাতদৃষ্টিতে ইদ্রিসের এই 'মোরগ ও ষণ্ডের কাহিনী' অবিশ্বাস্য মনে হইলেও, ইহার সমর্থনে আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী পাওয়া গিয়াছে। আসামী পক্ষের দুই নম্বর সাক্ষী শেখ মহবুব, সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী নবীবক্সের পুত্র। যেদিন তাহার পিতাকে জেরা করা হইতেছিল, সেদিন শেখ মহবুব কলেজ কামাই করিয়া কোর্টে আসিয়াছিল; উকিলরা কি করিয়া তাহার পিতাকে নাজেহাল করে তাহা দেখিবার জন্য। সেই সময় হঠাৎ আসামী ইদ্রিস চীৎকার করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইদ্রিসের উকিল তাহাকে থামাইয়া আমাদের নিকট

নিবেদন করেন যে, তাঁহার মক্কেল মৌলভী নবীবক্সের ছেলেকে দেখাইয়া বলিতেছে যে ঐ বাবুসাহেবই সেদিন ষ্টেশনে তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। তখন আমি উক্ত আইনজীবীকে মহবুবকে সমন করিবার জন্ত লিখিত দরখাস্ত দিতে বলি। পরে মহবুবের সাক্ষ্যে ইদ্রিসের বক্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। মহবুব ঘটনার তারিখে প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময়, ঐ লুঙ্গি পরিহিত আসামীটির ন্যায় এক ব্যক্তিকে বাক্স হইতে নামাইয়া সামান্ত কয়েকটি চপেটাঘাত করিয়াছিল। সাক্ষী আরও বলে যে সে তাহার এক বন্ধুকে চন্দৌসী মেল-এ তুলিয়া দিতে গিয়াছিল।

এই সাক্ষীর ইদ্রিসের সহিত কোন পূর্বসম্বন্ধ নাই। আসামী ইদ্রিসের সহিত তাহার স্বার্থ কোন প্রকারে জড়িত, এরূপ ইঙ্গিতও সরকারী পক্ষ হইতে করা হয় নাই। আমরা এই সত্যভাষী ও 'উজ্জ্বল' যুবকের সাক্ষ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

এইবার ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী ও কপিলেশ্বর মাথুর এই দুইজনের কেস লওয়া যাইতেছে।

এই দুইজন আসামীই এই সহরে ডাক্তারি করেন। পূর্বে বিবৃত প্রমাণ ছাড়াও আসামী ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দীর বিরুদ্ধে আরও একটি প্রমাণ আছে। তাঁহার বাড়ী সার্চ করিবার সময় 'অগ্রণী রক্তবিপ্লব দল'-এর সাপ্তাহিক মখপত্র "রক্তাম্বর" বাহান্ন কপি পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে গত বৎসর, কিংবা তাহার আগের বৎসর, তাঁহার পাড়ার কোন যুবক, কি যেন বলিয়া কয়েকটি টাকা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিল। তাহার পরই তাঁহার নিকট এই কাগজখানি প্রতি সপ্তাহে আসিতে আরম্ভ করে। তাহার পর কবে যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আসামীর উকিলের জেরায় সার্চ ও তদন্তকারী পুলিস দারোগা (সরকারী সাক্ষী নং ৬৯) স্বীকার করেন যে সার্চের সময় প্রাপ্ত 'রক্তাম্বর'-এর কপিগুলির উপরের মোড়কগুলি তখনও একখানিও খোলা হয় নাই।

পুলিসের হাতে আসিবার পর পোষ্টাল প্যাকেটগুলি সুযোগ্য স্পেশাল ব্রাঞ্চের তত্ত্বাবধানে খোলা হয়, তাহার ভিতর কি সব লেখা আছে তাহা দেখিবার জন্য। সাক্ষী নং ৬৯ আরও বলেন যে কাগজখানি এখনও বে-আইনী করা হয় নাই।

এই পোষ্টাল মোড়ক না খুলিবার সম্বন্ধে সরকারী উকিলের যুক্তি বেশ মনে রাখিবার মত। তিনি সন্দেহ করেন যে ঐ সাপ্তাহিকগুলি পাঠ করিবার পর, আসামী ক্ষিতীশ নন্দী, যেরূপ সন্তর্পণে কাগজখানিকে মোড়কের বাহির করিয়া লওয়া হইত, সেইরূপ সাবধানতার সহিতই পুনরায় উহার ভিতর ঢুকাইয়া রাখিতেন। সত্য হইলে, ইহা আসামীর পক্ষে কম দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে।

আসামী ক্ষিতীশ নন্দী ও কপিলেশ্বর মাথুরের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ঘটনার তারিখে সন্ধ্যা আন্দাজ ছয়টার সময়, তাঁহারা সহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীপুণমচন্দ মাড়োয়ারীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। আসামী কপিলেশ্বর মাথুর, উপরোক্ত শ্রীপুণমচন্দ মাড়োয়ারীর পরিবারের চিকিৎসক। দুইদিন হইতে বহু ঔষধপথ্যাদি সত্বেও তাঁহার হিক্কা বন্ধ হইতেছিল না। ডাক্তার কপিলেশ্বর মাথুর তাঁহার রুগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য সিনিয়র ডাক্তার ক্ষিতীশ নন্দীকে 'কল' দেন। শ্রীপুণমচন্দের গৃহ হইতে ফিরিবার সময়, আসামী ক্ষিতীশ নন্দী তাঁহার সান্ধ্য ভ্রমণ সারিয়া লইবার জন্য, নিজের গাড়ীখানি খালিই বাড়ী পাঠাইয়া দেন এবং দুই ডাক্তারে পদব্রজে পার্কে আসেন। এখানে তাঁহারা রুগীকে হঠাৎ একটি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত দিয়া, তাঁহার হিক্কা বন্ধ করিবার বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। এইজন্য শ্রীপুণমচন্দজীকে পাচ লাখ টাকা ব্যবসায়িক ক্ষতির সংবাদ দিয়া একখানি জাল টেলিগ্রাম দিবার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন।

এই সম্পর্কে আসামী পক্ষের সাত নম্বর সাক্ষী পুণমচন্দ মাড়োয়ারীর সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। এই সাক্ষ্যের সমর্থনে পুণমচন্দের ব্যবহৃত ঔষধের প্রেসক্রিপশনগুলির নকল ওরিয়েণ্টাল-মেডিক্যাল হলের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক দাখিল করা হইয়াছে (এক্‌জিবিট্‌ ঘ ১ হইতে ঘ ৭ পর্যন্ত)।

ডাক্তার ঘোড়পাড়ে আসামী পক্ষের ছয় নম্বর সাক্ষী। ইনি বোম্বাই সহরের হিক্কারোগের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন এ কথা সরকারী উকিলও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সরকারী উকিলের জেরার উত্তরে ইনি বলেন যে, তাঁহার ডাক্তারী আয়ের উপর এই বৎসর চৌদ্দ হাজার টাকা ইনকামট্যাক্স গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধার্য হইয়াছে। এইরূপ সাক্ষীর কোন কথা অবিশ্বাস করিবার প্রশ্ন উঠে না। এই সাক্ষীর মতে, কঠিন হিক্কা কেসগুলিতে যখন ঔষধপথ্যে কোন উপকার পরিলক্ষিত হয় না, তখন কড়া গোছের মানসিক আঘাতই একমাত্র ফলপ্রসূ চিকিৎসা। সরকার পক্ষ হইতে ইঁহাকে লম্বা জেরা করা হইয়াছে। জেরায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে বার্দ্ধক্যে লোকের মন শিশুর মত দুর্বল হইয়া যায়। সত্তর বৎসর বয়সকে এদেশে বার্দ্ধক্য নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। একটি ছোট ছেলের হেঁচকি বন্ধ করিতে হইলে, সে চুরি করিয়া খাইয়াছে কিনা এই প্রশ্নাঘাতই যথেষ্ট।

বিশেষজ্ঞের এই কথাগুলির ভিত্তিতেই সরকারী উকিল আমাদের সম্মুখে বহস করিয়াছেন যে শ্রীপুণমচন্দ মাড়োয়ারীর ন্যায় বৃদ্ধের পক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতির সংবাদ সহ্য করা অসম্ভব। রুগী মারিয়া রোগ সারাইবার কথা নিশ্চয়ই আসামী ডাক্তারদ্বয় ভাবিতেছিলেন না। সেইজন্য সরকারী উকিলের মতে, আসামী পক্ষের বিবৃতি অবিশ্বাস্য।

*আমরা অবশ্য এ বিষয়ে সরকারী উকিলের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। এ বিষয়ে আমাদের গভীর চিন্তাপ্রসূত মত এই যে হিক্কার তীব্রতার উপরও, আবশ্যক মানসিক আঘাতের তীব্রতা নির্ভর করিবে।

আর পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতির আঘাতকে সরকারী উকিল মহাশয় যতটা বড় করিয়া ভাবিতেছেন, শ্রীপুণমচন্দজীর মত ব্যবসায়ীর পক্ষে উহা সত্যসত্যই ততটা বড় কি-না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

এইবার আমরা আসামী মিহিরবরণ রায় ওরফে ভোঁদার কেস লইতেছি। সে প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র।

আসামী পক্ষের সাক্ষী নং ১২ তড়িৎ মুখার্জীর সাক্ষ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে বলে যে তাহার ডাকনাম ঘ্যাণ্টা। ঘটনার তারিখে তাহারা পার্কের পুকুরধারে বসিয়া ছিল। সে, ট্যাপা, ভোঁদা, আর বিশে এই কয়জন বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহারা সকলেই স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র। আসামী মিহিরবরণ ওরফে ভোঁদা একটু গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের ছেলে। ভোঁদার বিশ্বাস যে সে থিয়েটার ও আবৃত্তি ভাল করিতে পারে। সে অল্পতেই চটিয়া যায় বলিয়া তাহার বন্ধুরা তাহার পিছনে লাগিতে ভালবাসে। উক্ত ঘটনার দিন সাক্ষীরা তাহাকে এই বলিয়া খেপাইতেছিল যে সে এই শীতের রাত্রে কিছুতেই স্নান করিতে পারিবে না। দুই-একবার উস্‌কানি দিবার পরই ভোঁদা তাহাদের বাজি রাখিতে বলে। দুই আনার চানাচুর বাজি রাখা হয়। সাক্ষীরা মতলব আঁটিয়াছিল যে ভোঁদা জলে নামিলেই তাহারা তাহার জামা লইয়া পালাইবে, সে যাহাতে স্নান সারিয়া ডাঙ্গায় উঠিবার পর আর কাহাকেও দেখিতে না পায়। সাক্ষী বলে যে, আসামী মিহিরবরণ অতঃপর জামাটি খুলিয়া ঘাটের চাতালের উপর রাখে এবং আবৃত্তির স্বরে বলে, "নিশ্চয় করিব স্নান।" তাহার পর মিনিটখানেক মনে মনে ভাবিয়া ইহার সহিত আর একটি লাইন মিলাইয়া আবৃত্তি করে—"যায় যাবে যাক প্রাণ।" এই বলিয়া আসামী মিহিরবরণ ওরফে ভোঁদা জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

সরকারী উকিলের জেরার উত্তরে সাক্ষী অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করে যে আসামী মিহিরবরণ রায় তাহাদের ক্লাসের ছেলেদের নেতা। গতবার অঙ্কের প্রশ্ন কঠিন আসিলে, পরীক্ষার পর, তাহারই নেতৃত্বে ক্লাসের প্রত্যেক ছেলে এক এক করিয়া গিয়া অঙ্কের শিক্ষককে নিঃশব্দে মোগলীয় কায়দায় কুর্নিস করিয়া আসে।

এইবার আমরা এই মামলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাক্ষী, রেবতী সেনের সাক্ষ্যের বিষয় আলোচনা করিব। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে এই সাক্ষীকে সরকারী পক্ষ বা আসামী পক্ষ কেহই সমন করেন নাই। সরকারী উকিলের নির্দয় জেরার ফলে, সাক্ষী তড়িৎ মুখার্জী ওরফে ঘ্যাণ্টার চোখে যখন প্রায় জল আসিয়া গিয়াছে, তখন তিনি হঠাৎ ধমক দিবার মত করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে সে রাত্রিতে পড়িতে বসে কি-না? তবে সে অত রাত্রে পার্কে বসিয়া ছিল কি করিয়া? সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে না ফিরিলে তাহার মা বাবা বকেন কি না? প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতেই সাক্ষী জবাব দেয় যে, সে সেদিন মাকে বলিয়া আসিয়াছিল যে রেবতীবাবুর ছবি দেখিতে যাইতেছে।

তখন আমরা এই রেবতীবাবুকে কোর্টের সাক্ষীরূপে ডাকি।

কোর্ট-সাক্ষী রেবতী সেন নিজের সাক্ষ্যে বলেন যে তাঁহার আদি নিবাস বরিশালে। তাঁহার বয়স চুয়ান্ন বৎসর। তিনি জেলার স্যানিটারী বিভাগে কাজ করেন। সেকালে ফোর্থক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তাহার পর 'স্বদেশী'র হুজুগে মাতিয়া মুকুন্দদাসের যাত্রার দলে ঢোকেন। তাহার পর বাখরগঞ্জ জেলায় কয়েক বৎসর নেতাদের মিটিংএ চেয়ার সতরঞ্চি, সামিয়ানা ইত্যাদির ব্যবস্থার গুরুভার নিজের উপর লইয়া, বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত কালাতিপাত করেন। সেই সময় তাঁহার মেশোমশাই তাঁহাকে এখানে আনিয়া এই চাকরী করিয়া দেন। বেতন বর্তমানে

ডিয়ারনেস এলাওয়েন্স সমেত বিরাশি টাকা। তাঁহার ডিউটি স্বাস্থ্যবিদ্যা ও রোগের প্রতিষেধক ইত্যাদির সম্বন্ধে প্রচারের কার্য করা। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় পানীয় জলের কুয়ায় ওষুধ দেওয়া, ম্যালেরিয়ার সময় কুইনিন, প্যালুড্রিন ট্যাবলেট বিলি করাও তাঁহার কাজ। প্রতিমাসে তাঁহাকে চারিটি প্রচার বক্তৃতা দিবার ডায়েরী ঊর্ধ্বতম অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হয়। তাঁহার বিশ্বাস তিনি খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন। সরকারী উকিল এই সম্বন্ধে তাঁহাকে জেরা করিলে, তিনি উষ্মা প্রকাশ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তিনি ছোট কাজ করেন বলিয়া তাহাকে লইয়া সরকারী উকিল ব্যঙ্গ করিতে সাহস করিতেছেন, অথচ এক মিটিংএ কমিশনার সাহেব একটি লিখিত বক্তৃতা বারংবার জলপান করিতে করিতে পাঠ করিলেও, তিনি সরকারী উকিল মহাশয়কে নিরবচ্ছিন্ন করতালি দিতে দেখিয়াছেন। জেরায় সাক্ষী স্বীকার করেন যে স্যানিটারী বিভাগের কাজ চালানোর জন্য তাঁহার নিম্নলিখিত ছয়টি বক্তৃতা মুখস্থ আছে:—কি করিয়া কলেরা রোগ ছড়াইয়া পড়ে; বসন্তের টিকা; ম্যালেরিয়ার মশা; আদর্শ পরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী; খাদ্য ও পানীয়; রুগীর পথ্য ও শুশ্রূষা। এই ছয়টি বিষয়ের উপর ম্যাজিকলণ্ঠন স্লাইডও আছে। একটি প্রাথমিক বক্তৃতার পর, ম্যাজিকলণ্ঠনে সেই বিষয়ের ছবিগুলি দেখান হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হয়। আজকালকার টকির যুগে, আর তাঁহার ম্যাজিকলণ্ঠন মিটিংগুলিতে সেকালের মত লোক হয় না। চাকরী বাঁচাইবার জন্য অনেক সময়ই খোসামোদ করিয়া শ্রোতা জুটাইতে হয়। তিনি তাঁহার কাজের ডায়েরী কোর্টে দাখিল করিয়া বলেন যে, গত ৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যা আন্দাজ সাড়ে পাঁচটার সময় স্থানীয় টাউনহলে তিনি ম্যালেরিয়ার মশার উপর বক্তৃতা দেন। তিনি আরও বলেন যে, বাড়ী বাড়ী গিয়া, তিনি পাড়ার ছেলেদের ম্যাজিকলণ্ঠন দেখিতে আসিবার জন্য

বলিয়া আসিয়াছিলেন। আজকালকার ছেলেরাও আবার এইরূপ বদ হইয়া উঠিয়াছে যে বাড়ীতে তাহাদের পিতামাতাকে বলিয়া যদিই বা তাহাদের রাত্রে ম্যাজিকলণ্ঠন দেখিতে আসিবার অনুমতি করাইয়া দিই, তথাপি তাহারা মিটিংএ উপস্থিত হয় না। অথচ ম্যাজিকলণ্ঠন দেখিতে যাইতেছি বলিয়া বাড়ী হইতে কিন্তু বাহির হয় ঠিকই। উহাদেরই বা দোষ কি? একই বক্তৃতা কতবার শুনিবে, একই ছবি আর কতবার দেখিবে?

এই বাক্‌পটু সাক্ষীটিকে তখন আমরা 'ম্যালেরিয়ার মশা'র উপর বক্তৃতাটি আমাদের শুনাইতে বলি। প্রথমে সাক্ষী মৃদু আপত্তি জানান। বলেন যে ম্যাজিকলণ্ঠন স্লাইড সঙ্গে না থাকিলে, তিনি ভাল বক্তৃতা দিবার মানসিক প্রেরণা পান না। তৎপরে আমাদের আগ্রহাতিশয্যে, গভীর অনুভূতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যঞ্জনার সহিত বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

..."এদের জাতকে নির্মূল করে দিতে হবে। এই রক্তশোষকের দল তিলে তিলে আমাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে।..." ইত্যাদি...

অনেকক্ষণ ধরিয়া একটানা বক্তৃতা চলে। সাক্ষী মৌলভী নবীবক্স্ যে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রের বক্তৃতা টাউন হলে শুনিয়াছিলেন, হুবহু সেই বক্তৃতাটি।

"এই দেখুন এনোফেলিস মশার ছবি"...বলিয়া সাক্ষী রেবতী সেন নিজের বক্তৃতাটি শেষ করেন। বক্তৃতা শেষ হইবার পর ঐ বাকসংযমহীন সাক্ষীটি সরকারী উকিলকে উদ্ধতভাবে জিজ্ঞাসা করেন—"কি আমার বক্তৃতা শুনে একেবারে মুষড়ে পড়লেন কেন? ঢকঢক করে জল খাইনি ব'লে ভাল লাগল না বুঝি?"

তাঁহার পুরাতন রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস, এবং কোর্টের মধ্যের দুর্বিনীত আচরণ সত্ত্বেও, আমরা রেবতী সেনের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিতে ইতস্তত করিতেছি না।

ইহার পর ষড়যন্ত্রের কাহিনী আর দাঁড়াইতে পারে না। এইজন্য আমি আসামীদিগকে বেকসুর খালাস দিবার হুকুম দিতেছি।

স্বাক্ষর……

বিচারক

তাঃ ২৫. ৮……

অনাবশ্যক

ছেচল্লিশ বছর প্র্যাকৃটিসের পর ওকালতি ছেড়েছি। সত্য কথা বলতে কি, ছাড়িনি,—ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। চিন্তাগুলোর কেমন যেন এলা এলা ভাব; সেগুলো বলতে গেলে আরও এলোমেলো হয়ে জড়িয়ে যায়। তার উপর ছিল ছেলেমেয়েদের অনুরোধ। নইলে প্র্যাকটিস কি আর কেউ ইচ্ছা করে ছাড়ে? প্র্যাকটিস তো ছাড়লাম, কিন্তু বার-লাইব্রেরীতে আসা বন্ধ করতে পারলাম কই! রোজ দুপুরে একবার এখানে এসে না বসলে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। অভ্যাস। ছেচল্লিশ বছরের অভ্যাস এই বয়সে কি কাটিয়ে উঠতে পারা যায়? অসম্ভব। কিসে যেন টেনে নিয়ে আসে। নাতিপুতিরা জিজ্ঞাসা করলে বলি যে বারলাইব্রেরীর চায়ের ক্লাবের চা-টা যেমন হয়, তেমনি বাড়িতে কখনও হয় না। চোখমুখ দেখে বুঝি যে তারা আমার দেখানো কারণটা বিশ্বাস করল না। বোঝাই কি করে এদের যে, একটু একটু করে ছেচল্লিশ বছর ধরে প্রত্যহ, জীবনের কতখানি সেখানে ফেলে এসেছি—সব জমানো আছে সেখানে—কত আশা, আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতা। তোদেরই মত সেগুলোর সঙ্গেও যে আমার আত্মীয়তার সম্বন্ধ। তোরা তো শুধু আমার আপনার জন; তারা যে আমার সত্তার অঙ্গ। ভেবেছিলাম তো যে রিটায়ার করবার পর ধর্ম-কর্ম করব। কিন্তু সে সবে মন বসে কই। কোথায় একটু গীতা-টীতা পড়ব, তা' নয় আজকেও সারা সকাল কাটিয়ে দিলাম, নাতিটার ইতিহাসের বইখানা নাড়াচাড়া করে। আজকাল আবার ধুয়ো উঠেছে যে, ইতিহাস হবে, জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে

দেখে বিবরণ ; আগেকার মত রাজারাজড়া কেষ্টবিষ্টুদের নাম আর সাল মুখস্থ নয়। একদিক থেকে কথাটা ঠিকই। কিন্তু তা' হ'লে তো সাধারণ লোকের কথাবার্তাগুলোকে 'সাউণ্ড রেকর্ড'-এ ধ'রে রাখবার দরকার। তার চেয়ে ভাল ইতিহাসের মাল-মশলা পাবে কোথায়?…এই দেখ কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় এলাম। এমনিই হয় আজকাল। আমার মধ্যের উকিল-আমিটাকেও খুঁজে পাই না; আর অন্য-আমিটাও ধরা-ছোঁয়া দিতে চায় না। দুটোতে মিলে লুকোচুরি খেলছে; মাঝ থেকে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। তাদের এই খুনসুড়িটা বাইরে প্রকাশ পায় আমার খেই-হারানো কথা আর স্মৃতি-বিভ্রমের মধ্যে দিয়ে। মনে থাকে না ভাল করে সব কথা। কিন্তু আশ্চর্য, পুরনো কথাগুলো ঠিক মনে থাকে। এটা কি করে সম্ভব হয় বুঝি না। উকিলের কারবার মন নিয়ে নয়। তার কারবার লেখা আইনের অক্ষর নিয়ে—তারই সূক্ষ্ম চুলচেরা ভেদাভেদ নিয়ে—বড় জোর আসামীর অপরাধের উদ্দেশ্য নিয়ে। অপরাধের উদ্দেশ্যটাকে কোনও রকমে একবার আইনের ধারার ছকে ফেলতে পারলে সে বেঁচে যায়। বাইরে প্রকাশভঙ্গীটা যে মনের খোলস তা উকিলে বুঝবে না। আসল জিনিস রইল পড়ে যেমনকে তেমন ; ছায়া ধরতে ধরতেই জীবন গেল। এই অবজ্ঞার প্রতিহিংসা নেয় মন সুবিধে পেলেই। রক্তের জোর গেলেই সে তোমার সঙ্গে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। আমার মত ছিয়াত্তর বছর বয়স হোক্ আগে, তখন তোমরা বুঝবে আমার কথা, তার আগে বুঝবে না। যা বলেছি তার চেয়ে পরিষ্কার ক'রে গুছিয়ে কথাটাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতাই যদি এখনও থাকবে, তবে আর এত কথা বলছি কেন? কথা বেচে সারাজীবন খেলাম; সব খরচ হয়ে গিয়েছে, তাই আর ঠিক কথা খুঁজে পাই না। যে লড়াইটার কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে পাটোয়ারী মাথাটার সঙ্গে অব্যবসায়ী লাজুক মনের লড়াই। ক্ষুর দিয়ে মাখনের তাল কাটতে ইচ্ছে হয় কাটো; কিন্তু এক্স-রে দিয়ে

কেবল হাড় দেখা যায়, মাংস নয়।—না, তবুও ঠিক বোঝাতে পারলাম না।

যাক্, বার লাইব্রেরীতে এসে পড়া গিয়েছে। আজ না এলেই হ'ত! বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। পোষায় না আর আজকাল এই সব সভাসমিতির হৈ-চৈ। আজ ছিল 'দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘর'এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান—একজন মন্ত্রী করলেন। নিমন্ত্রণপত্র দিয়েছে হরলাল। তাই ভাবলাম একবার ঘুরেই আসি। সেখান থেকেই আসছি।

বারলাইব্রেরীতে ঢুকি।

'ছত্রপতি আসছেন'।

জুনিয়ার উকিলরা নিজেদের মধ্যে কথা বলবার সময় আমার নাম দিয়াছে বৃদ্ধ! বুড়োর বদলে সম্মান দেখিয়ে বলে বৃদ্ধ। আজ হঠাৎ বলল ছত্রপতি! বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু রসজ্ঞান হারাইনি এখনও। সেদিকে তাকিয়ে হেসে বলি—ছিয়াত্তর বছর বয়স হোক, তারপর তোমরাও আমারই মতন শীতকালে ছাতা নিয়ে বেরুবে। বিরাজের ছেলে নতুন উকিল হয়েছে, সে আমার কাছে এসে আমার হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে বন্ধ করে দিল। তাই বলো। ছাতাটা মাথায় দিয়েই ঘরে ঢুকেছি! সেই জন্য এরা আমায় ছত্রপতি বলছিল। অপ্রস্তুত হয়ে যাই। মনের রাজপাট এখনই শেষ হবে; তাই শেষ মুহূর্তে একটু উপদ্রব ক'রে নিজের অধিকার জানিয়ে গেল। সম্মুখের ঐ চেয়ারখানায় বসবার আগে পর্যন্ত আর বিশ্বাস নেই মনটাকে। একজন উঠে দাঁড়িয়ে আমার চেয়ারখানাকে খালি ক'রে দিল। ঐখানাই আমার নির্দিষ্ট চেয়ার। সকলেই জানে। চিরকাল ঐ জায়গাটাতেই বসে এসেছি।

আঃ! চেয়ারখানাতে বসেও তৃপ্তি। এরই অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ থেকে। বসা মাত্র উকিল আমি-কে ফিরে পেলাম। ডাঙা থেকে মাছ আবার জলে আসতে পেয়েছে। খানিক আগের আমি আর আমাতে

নেই। একজন পুরনো মক্কেল চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় নমস্কার করল। হেসে তাকে প্রতি-নমস্কার জানাই। চেয়ারে বসবার আগে হলে নমস্কার করা দূরে থাক তাকে হয়ত আমি চিনতেও পারতাম না। মক্কেল, মুহুরী, উকিল প্রত্যেকের হাবভাব আমার জানা, প্রত্যাশিত আচরণ আমার মুখস্থ। দেওয়াল ভরে বার অ্যাসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সেক্রেটারীদের ফটো টাঙানো; তার মধ্যে আমারও ছবি আছে। আমার দিকে তাকিয়ে সব ছবিগুলি মৃদু ভর্ৎসনা করছে, খানিক আগে পর্যন্ত আমি গণ্ডি পার হয়ে মনে মনে অনাবশ্যকের রাজ্যে আনাগোনা করছিলাম ব'লে। ও পথে যাওয়া যে আইনজীবীদের নিয়মবিরুদ্ধ তা কি তুমি জান না? যা, করে ফেলেছো ফেলেছো—আর যেন অমন না হয়। খবদ্দার, চোখের আড়ালের রাজ্যে, আর না!

লজ্জিত হয়ে যাই। আর কখনও আমি অমন কাজ করি! খবরের কাগজখানা টেনে নিয়ে বসি। ভুল লাইনে যাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে প্রথমেই খবরের কাগজের মামলা মোকদ্দমার পাতাটা খুলে বসি। দেওয়ালের এই এতগুলি বুদ্ধিজীবী তাঁদের জীবনের প্রতিদিন তিল তিল করে শাণিত বুদ্ধির দ্যুতি এইখানে ছিটিয়ে রেখে গিয়েছেন। তাই দিয়ে চুম্বক বা বিদ্যুতের ক্ষেত্রের মত একটা পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে এখানে। আমি তো কোন্ ছার—দেশের সবচেয়ে বড় কবি, প্রেমিক বা শিল্পীকে এনে বসিয়ে দাও না এখানে। অমনি দেখবে তার পাটোয়ারী বুদ্ধি গজিয়েছে, আবশ্যক আর অনাবশ্যকের মান গিয়েছে বদলে। Evidence Act-এ অবান্তর প্রমাণ কি ক'রে বাদ দিতে হয় দেখেছ তো। সেই রকম দয়ামায়া বাদ দিয়ে এক্স-রে দিয়ে দেখতে হ'বে পৃথিবীটাকে।...

পাশের টেবিলে জুনিয়ার উকিলের দল মিউজিয়মের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের গল্প করছে। এরা সকলেই বোধ হয় সেখানে গিয়েছিল।

এদের মধ্যে থেকে একজন বললে, 'এইবার বৃদ্ধের খবরের কাগজ পড়া আরম্ভ হ'ল।'

কে ছোকরাটি? বারলাইব্রেরীর মধ্যে ব'সে একজন সিনিয়র উকিলকে সমীহ্ ক'রে কথা বলতে জানে না! নিশ্চয়ই বাইরের কোনও জায়গা থেকে এখানে এসে বসেছে প্র্যাকৃটিস করতে। আমার চোখে ছানি-কাটানোর পরের মোটা লেন্সের চশমা—আড়চোখে দেখে নেবারও উপায় নেই। দেখতে হলে মাথা টা ঘুরিয়ে লেন্স জোড়া ফোকাস করতে হবে ঐ দিকে। সেটা হয়ত একটু অশোভন হবে আমার পক্ষে। আচ্ছা ছোকরাটি একথা বললে কেন? প্রথমত সে যদি ভেবে থাকে যে, কাগজখানা সারা দিনের মধ্যে বৃদ্ধের হাত থেকে আর বার করা যাবে না, তা হলে আমি তাকে বলব—তোমার এভাবে ভাববার কোন অধিকার নেই। বৃদ্ধ প্র্যাকৃটিস ছাড়লে কি হবে, সে আজও বার অ্যাসোসিয়েশনের চাঁদা দিয়ে আসছে। প্রমাণ হিসাবে আমি তোমাকে সদস্যদের তালিকা ও চাঁদার খাতা দেখতে বলি। আর, তুমি মেম্বার হয়েছ তো? অনেকে আবার আজকাল উকিল হয়েও বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হয় না। মোটের উপর আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি আমার অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে থেকেও কাগজখানাকে সারাদিন নিজের দখলে রাখতে পারি। কাজেই আমার বিদ্বান বন্ধুর প্রথম যুক্তি ধোপে টেকে না। দ্বিতীয়ত যদি আমার বিদ্বান বন্ধু ইঙ্গিত করে থাকেন যে বৃদ্ধ সংবাদপত্রসুলভ কোনও বিশেষ ধরণের মোকদ্দমার রিপোর্ট পড়বার জন্যই খবরের কাগজের ঐ পাতাটা খুলেছেন, তা হলে আমি বলব তাঁর দায়িত্ব-জ্ঞানহীন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। ছিয়াত্তর বছর বয়সে যে সন্ধ্যালোকের জগতে লোকে থাকে সে সম্বন্ধে তাঁর কোনও জ্ঞানই নেই। আমার কড়া কথা ক্ষমা করবেন—তিনি নিশ্চয়ই নিজের বয়সোচিত দৃষ্টি দিয়েই জিনিসটাকে দেখেছেন। তাঁর অজ্ঞতার জন্য

আমি তাঁকে করুণা করি। আর সব চেয়ে মূল্যবান প্রমাণ হিসেবে আমি হুজুরকে খবরের কাগজের এই পাতাখানা পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। সুতরাং আমার বন্ধুর এ যুক্তিও অচল—Does not hold water, your honour…

ভ্রূক্ষেপও যে নেই এদিকে। লম্বা লম্বা গপ্‌পো ঝাড়া হচ্ছে 'দেশাত্মপ্রাণ' যাদুঘর-এর উপর! তুই সেদিন এসেছিস এ শহরে, মিউজিয়মটার ইতিহাস তুই কি করে জানবি?…কিন্তু 'আর্গুমেণ্ট' এর মুখে বেশ নতুন কথাটি খুঁজে পেয়েছি—সন্ধ্যালোকের জগৎ।…ওঃ… অবান্তর…sorry! ও দেওয়ালের আমি, তুমি তো বুঝতেই পারছ একটুখানি চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছিল বলে মুহূর্তের জন্য তোমাদের আওতা থেকে বার হয়ে গিয়েছিলাম। বড্ডো ধকল গিয়েছে কিনা আজ শরীরের উপর। আর আমি ঢুলুনি আসতে দিই!…অবান্তর!…

—হ্যাঁ, তৃতীয়ত আর একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে ঐ খবরের কাগজ সংক্রান্ত কথাটির অর্থের। খবরের কাগজ পড়তে গেলেই আমার ঢুলুনি আসে। তাই লক্ষ্য করছি কিছুদিন থেকে যে বার লাইব্রেরীতে একটা নতুন ইডিয়ম তৈরি করা হয়েছে। সেই ইডিয়ম অনুযায়ী 'বৃদ্ধের খবরের কাগজ পড়া' কথা কয়টির মানে ঘুমনো। আইনের চোখে স্থানীয় রীতিনীতির গুরুত্ব কম নয়। কাজেই আসামীর benefit of doubt পাওয়া উচিত।

আর্গুমেণ্ট শেষ করে নিশ্চিন্ত হই। এতকাল ধরে ওকালতি করলাম, কিন্তু এখনও আর্গুমেণ্ট আরম্ভ করবার ঠিক আগেই একটু উদ্বেগ ও শেষ হবার পর খানিকটা স্বস্তি পাই। ভাল হ'ল কিনা তা' নিজে নিজেই বোঝা যায়। তাই এখন মনটা বেশ তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে।—যতই ঘুম আসুক ঘুমুচ্ছি না কিছুতেই। দাঁড়াও তোমাদের ইডিয়মটাকেই আজকে রদ করে দিচ্ছি!

সেই উকিলটির সঙ্গে আর এখন আমার কোনও রাগারাগি নেই। সে পয়েন্টটাই যে শেষ হয়ে গিয়েছে। ওদের টেবিলে মিউজিয়মের গল্পই চলেছে। বেশ লাগে শুনতে ওদের গপ্‌পো।

—মিউজিয়মের নতুন সাইনবোর্ডটি দেখেছো তো? উপরে লেখা 'দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘর'। নীচের লাইনে আছে '১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত'। আজকে যার উদ্বোধন অনুষ্ঠান হ'ল সেটা ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবে কি করে? এমন ডাহা contradictory কথাটা লিখল কি ক'রে হরলাল মোক্তার? ডাহা মিথ্যে, ডাহা আইন বিরুদ্ধ!

—না হে এ হচ্ছে মোক্তারি সত্য। দেখছ না, মোক্তারি আইন পরিবেশন করা হয়েছে গবুচন্দ্র মন্ত্রীর জন্যে।

—মন্ত্রী ছাড়া আর যে কোন রাম-শ্যাম যদু-মধু মিউজিয়মের ভিতরে ঢুকেই লিখিত প্রমাণ দেখতে পেত এর বিরুদ্ধে। সেখানে বিরাট পাথরখানায় যে লেখা রয়েছে, 'লি মিউজিয়ম, প্রতিষ্ঠিত ১৯২৮ সাল'।

না, না, ছোকরা বুদ্ধিমান। পয়েন্টটা তুলেছে ঠিক। তবে নিজের বক্তব্য ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। প্রথমত আজকে একটা উদ্বোধন অনুষ্ঠান নতুন ক'রে হচ্ছে ব'লে এ প্রমাণ হয়ে যায় না যে সে প্রতিষ্ঠানটা ১৯২৮ সাল থেকে চলে আসছে না। বাড়ি বদল হতে পারে, প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ পরিবর্তন হতে পারে—আরও বহু কারণ ঘটতে পারে, যার জন্যে হয়ত এবার নতুন ক'রে উদ্বোধন অনুষ্ঠান প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত মোক্তারদের সম্বন্ধে ওরকম সুরে কথা বলা তোমাদের নিজেদের পক্ষেই অসম্মানজনক। তোমাদের কথার ঝাঁজে একটু পরশ্রীকাতরতা প্রকাশ পাচ্ছে। আইনের লাইন হচ্ছে এমন একটা পেশা, যেখানে তোমার যদি প্রতিভা থাকে তা' হ'লে নিশ্চয়ই স্বীকৃতি পাবে। বড় বড় মোক্তারদের নখের যুগ্যি আগে হও, তারপর তাদের সমালোচনা কর। হরলাল মোক্তারের মত মামলার তথ্য সাজাতে ক'জন

উকিলে পারে ? এতক্ষণ ব'সে ব'সে মোক্তারদের সম্বন্ধে সস্তা রসিকতা না করে, যদি একটু আইনের বই-টই নাড়াচাড়া করতে, তা' হ'লে ভবিষ্যতে আমাদের বিদ্বান মোক্তার ভাইদের চেয়ে সত্যি সত্যি ভালভাবে মোকদ্দমা চালাতে পারতে। তৃতীয়ত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি মন্ত্রীর সম্বন্ধে তুমি যে বিশেষণটি ব্যবহার করেছ, তা ন্যায়সঙ্গত সমালোচনার সীমা পার হ'য়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, এইবার আমার শেষ হ'ল।

—যাদুঘরের মধ্যে মিউজিয়ম। একেবারে কৌটোর ভিতরে কৌটো যে হে।

—হ্যাঁ, ধুকড়ির ভিতর খাসা চাল। খোসার ভিতর শাঁস! 'লি মিউজিয়ম' লেখা ঐ পাথরখানাই বোধ হয় দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘরের সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ।

—যা' বলেছ। ঐ শিলালিপিখানার উপর একখানা থিসিস লিখলেই হয়।

—ঐ টুকুই আছে বাকি! তা' হ'লে আমাদের মোক্তারানন্দ স্বামীর সাধনার ইতিহাস অনেকখানি পাওয়া যায়।

বাঃ, বেশ টিপ্পনীটা কেটেছে বিরাজের ছেলে। এই জন্যই তো বার লাইব্রেরীর গল্প আমি এত ভালবাসি। বাইরের লোক শুনলে হয়তো কথাগুলোকে একটু ঝাঁজালো ব'লে ভাববে কিন্তু আসলে এটা ঝাঁজ নয়, বুদ্ধির ঝলকানি। বার লাইব্রেরী হচ্ছে জেলার 'ব্রেন-ট্রাস্ট'। কি ছাই ইতিহাসের বই পড়ে লোকে! এখানকার বুদ্ধিদীপ্ত মিঠেকড়া মন্তব্যগুলোই দেশের অলিখিত ইতিহাস—আসল ইতিহাস। এরা প্রত্যহ মুখে মুখে ইতিহাসের ডিক্টেশন দিয়ে যাচ্ছে। তবু সেগুলো কিছুতেই লেখা হবে না ইতিহাসের টেক্সট বুকের পাতায়। অলিখিত অংশটাই শাঁস, লিখিত অংশটা হচ্ছে খোসা। সাইনবোর্ডটার প্রথম লাইনে লেখা আছে 'দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘর'; আর দ্বিতীয় লাইনে আছে '১৯২৮ সালে

প্রতিষ্ঠিত'। কিন্তু এই লিখিত দুটো লাইনই ভুয়ো। আসল ইতিহাস লুকিয়ে আছে এই দুই লাইনের মধ্যের অলিখিত অংশটিতে। ভূষি ঝেড়ে আসল জিনিস আলাদা করতে হয়। সেটা থাকতে চায় চোখের আড়ালে। লুকিয়ে থাকে নীচে, পিছনে। বলার পিছনে থাকে কত না বলা; লেখার পিছনে থাকে কত না লেখা। বার লাইব্রেরীতে বলা কথা একটাও নষ্ট হয়নি। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সীমাহীন শূন্যতাকে ধাক্কা দিতে দিতে কথাগুলো এগিয়ে চলেছে—কোথায় কে জানে। মনের রেডিও খুলে ধর না কেন সেগুলো। সারা ইতিহাসের মালমশলা তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে।...

অবান্তর...sorry...ঘুম এসে গিয়েছিল, আমার অজানতে। ফটোর ফ্রেমগুলোর মধ্যে থেকে অমন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমাকে দেখলে আমার উপর অবিচার করবেন আপনারা। বিশ্বাস করুন আমার কথা। বুঝি যে কাউকে বিশ্বাস করা হয়ত আপনাদের পক্ষে সম্ভব না, কেন না জীবদ্দশায় আপনারা নিজের নিজের ভবিষ্যৎ ছাড়া আর সব বিষয়েই ছিলেন সংশয়ী। কিন্তু আমার পক্ষের বক্তব্যটা শুনবার আগে আমার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া অনুচিত হ'বে। খানিক আগের বিচ্যুতির সমর্থনে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বুড়ো বয়সে সম্মুখের দিকে তাকাতে ভয় হয়, তাই এত পিছনে চেয়ে চেয়ে দেখি। এই জন্যই এত পিছন পিছন করছিলাম এতক্ষণ। নইলে আমি কি জানি না, যে লিখিত প্রমাণ থাকতে অলিখিত দলিল অচল? দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর আপনাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের বাহক হিসাবে, এখানে সেবা করবার সুযোগ যার হয়েছে সে আর এটুকু জানবে না? দ্বিতীয়ত আমি নিবেদন করতে চাই যে লিখিত দলিলের শূন্যতা পূর্তির জন্যে অন্য প্রমাণ দাখিল করবার আমার আইনসঙ্গত অধিকারও আছে। ঠিক নয় কি?

—মিউজিয়মে পুরনো জিনিস রাখে। তাই ব'লে মিউজিয়মটাও যে পুরনো, সে কথাও প্রমাণ করবার দরকার আছে নাকি?

—দেশাত্মপ্রাণ মিউজিয়ম যে ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। তখনও ঋষিকুমারবাবু যে 'দেশাত্মপ্রাণ' খেতাব পানইনি পাবলিকের কাছ থেকে।

Good! ঠিক পয়েন্টটা ধরেছে ছোকরা। অনাবশ্যক ছিবড়েগুলো ফেলে দিয়ে আবশ্যকটুকু নিংড়ে নিতে জানে। পসার জমাতে পারবে ভবিষ্যতে, যদি মুনসেফ-টুনসেফ না হয়ে যায়। ঋষিকুমার মারা যায় ১৯৪৫ সালে। উকিল হিসাবে ভাল ছিল ঋষিকুমার। নেতা হিসাবে কত বড় ছিল সে সব খবর দিতে পারবে, তাদের আইন ভাঙবার দলের লোকরা; আমরা জানি না। সেই সপ্তাহের 'জেলা হিতৈষী' কাগজে, তার মৃত্যুসংবাদের হেড লাইনে প্রথম দেখেছিলাম স্বর্গীয় ঋষিকুমারের 'দেশাত্মপ্রাণ' পদবী। এ শোনা কথা নয়, আমার নিজের চোখে দেখা লিখিত প্রমাণ। অবশ্য সে কাগজ এখন পাওয়া যাবে কি-না জানি না —নীলামি এস্তাহারগুলো পড়া হয়ে গেলেই সকলে ফেলে দেয় হয়ত; তবে 'লি মিউজিয়ম'এ—sorry 'দেশাত্মপ্রাণ' যাদুঘরে বোধ হয় পুরনো কপির ফাইল থাকতেও পারে। অ্যাও! আবার! আবার পিছনে তাকাচ্ছে! সাবধান! সোজা হয়ে বস! চোখ রগড়ে নাও! হ্যাঁ, যা' বলছিলাম—যা' লেখা আছে সেইটাই সত্যি, যা' উপর থেকে দেখা যায়, সেইটারই দরকার। সমুখে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে, সেইটাই আসল; তার পিছনে আছে মাকড়শার জাল—সম্পূর্ণ অনাবশ্যক জিনিস।

—মোক্তারানন্দ স্বামীর সাধনার গোড়ার দিকের স্তরগুলো জানো তো? ঢুকেছিলেন কলেক্টরিতে কেরাণী হ'য়ে। সেখানে কাজ করতে করতেই মোক্তারি পাশ করেন।

—আজকাল কিন্তু নিজেকে মোক্তার ব'লে পরিচয় দিতে আনন্দ পান না মোটেই। সাক্ষ্য দিতে হ'লে নিজের পেশা লেখান 'legal practitioner'—মোক্তার নয়।

—যত সব কি তোমার নজরেই পড়ে!

—তা' উনি নিজের পেশা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানগিরি লেখালেই পারেন। সাপও মরে, লাঠিও ভাঙ্গে না।

—বলেছ বেশ কথাটা। পেশা—চেয়ারম্যানগিরি। হাঃ হাঃ হাঃ। জিনিসটা আবার ঠিকেদারের কানাঘুষোগুলোর স্বীকারোক্তি হয়ে যাবে না তো?

না না না, যদিও আমার তরুণ বন্ধুরা বেশ একটা ticklish পয়েণ্ট তুলেছেন, তা' হ'লেও আমি তাঁদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে তাঁরা মানহানির ধারায় অভিযুক্ত হ'বার মত কথা ব'লে ফেলেছেন। দ্বিতীয়ত হরলাল মোক্তারের জীবন এখনকার issue নয়। আলোচ্য বস্তু ছিল 'লি মিউজিয়ম' লেখা শিলালিপিখানি; আলোচ্য বিষয় ছিল 'প্রতিষ্ঠিত, ১৯২৮ সাল', লেখাটি। অন্য সব অবান্তর প্রসঙ্গ এর মধ্যে টেনে আনবার কোনই দরকার ছিল না। ওগুলো ছাড়তে হয় চুটকি হিসাবে, আসল আর্গুমেণ্টের ফাঁকে ফাঁকে, হাকিমের মেজাজ বুঝে। নইলে যে তোমার সম্বন্ধে কোর্টের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে। আরম্ভ করতে হবে ঠিক আরম্ভের জায়গাটা থেকে। 'প্রতিষ্ঠিত, ১৯২৮ সাল' লিপিটির তুমি পাঠোদ্ধার করছ, সুতরাং তুমি ১৯২৮ সাল থেকে আরম্ভ করতে বাধ্য। তা নয় কখনও এখানে, কখনও ওখানে! খুব খারাপ অভ্যাস। হ্যাঁ, লি সাহেবের কথা এতক্ষণে তুলেছে ছোকরারা। That's it—এইবার ঠিক রাস্তায় এসেছ। লি সাহেব কবে এসেছিল এখানে, তা নিয়ে বাজে তর্ক ক'রে লাভ কি? লিখিত প্রমাণ রয়েছে ১৯২৭ সালের যে সংখ্যার 'জেলা হিতৈষী'তে, সেইখানা দাখিল কর না কেন। লেঠা চুকে যাবে। পরিষ্কার

লেখা আছে—'আমাদের জেলার নূতন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিস্টার ই ডবলু লি গত অমুক নভেম্বর তারিখে নিজের পদের চার্জ বুঝিয়া লইয়াছেন।' সেটা ছিল নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ নিশ্চয়ই, কেন না লি আর তার মেম সাহেবকে যখন প্রথম দেখলাম রাস্তায়, তখন তারা গরম পোষাক প'রে। স্পষ্ট মনে আছে বাইনোকুলার দিয়ে দু'জনে অশথ্ গাছের মগডালের হরিয়াল পাখী দেখছিল।

—আরে তেইশ বছর আগেকার শিলালিপি নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করলে ইউনির্ভাসিটি নেবে তো?

—নেবে আবার না! তেইশ বছর আগে যার জন্ম হয়েছে, আজকে সে সাবালক হ'য়ে বাপের সম্পত্তি উড়োচ্ছে। তেইশ বছর কি একটা সোজা ব্যাপার!

—না না সোজা কে বলছে? সাড়ে বাইশের চাইতেও বড় তেইশ। তখনও শফিক মিঞার দাড়ি কাঁচা ছিল।

...এরা দেখছি হেসে একটা সিরিয়াস বিষয়কে হালকা ক'রে দিচ্ছে। তেইশ বছরের ইতিহাস হ'য়ে গেল হাসির জিনিস। তেইশ বছর ধ'রে বলা রাম-শ্যাম যদু-মধুর কথাগুলোকে এক জায়গায় জড় করা কি যার তার কম্ম। মনের রেডিওটা খুলে বসি। এ রাজ্যে উকিল আমির শাসন আর সঙীন তুলে দাঁড়িয়ে নেই। তাই দূরের জিনিস কাছে আসতে ভয় পায় না। নতুন পুলিসসাহেবকে দেখেছিস? মিস্টার লি রে, মিস্টার লি। যেটা হালে, এখানে বদলী হ'য়ে এসেছে। বেহেড মাতাল। চলে ঘোঁতঘোঁত করে। নতুন বিয়ে ক'রে এনেছে। যেমন দেবা তেমনি দেবী। সাহেবের টুরের সময়ও সঙ্গে যাওয়া চাই মেমসাহেবের। যেখানে মোটর চলে না সেখানেও। ঘোড়ার পিঠে তো ঘোড়ার পিঠেই সই। স্টেথিস্কোপের মত বাইনোকুলার ঝোলানো গলায় দু'জনের। তার মধ্যে দিয়ে পাখী দেখা না গেলে হেসে গড়িয়ে পড়ে, এ ওর গায়ে। সব সময় একজন

আর একজনকে চক্ষে হারায়। জোছনা রাত হলে তো কথাই নেই। কপোত কপোতী যথা গোদাবরী তীরে। মাইরি বলছি। টুরের সময় আবার গীতাঞ্জলি প'ড়ে শোনান হয়; ঐ যেখান লিখে রবিবাবু মডেল প্রাইজ পেয়ে গেল। না না, বাজে কথা না। পুলিস সাহেবের স্টেনো আমাকে বলেছে! তোর গা ছুঁয়ে বলছি। মিছে বললে তোর টম কুকুরটার নাম বদলে আমার নাম রাখিস। রাখতাম ঠিকই, কিন্তু সে নামে যে সাড়া দেবে না কুকুরটা। নাম বদলানো কি অত সহজ রে! গায়ের ঘাম নয় যে মুছে ফেলে দিবি; বোকাবাবু উকিল শত চেষ্টা করেও তার নামটা বদলাতে পারল না আজও। ও তাই বল! ইংরিজী গীতাঞ্জলি? আমি ভাবছিলুম বুঝি বাঙলা!···

আকাশে বাতাসে ছড়ানো এতদিনকার বলা কথাগুলো থেকে আমি একটা ইতিহাস শুনে চলেছি। জন্মের তারিখ অপরিবর্তিত রেখে, শুধু নামটা কি ক'রে বদলে গেল, এ তারই ইতিহাস। ভারী interesting! কেবল ইতিহাস বললে ভুল হবে; সে একেবারে রামায়ণ মহাভারত মশাই —কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড! সবুর করুন। বিজ্ঞলোক আপনারা; এত উতলা হলে কি চলে। বেশী খিদে পেলে কি আপনি দু'হাত দিয়ে ভাত খান? কুরুক্ষেত্তর কাণ্ডটাই আগে শুনতে চান? এ তো কম আবদার নয়! দেখুন আমাকে চটাবেন না বলছি; বুড়ো বয়সে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না সব সময়। যাত্রার দলের অধিকারীকে গিয়ে বলুন না একবার যে যুদ্ধের জায়গাটা আগে দেখিয়ে দিতে। জমিদারবাবুর ঘুম পাবো পাবো হ'লেও সেটি হচ্ছে না। বৃথাই অরণ্যে রোদন। একটা সাধারণ নাম বদলাতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ঘোরাঘুরি করতে হয় এফিডেভিট করবার জন্যে। আর লি মিউজিয়ামের তো এখনও নামকরণই হয়নি। আগে নামকরণ হবে, তবে তো নাম বদলাবে। হ্যাঁ······অসুরাগড়ের গপ্‌পো জানিস তো? যখের ধনের ঘড়া আছে

সেখানে, মাটির নীচের সিন্দুকে। এখন সেখানে জঙ্গলে জঙ্গলাকার। বুনো শুয়োরের আড্ডা। সেই সাতান্ন মাইল দূরের অসুরাগড় থেকে আনল কি করে গরুর গাড়িতে এই বিরাট পাথরের চৌকাঠটা! আচ্ছা পাগল সাহেবটা! ধরে আনতে গেল নসে ডাকাতের দলকে সেই জঙ্গল থেকে; ডাকাতরা পুলিসসাহেবকে ফলার খাওয়ানোর জন্যে সেখানে বসে রয়েছে আর কি! ডাকাতের বদলে নিয়ে এল এই একখান জগদ্দল পাথরের চৌকাঠ। যখের ভাণ্ডারের দরজাই হবে বোধ হয়। মেমটারও সাহসের বলিহারি! সেই অজাগর-বীজবন তোলপাড় করতে গিয়েছে স্বামীর সঙ্গে! সব শালা দারোগার শাট থাকে ডাকাতের সঙ্গে; তাই থানার দারোগাকে পর্যন্ত খবর দিয়ে যায়নি। জঙ্গলের পর্ব শেষ করে তো মশাই উঠল গিয়ে থানায় বেলা বারোটায়। সেখানে তখন লোক গিজগিজ করছে; দারোগাবাবু তখনও বাড়ি থেকে বার হবার সময় পাননি। গিয়ে দারোগাকে এই মারে তো সেই মারে। এই গরমাগরমির বাজারে মেমসাহেব কুট্ করে একটি বুকনি ছাড়লেন —কতদিন হল আপনার বিয়ে হয়েছে দারোগাসাহেব? সতর বছর! তবুও! কথার ভঙ্গীতে লি সাহেব পর্যন্ত বকুনি ভুলে হেসে ফেটে পড়ে। হাসতে হাসতেই দারোগার উপর হুকুম হয়ে যায়, অসুরাগড়ের জঙ্গলের পাথরের চৌকাঠখানিকে গ্রেপ্তার করে বেঁধে-ছেঁদে চৌকিদার-কনস্টেবলের হেপাজতে সদরে পাঠিয়ে দিতে।

আসামী তো সাদরে লি সাহেবের কুঠিতে এসে দাঁড়ালো মশাই জোড়া গরুর গাড়িতে। সেই মিছিলকে সঙ্গে নিয়ে সাহেব তখনই গিয়ে ঠেলে উঠল জেলা ইস্কুলের কমনরুমে।

হেড মাস্টার, তুমি ছাড়া এসব ঐতিহাসিক জিনিসের কদর জেলার মধ্যে আর কে বুঝবে? এর পর আরও অনেক ছোট ছোট জিনিস আনবো অসুরাগড় থেকে।

হেড মাস্টার মশাই তো হেঁচে-কেশে, ভুল ইংরেজি বলে অস্থির—সরকারী এডুকেশন কোড-এ নাকি লেখা আছে, ইস্কুলের ঘর এসব কাজে ব্যবহার করা যায় না।

ড্যাম ইয়োর কোড!

ইস্কুলের হলঘরের মেঝে বুঝেছিল লি সাহেবের নাল-দেওয়া বুটের জোর। ঠকাশ করে শব্দটার কাঁপুনি আর বুকের কাঁপুনিতে মিলে হেড মাস্টার মশাইকে বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়েছিল, তার আবার এডুকেশন কোড! হেঃ!

তারপর থেকে চলল দাবার গৈবী চাল। ওরে আমার চালদেনে-ওয়ালারে! পাকা ছাদ থাকলেও বা হত; ঘরের চাল পুড়িয়ে চাল ভাজা খাইয়ে ছাড়বে! চুনোপুঁটি হরলাল মোক্তার গিয়েছে পাবলিক প্রসিকিউটর খাঁ বাহাদুরের সঙ্গে পাল্লা দিতে! মামদোর পাল্লায় পড়িসনিতো এর আগে। বুঝিয়ে ছাড়বে, কত ধানে কত চাল!

লে, লে তুই তো সবই বুঝিস! দেখতে হাড়গিলে হলে কি হয়; হাড়ে ভেল্কি খেলে হরলাল মোক্তারের। চোরাগোপ্তা এমন প্যাচ লাগাবে যে, খাঁ বাহাদুর দাড়ি চুলকোতেই থেকে যাবে; টেরও পাবে না। হ'লও কি তাই!

বেবুদ মিঞার বাগানটা আছে না, হরলাল মোক্তারের বাড়ির সঙ্গে লাগা? বাগান আর বলিস না ওকে, জঙ্গল। দিনমানে শিয়াল ডাকে। হ্যাঁ, এককালে ছিল বটে বাগান। জঙ্গলের মধ্যে ইউক্যালিপটাসের সার দেখলে এখনও সে কথা বোঝা যায়। ঐ বেঢঙা গাছগুলো এক নম্বরের অলক্ষুণে। দুচক্ষে দেখতে পারি না ওগুলোকে। যে কম্পাউণ্ডে দেখবি, সেখানেই শুনবি, তাদের সংসারে এককালে লক্ষ্মীশ্রী ছিল; এখন উবে গিয়েছে। তাই বেবুদ মিঞার পরিবারটাও গেল মরে হেজে। ঐ

বাগানটাকে নেবার জন্যে হরলাল মোক্তার অনেক কাল থেকে তক্কে তক্কে ছিল। তক্কে তক্কে থাকা কি, এক রকম নিয়েই নিয়েছিল। কুলটা বেলটা কার গভ্ভে যায়? তেঁতুলগাছ দুটো পর্যন্ত ওই বছর বছর জমা দিয়ে দেয়, পশ্চিমা ঠিকাদারের কাছে। কে আর বারণ করতে যাচ্ছে বল। মোক্তারগিন্নি পাড়ার লোককে বকতেও আরম্ভ করেছে আম পাড়লে। কৎবেল আর চাল্তা কুড়োতে গেলেও কুকুর লেলিয়ে দেবে, সেদিন এল বলে। এই বলে রাখলাম। দেখে নিস্। বড় দজ্জাল মোক্তার-গিন্নি! সে গুড়ে বালি। কোথাকার দেনমোহরে এদের কোন্ জমির টিকি বাঁধা, তা দেবা ন জানন্তি; হরলাল মোক্তার জানবে কি করে। কিন্তু হুঁ-হুঁ, পীর-ফকিররা জানন্তি; তাদের ওপর যে সংস্কৃত শ্লোক খাটে না। তাই খাঁ বাহাদুর জানতে পেরেছিল, কোথায় যেন বেবুদ মিঞার ওয়ারিশরা থাকে। কে জানে, কোথা থেকে এল চোদ্দ পুরুষের ঠাকুরদা এই ওয়ারিশ। এতকাল ছিলি কোন্ চুলোয়? তার কাছ থেকে খাঁ বাহাদুর তলে তলে কিনে নিলে জলের দামে, বেবুদ মিঞার বাগানটা। খাঁ বাহাদুর নাকি সেখানে মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে বাড়ি করে দেবে। খবর পেয়ে মোক্তারানন্দ তো সাত হাত জলের নীচে। তার মা কেঁদে বলে, ও হরলাল, তাহলে যে ওদের বাড়ীর কুঁকড়োগুলো উড়ে এসে আমার হবিষ্যি-ঘরে ঢুকবে।

তা আর কিঁ করছি বলো। বললে বটে হরলাল মোক্তার, কিন্তু কিছু না করে হাতগুটিয়ে বসবার পাত্তর সে নয়। বেবুদ মিঞার বটগাছটার নীচে যে পাথরের চোকো বেদীটা আছে, সেটাতে রাতারাতি সিঁদুর মাখানো হ'ল।

ভ্রূক্ষেপও নেই খাঁ বাহাদুরের।

নুড়িতে সিঁদুর লাগিয়ে কি আর খাঁ বাহাদুরের মত জাঁদরেল লোককে ঠেকানো যায়। মোক্তারানন্দ, এবার পড়েছ শক্ত পাল্লায়! তুই

হলি গিয়ে মাছিমারা মোক্তার, আর সে হচ্ছে সরকারী উকিল! জজ ম্যাজিস্ট্রেট তার হাতের মুঠোয়!

হরলাল থাকে ঐ ঝিম্ মেরে। হ্যাঁ…

কিন্তু একখানি আসল yellow dove—পাকা ঘুঘু বাবা—একেবারে পেটে পেটে……হ্যাঁ……সটান চলে গেল পুলিসসাহেবের কুঠিতে।……কি চাও বাবু? খাঁ বাহাদুর চলে ডালে ডালে তো হরলাল মোক্তার চলে পাতায় পাতায়। সাহেবের সঙ্গে কি কথা হ'ল কে জানে! সাহেব-মেমেতে গাড়ী নিয়ে বেরুল, সিধে খাঁ বাহাদুরের বাড়ীতে—বেবুদ মিঞার বাগানটা তাঁরা চান—সেখানে মিউজিয়মের ঘর উঠবে। এইবার নেঃ খাঁ বাহাদুর! ঠেলা বোঝ! এ যে একেবারে বিনে মেঘে সপ্পাঘাত! বেবুদ মিঞার জমিটাকে নিয়ে তবে লি সাহেব নিশ্চিন্দি।

নিশ্চিন্দি আর কই! সেই থেকেই তো হল শুরু। রাতদিন মিউজিয়ম আর মিউজিয়ম। আহার-নিদ্রা গুচলো সাহেব-মেমের—কাজে কাজেই হরলাল মোক্তারেরও। ঢালাও হুকুম হয়ে গেল পুলিস অফিসের হেড-ক্লার্কবাবুর ওপর প্রতি মাসের টি. এ. বিলের থেকে ইনস্পেক্টারদের কাটা হবে পাঁচ টাকা, দারোগাদের দু' টাকা আর কনস্টেবলদের চার আনা করে।

হেড-ক্লার্কবাবু ইশারা ছাড়লে দারোগাদের দিকে। তারাতো ধ'রে আনতে ব'ললে বেঁধে আনে। চোর-ডাকাত ফরিয়াদী-আসামী কেউ রেহাই পেল না সে বছর মিউজিয়মের চাঁদা থেকে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলব। সাহেব নিজে প্রথম দফায় চাঁদা দিলে একশ টাকা। তার পরেতে করলে এক কাণ্ড! হাসতে হাসতে মরি! এক চাঁদা তোলার মিটিঙে, গোঁফের ফাঁকে হেসে নিজের মেমসাহেবের উপর চাঁদা ধরলে মাসে পনর টাকা করে। মিসেস লি'র তো শুনেই যেন নাকের উপর

আরশুলা উড়ে এসে বসলো হঠাৎ। লাফিয়ে উঠেছে চেয়ার থেকে—মিহি খন্‌খনে গলায় একখান মেমসাহেবি অবাক হবার চীৎকার ঝেড়ে। কি আবার হল? ওঃ, না। হাসি হাসি যেন মুখখান! মেমসাহেব বলে কি—এমনি করে এক-হাট লোকের মধ্যে আমাকে অপ্রস্তুত করা! আমার ওপর বদনাম চাপিয়ে মিটিঙে নাম কেনবার ইচ্ছে? দাঁড়াও ফাঁকি দিয়ে পাবলিকের কাছে নাম কেনা আমি বার করছি! মিস্টার লি আমার উপর যত মাসিক চাঁদা ধার্য করেছেন, আমি দেবো তার চেয়ে এক টাকা করে বেশী—ষোল টাকা।

তা'হলে আমি ধরলাম সতর।

আমি দেবো আঠার।

আমি ধরলাম উনিশ।

আমি দেবো কুড়ি।

শেষকালেতে সাহেব-মেমে হ'ল রফা; নিলামের ডাক শেষ হ'ল ছাব্বিশ টাকাতে। মেমসাহেব হেসে বলে, আসছে মাস থেকে বাবুর্চি ছাড়িয়ে দেবো; নইলে এ টাকা দেবো কোথা থেকে? সাহেব বলে, কখনই না; ছাড়াতে হ'লে ছাড়াব মালী; সকালে বিকেলে বাগানে মাটি কোপানো শরীরের পক্ষে খুব ভাল।

কাণ্ড! সাহেব-মেমে কুকুরকুণ্ডলী লড়াই! মিটিঙের অনেকেই তো ইংরিজী কিচির-মিচির বোঝে না। ভাবলে বুঝি সত্যিকার ঝগড়া সাহেব-মেমে। হরলাল মোক্তারের বক্তিমে শোনবার পর বোঝে সারা ব্যাপারটা। সে কি কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বক্তৃতা! বোকাবাবু উকিলের কি রকম সবজান্তা ভাব জানিসতো? সব বুঝবার হাসি হেসে ফোড়ন দেওয়া হ'ল—এসব সাহেব-মেমে বাড়ী থেকে ঠিক ক'রে এসেছিল। অমনি মিটিঙের সবাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে—চোপরও! বাপ-মায়ে নাম রাখতে ভুল করেনি! বোকাবাবু তখন বাপ-মায়ের কাছ থেকে

পাওয়া প্রাণটাকে নিয়ে কোন রকমে মিটিং থেকে পালাতে পারলে বাঁচে!

বাবুর্চি ছাড়ালে, না মালী ছাড়ালে ভগবান জানেন; সে হ'ল গে তাদের সংসারের ব্যাপার। তবে হরলাল মোক্তার হ'ল মিউজিয়ম কমিটির সেক্রেটারী। সাহেব-মেম নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে জঙ্গল কাটালে। বেবুদ মিঞার জমিতে মিউজিয়মের বাড়ী তয়ের আরম্ভ হয়ে গেল।

হরলালের ওপর বাড়ী তয়েরের ভার; কিন্তু হেন দিন নেই যে সাহেব-মেম একবার সে বাড়ী দেখতে আসেনি। বলিস না, বলিস না! সাহেব-মেমের ভোঁতা চোখের আবার দেখা! হেঃ! দেখলি না ঐ হিড়িকে হরলালও নিজের দালান তুললে?

না না। ওসব খাঁ বাহাদুরের দলের রটানো কথা।

রটানো কথা? মোল্লা পীরের মুখ দিয়েই কি আমরা ভাত খাই নাকি? আমাদের নিজের চোখ নেই? চিরকাল তারপর দেখে এলাম, বছর বছর মিউজিয়মের কলি ফেরানোর সময়, মোক্তারের বাড়ীরও কলি ফেরানো; শিবে রাজমিস্ত্রি দু'জায়গাতেই কাজ করে। মোক্তারের বাড়ী দরজা-জানলার রং আর মিউজিয়মের দরজা-জানলার রং এক কেন? ছাখ, আর আমাকে ঘাঁটাস না বলছি! সেই থেকেই হরলাল মোক্তারের টুকটুকুর নেশা; সেই থেকেই তার পসার! স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই! পুলিসসাহেব যার এক গেলাসের ইয়ার, দারোগা-পুলিস চোর-ডাকাতগুলো সবাই যে তার বাড়ীতে ধন্না দেয়। লোকটাও ঘড়েল। তিন বছরে ফুলে ফেঁপে উঠলো একেবারে।

মাথট থানার দারোগা ভশ্চাজ্যি বামুন। ভারি নিষ্ঠে। তার দূরদেষ্ট দেখ। কাঠচাঁপাতলীর বৈরাগীচত্তর আছে না? যেখানে মেলা বসে কার্তিকের পূর্ণিমায়। একজন গাঁয়ের লোক সেখান থেকে ইট

খুঁড়ে বার করতে গিয়ে একটা কৌটা পায়। তার মধ্যে একটা পোকাড়ে দাঁত না কি যেন। তার তো দেখেই চক্ষুস্থির। গাঁয়ের লোক ভয়ে অস্থির। চৌকিদার সেটাকে নিয়ে যায় থানায়। বামুনের পো দারোগা কাঠচাঁপা-তলীর শ্মশানঘাটে সেটাকে দাহ করায়, চাঁদা করে চন্দনকাঠ কিনে। অহোরাত্র শ্রীখোলের বাদ্যি আর কীর্তন। দাঁতের মালিকের কাছে তার আওয়াজ পৌছেছিল কিনা তিনিই জানেন; তবে এর খবর পৌছে গেল লি সাহেবের কানে। হরলাল মোক্তারই দিয়েছিল বোধ হয়। তার তখন আঙুল ফুলে কলাগাছ; পুলিসসাহেব বন্ধু; ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

তুইতো সব জিনিসের মধ্যে হরলালকে দেখতে পাস! কোন্ দারোগা কি করে, তার খবর পুলিসসাহেবকে দেবার জন্যে কোনও মোক্তারের দরকার হয় না। যাক্‌গে! মরুক গে! সাহেব শুনেই তো ভশ্চাজ্যিপোর ওপর খাপ্পা। সঙ্গে সঙ্গে সাসপেণ্ড। একেবারে বদ্ধপাগল! এর পর কি আর দারোগা-পুলিসে জেলার কোথাও নুড়ি-পাথর-হাড়-দাঁত রাখলে? কেউ সদরে খালিহাতে আসে না। এসেই প্রথমে দেখা করে হরলালের সঙ্গে। জেলা জুড়ে সে একেবারে হৈ-হৈ কাণ্ড, রৈ-রৈ ব্যাপার! হাহাকার পড়ে যাবার যোগাড় গাঁয়ের দেবতাদের মধ্যে। লি সাহেবের নামে বাঘা দারোগা পর্যন্ত কাঁপে। তাই কারও বুকের পাটা নেই তাকে শাপমুক্তি দেবার। দারোগা বেচারাই বা কি করে; ঐ পাথর ফুঁড়েই একমাত্তর আসতে পারে মোক্তারানন্দ আর লি সাহেবের কৃপাদৃষ্টি।

নাম হয়ে গেল 'লি মিউজিয়ম'। সাহেব-মেম প্রথমটায় আপত্তি তুলেছিল। হরলাল তা শুনবে কেন। অশথতলার বেদীর চৌকো পাথরখান সরানো হ'ল; নিজে হাতে লাগানো সিঁদুর নিজ হাতে মোছা হ'ল; খড়ি দিয়ে তার ওপর লেখা হ'ল "লি মিউজিয়ম—প্রতিষ্ঠিত ১৯২৮ সাল।" শুধু নিজে পারে না বলেই ডাকতে হ'ল যে লোকটা শিল-জাঁতা

কোটে, তাকে—ছেনি দিয়ে লেখার লাইনে লাইনে পাথর কেটে বার করতে।

তাই না লেখার ঐ ছিরি! দৃষ্টি কেপ্‌ণ! তা নয়! সাহেব-মেমকে হঠাৎ অবাক করে দেবার জন্যে এই কাণ্ড। নইলে এত খরচ করে বাড়ী হ'ল, একখানা পাথর কি বাইরে কোথাও থেকে লিখিয়ে আনাতে পারত না। নিজে হাতে ছেনি দিয়ে খুঁদেছে শুনে মেম-সাহেবের তো গদগদ অবস্থা! কেঁদে ফেলবার জোগাড়! সেই পাথরখানাকেই মিউজিয়মের গেটের পাশে হ'ল রাখা।

অতি বদ মশাই, অতি বদ! এই পাড়ার ছেলেগুলো। ফাজিলের অগ্রগণ্য! তারা বলাবলি করল—লি মিউজিয়ম নয় রে, ৯ মিউজিয়ম। ঋ ৯র ৯। ৯কার ৯কার! ৯কার মানে জানিসতো ইংরিজীতে? বোতলের সেই! এ হচ্ছে ঢুকুঢুকু মোক্তারের ৯কার মিউজিয়ম। সেই রাতেই পাথরের উপরের লি কথাটাকে কেটে, সেখানে কাঠ-কয়লা দিয়ে লিখে দিল ৯কার। হরলাল খবর দিল হেড মাস্টারমশাইকে। উপরের ক্লাসের অতগুলো ছেলেকে একসঙ্গে বেত মারবার হুলুস্থুলুতে ইস্কুলে হাফ-হলিডে হয়ে গেল। অফিসের যেসব আমলাদের গুণধরেরা ছিলেন এর মধ্যে, তারা তো ভয়ে মরে। এখন ভগবানের কৃপায় কোন রকমে এই ব্যাপার ঐ বাঘা সাহেবটার কানে না পৌছলে হয়। তা কি হবার জো আছে এ সংসারে! কে যেন গিয়ে লাগিয়েছে! ঐ বিটলে মোক্তার ছাড়া আর কে হবে! তখনই সাহেব-মেম গাড়ী হাঁকিয়ে মিউজিয়মের ফটকে এসে হাজির। চক্ষু রক্তবর্ণ। পাড়ার লোকে ত্রাহি ত্রাহি। হরলাল মোক্তার কাঠকয়লা দিয়ে লেখা কথাটার মানে বুঝিয়ে দিল। বুঝতে পেরে সাহেব-মেমের সে কি হাসি! বড় মজার কথাটাতো। অতটুকু টুকু ছেলেরা এত রসিকতা করতে জানে? তখনি ফুটবল মাঠে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে দেখা করে। ছেলেদের তখন হয়ে গিয়েছে। সাহেব

আবার পকেটে হাত ঢুকোয় যে রে বাবা! একচোখ বুজে, হাতের মুঠোর নিশানা করে সাহেব বলে 'ফট্!' বলেই সাহেব মেম হো হো করে হেসে ওঠে। হাত থেকে বার করে দেয় একখানা দশ টাকার নোট ফুটবল ক্লাবের জন্য।

সাহেবদের খামখেয়ালি তো!

ষাঁড়ের ডালনা! একেবারে ষাঁড়ের ডালনা! এতটুকু শহরে আবার মিউজিয়ম! গোটা শহরটাইতো ছিল চিড়িয়াখানা! এইবার হল মিউজিয়ম! কলকাতা না করে আর ছাড়লে না দেখছি! বাকি শুধু হাওড়ার পুলটা! কি রসই পেয়েছে সাহেব-মেম ঐ মিউজিয়মে! যখন তখন দেবাদেবী সেখানে গিয়ে হাজির। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর পর্যন্ত দুজনে এক-একদিন মিউজিয়মের মাঠে এসে পায়চারি করে। জোছনা রাত হ'লে তো কথাই নেই। সাপের কামড়েরও ভয় নেই? আশ্চর্য! সাপগুলোও কি লোক চেনে নাকি? রাতের বেলায় সাপের কামড়ে চোর মরেছে তাও কখনও শুনিনি, সাহেব মরেছে তাও কোনদিন শুনিনি। কপোত-কপোতী প্রত্যহ মিউজিয়মে এসে কি এত গপ্‌পো করে, ভারি জানতে ইচ্ছে করে, মাইরি। সেই যে কথা আছে না—আদেখলের ঘটি হ'ল, জল খেতে খেতে বাছা ম'ল—এদের হয়েছে তাই! পুলিশ-সাহেবের নামে তো আর কোথাও ইস্কুল কলেজ পথ ঘাট তয়ের হয় না; সে-সব একচেটে কলেক্টর আর লাট-বেলাটদের। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে কিনা এর, তাই এত হ্যাংলাপনা!

হোঃ! বেড়ালের ভাগ্যির কথাই যদি তুললি, তবে আমি বলব সে হলগে হরলাল মোক্তারের। ওরই বরাতে লি সাহেব এসেছিল এখানে। নইলে দারোগা পুলিসের মধ্যে নিজের ঢাক নিজে পিটতো কেমন করে। দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাচ্ছে লোকটা। কিন্তু এদিকে ওয়ান পাইস

ফাদার মাদার! গাঁটের পয়সা খরচ করে ওকে একদিনও কেউ মদ খেতে দেখেছে? লি সাহেবের বাড়ি বড়দিনের দিন টেনে '৯কার কেমন ডিগবাজি খায়' তারই কসরত দেখিয়েছিল। দেখে মোক্তার-গিন্নি মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে, দিয়েছে আচ্ছা করে!

লি সাহেব যে কদিন আছে করে নে! কিন্তু সাহেব বদলী হ'লে তখন? কথায় বলে না—এই দিন দিন নয়, আরও দিন আছে!

সেই দিন আর কতকাল ঠেকিয়ে রাখা যায়। চলে যাবার আগে লি সাহেব ব্যবস্থা করে দিল যাতে মিউজিয়মটা মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি হয়ে যায়, কিন্তু কমিটির সেক্রেটারী থাকবে হরলাল মোক্তার। ফেয়ারওয়েলের মিটিংএ সাহেব মেম চোখের জল ফেলে বলে গেল যে তোমাদের মিউজিয়ম যাতে কোনও দিন উঠে না যায় তার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলাম।

হরলাল মোক্তারও ফাইন বক্তৃতা দিলে—এই মিউজিয়ম আপনাদের ছেলের মত, একে যখন আমাদের হেপাজতে রেখে গেলেন, তখন আমাদের দিক থেকে কোনওরকম চেষ্টার ত্রুটি হবে না। আরও কত কথা। দু'বছর পসার জমিয়েই দেখি বেশ বলতে শিখে গিয়েছে গুছিয়ে, হরলাল মোক্তার! অভ্যাস! অভ্যাস! বলা-কওয়া সবই অভ্যাসের ওপর। হিমালয়ের বরফের ওপর খালি গায়ে সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকে না? এও সেইরকম। শরীরের নাম মহাশয়, যত সওয়াবে তত সয়!

অ্যাও-ও-ও......! কে হে ছোকরা, একজন বার লাইব্রেরীর মেম্বার কাগজ পড়ছে, তার হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিতে এসেছে? একজন সিনিয়র মেম্বারের হাত থেকে! আবার ছুতো দেখানো হচ্ছে! আমি ঘুমাচ্ছিলাম? মিছে কথা ব'ল না! নাক-ডাকানি শুনেছ? মিথ্যে কথা! ঘুম ভাঙ্গবার ঠিক আগেই আমি

চিরকাল নিজের নাকডাকানি নিজে শুনতে পাই। যদি ঘুমাতাম, তা'হলে এখনও পেতাম। আই সি! কস বেয়ে নাল পড়েছে! এই দেখেই নিশ্চয়ই ধ'রে নিয়েছে যে আমি ঘুমাচ্ছি। ওটা ঘুমের নাল পড়া নয়। দাঁত পড়ে গেলে এমনিই হয়। দেখেছ ঠিকই; কিন্তু ঠিক তথ্য থেকে যে জিনিসটা অনুমান করেছ সেটা ভুল। ঘটনা, আর ঘটনা থেকে অনুমান এ দুটো জিনিসকে ঘুলিয়ে ফেললে ওকালতি করবে কি করে? যাক্! That's a'right! মাপ চাইবার আগেই আমি তোমাকে ক্ষমা করে বসে আছি; ভুলচুক সবারই হ'তে পারে! দেওয়ালের ছবিগুলিকে উপেক্ষা করবার উপায় নেই—ও দিকে না তাকালেও নয়। না না আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমি ইচ্ছা করে আপনাদের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে চাইনি; চেষ্টা করেছিলাম না ঘুমাতে; অসফল হয়েছি; আর ঘুমাব না। বুঝতে পেরেছেন আমার বক্তব্য আপনারা? প্রথমত আমি স্বীকার করছি যে এতক্ষণ ধরে শোনা কথার ভিত্তিতে অলিখিত ইতিহাস খাড়া করছিলাম। এখন বুঝছি যে সেটা ভুল। আইনের চোখে প্রমাণ হিসাবে সেগুলো গ্রাহ্য নয়। দ্বিতীয়ত এতেও যদি আপনারা তৃপ্ত না হন, তবে আমি সোজাসুজি আপনাদের দায়ী করবো—আপনাদের রাজ্য থেকে আমাকে বেরুতে দিয়েছিলেন কেন? আপনাদের আওতায় আমাকে টেনে আনবার বেলা যে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করেন, তারই কিছুটা আমার ঘুম আসবো আসবো হ'লে, আমার উপর প্রয়োগ করেন না কেন? তা হ'লেই তো আমার আর hearsay evidence ব্যবহার করবার সুযোগ ঘটে না। তৃতীয়ত আমার জুনিয়র ভাইয়ের কাছে এখনই যে ঘুমনোর কথা অস্বীকার করেছি সেটা হয়ত সত্যি নয়; কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার জবাব হচ্ছে যে, যদি সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে হলফ নিয়ে সে কথা বলতাম, তা'হলে সেটা অবশ্যই বে-আইনী হ'ত। কিন্তু আমি বলেছি শপথ না নিয়ে; খবরের

কাগজ থেকে বে-দখল না হওয়ার উদ্দেশ্যে। কাজেই আমি আমার অধিকারের বাইরে যাইনি।

কেমন—খুশী তো! আমার আর্গুমেন্ট শেষ হ'ল। এইবার আমি আইনগ্রাহ্য লিখিত দলিলের সাহায্যে লুপ্ত ইতিহাস দাঁড় করাচ্ছি। শোনা কথা আর নয়। কিন্তু কান বন্ধ করি কি করে! পাশের টেবিলের জুনিয়র ভাইদের সেই গপ্‌পো এখনও চলছে যে। এক মুহূর্তও স্থির হয়ে ভাবতে দেবে না ওরা। ওদের গল্প করতে বারণ করবার আমার কি অধিকার আছে?

—হরলালের পসার-প্রতিপত্তি যা' বল সব তা'র পুঁজি ঐ মিউজিয়ম। ওটাকে নেড়েচেড়েই ওর খাওয়া। আজকাল না হয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছে, কিন্তু তার আগেও চিরকাল মিউজিয়মের নাম করেই সে হাকিমহুকমদের সঙ্গে দেখা করে—কাজ না থাকলেও। হেন কলেক্টর আসেনি যে এই মিউজিয়মের জন্যে একটা চ্যারিটি নাচগান করায়নি। কে আর অ্যাকাউণ্ট দেখতে যাচ্ছে বলো।—আর হাকিমদের সঙ্গে আলাপ থাকলেই উকিল মোক্তারের প্র্যাকটিস।—হ্যাঁ, মক্কেলতো সব তেমনিই। মক্কেলকে বাইরে বসিয়ে অফিসারের ঘরে ঢুকে একটু মিউজিয়মের গপ্‌পো করে আসতে পারলেই বাইরে এসে তার কাছ থেকে মোটা ফি আদায় করা যায়। বাইরে এসেই বলবেন মক্কেলের কাজ হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই রকমই তো প্র্যাকটিস মোক্তারানন্দের। মিউজিয়মটা ওরই পৈতৃক সম্পত্তি—নামেই মিউনিসিপ্যালিটির। ওরই গরু চরে মিউজিয়মের কম্পাউণ্ডে, মিউজিয়মের চাকরটা ওরই বাড়ির বাসন মাজে, মিউজিয়মের আউট হাউসে ওর ছেলের মাস্টার থাকে, ওর বাড়ির ভোজে কাজে এসো জন বস জন, সবই তো মিউজিয়মের হল ঘরে।

—হ্যাঁ, আজকাল আর মিউজিয়ম দেখতেই বা কে যায়? আছেই বা কি?

—যায় কেবল ঐ ইস্কুল-পালানো ছেলের দল সিগারেট খেতে।

—এখন তো আবার মোক্তারানন্দ মিউনিসিপ্যালিটি হাতে পেয়েছে। পোয়া বারো একেবারে! মিউনিসিপ্যালিটির কুলিগুলো তো ওর বাগানেই দেখি সারাদিন কাজ করে।

—মোক্তারি, মিউজিয়ম, মিউনিসিপ্যালিটি—পঞ্চমকারের মই বেয়েই লোকটি উঠে গেল।

—হাঃ হাঃ বলেছ ঠিক। আজকাল মস্ত বড় লিডার হয়ে উঠেছে।

—পেটে ৯কার, উপরে লিডার!

—ছিলি হরলাল, হলি জ কাটা জহরলাল! ঋষিকুমারবাবুর খালি জায়গাটা নিতে হবে তো।

না, না এরা বড় বেশী ব্যক্তিগত করে তুলেছে ব্যাপারটা। হচ্ছে শিলালিপিখানার কথা। এরা কেবল তুলবে হরলাল মোক্তারের কথা। —যেন সেইটাই মুখ্য। হরলালের কথা আনবে না কেন, আনো; কিন্তু শিলালিপির ইতিহাস বলতে গেলে যেটুকুনি দরকার সেটাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছ কেন? ভাল ভাল কথা সাজিয়ে বলতে পারলেই আর্গুমেণ্ট হয় না। কোর্ট সে সব বক্তৃতা শোনেও না। প্রাসঙ্গিক ঘটনা দিয়ে আরম্ভ কর। ঋষিকুমারবাবুর মৃত্যু থেকে। দাখিল কর সেই সপ্তাহের 'জেলা হিতৈষী'। একজিবিট নম্বর দেন পেশকারমশাই। লাল পেন্সিল দিয়ে আণ্ডার লাইন করে দিয়েছ তো 'দেশাত্মপ্রাণ' শব্দটি। হ্যাঁ। ব্যাস! ওতেই হবে। তারপর কোর্টে দাখিল কর মিউনিসিপ্যালিটির মিটিংএর এজেণ্ডা, যেটাতে হরলাল প্রস্তাব দিয়েছিল লি মিউজিয়মের নাম বদলাবার। হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে! ঠিক! এমনি করে কাজ করতে শেখো, তবে না!···এজেণ্ডাতে ঐ একটা প্রস্তাবই ছিল। হঠাৎ

অসুস্থতার জন্যে হরলাল সেদিন যেতে পারেনি, তাই মিটিং স্থগিত হয়েছিল—তলব করে দাও মিউনিসিপ্যালিটির মিটিংএর বই।…স্থগিত মিটিংএ কোরামের দরকার হয় না জানো তো? 'জেলা হিতৈষী'র সেই সংখ্যাটা দেখে নিও যেটাতে বড় বড় অক্ষরে বার হয়েছিল 'দেশাত্মপ্রাণ স্বর্গীয় ঋষিকুমারের নাম চিরস্থায়ী করিবার প্রশংসনীয় উদ্যম—মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের।'…হ্যাঁ, চিরস্থায়ী! কথাটা বেছেছে দেখ! এরা আবার কাগজের এডিটারি করে! কর্ণওয়ালিশও করেছিল চিরস্থায়ী, লি সাহেবও ভেবেছিল চিরস্থায়ী!……লোকে লোকারণ্য। সারা শহর ভেঙে পড়েছে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে, মায় ডাকপিয়নটা পর্যন্ত। মিউনিসিপ্যালিটির মিটিঙে নাম বদলানো হবে লি মিউজিয়মের। এক মাস আগেই হয়ে যেত, কিন্তু মিটিঙের ঠিক আগের রাত্রে বাড়ির উঠনে হোঁচট খেয়ে চেয়ারম্যানের পা মচকে যায়। মচকানি আর বলিস না ওকে, পা ভেঙে যায় বল। এখনও ব্যাণ্ডেজ খোলে নি। এতদিন তো শয্যাগতই ছিল ভদ্দরলোক। আজ ওই পা নিয়েই এসেছে। রাতের বেলায় একটু ইয়ে থাকেন কি-না, ঢুকুঢুকু-মোক্তার। ছাখ্, সব সময় পরের ছিদ্দির খুঁজে বেড়াস কেন বল্‌তো! উঠনে পড়ে যাবার সময় চেয়ারম্যানের পা টলছিল কি-না, তুই দেখতে গিয়েছিলি? আজকের মিটিঙ বাঘের খেলা! খাঁ বাহাদুরের দল বাগড়া দেবে! বাগড়া দিয়ে যেন দেখে! ভাল ছেলের বাপ আঁটকুড়ো! আজকে তা'হলে দাড়িটি সমেত আর এখান থেকে ফিরে যেতে হবে না। হরলাল মোক্তারের সঙ্গে তোর রেষারেষি চেয়ারম্যানগিরি নিয়ে; তাই বলে ভাল কাজেও বাগড়া দিতে হবে? ভোটে পারিস না, চেঁচিয়ে মরিস্ কেন? ওই খোঁড়া পা নিয়ে আবার উঠছে কেন ভদ্দরলোক; বসে বসে বললেই তো হয়। লি মিউজিয়মের বদলে 'ঋষিকুমার যাদুঘর' নাম রাখা হোক্। কি ফাইন বলছে মাইরি! তা খোঁচা মারছিস

কেন, কনুই দিয়ে? ছাখ্, ছাখ্ চোখে জল এসে গিয়েছে হরলালবাবুর বলতে বলতে। বল্, রুমালে পিয়াঁজের রস লাগানো আছে! বল্! 'ছিল ৯, হবে ঋ'! কে বললো? কেরে? ঐ বেগুনের কাবাবের দিক থেকে এসেছে কথাটা! টেনে জিব ছিঁড়ে দেবো! যে লোকটা স্বর্গে গিয়েছে, তার নাম নিয়ে ঠাট্টা! এইবার উঠেছেন খাঁ বাহাদুর। ঠাণ্ডা তো আমরা মেরেই আছি বাবা; বল না কেন যা বলবার! লি মিউজিয়ম নামটা খাঁ বাহাদুরও দেখি বদলাতে চায়। একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে? তবে খাঁ বাহাদুর বলতে চান যে কোনও অল ইণ্ডিয়া লিডারের নামে মিউজিয়মটা হ'লে ওপর থেকে টাকাকড়ি পাবার সুবিধা হতে পারে। একেবারে ফেলনা নয় কথাটা। এইবার উঠলো বুড়ো মুটুবাবু। বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি। চিরকাল লোকটা একই রকম থেকে গেল। সেই বারোয়ারি দুগ্গাপুজোর নেমন্তন্ন-পত্তর ছাপাবার ঝগড়ার সময় দেখেছিলি না—অন্নভোগও লিখতে হবে না, খিচুড়িভোগও লিখতে হবে না; দু' দলের ঝগড়া মিটিয়ে লিখে দিল খেচড়ান্নভোগ। ঠিক যা' বলেছি। ঋষিকুমারও না, অল ইণ্ডিয়া লিডারের নামও না—নাম দিয়ে দাও 'দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘর'। কেমন, বেশ দু'জনের কথাই থাকলো। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বঁড়শিও না, টড়শিও না, নোয়া বাঁকানো।

এখানেই শেষ ভাবিসনি। আরও মজা আছে। পরের দিন সকালে চেয়ারম্যানের বৈঠকখানাতে ভিড় লেগেছে। সে তো রোজই লাগে। মিউনিসিপ্যালিটির কেরানীরা, ঠিকাদাররা, দলের লোক, মক্কেল, আরও কত লোক। অমন জমজমাট মিটিঙের পরের দিন কি না। মজলিসের গপ্পো থেকে একটু ফুরসৎ হ'লে ইজি-চেয়ারের দিকে কেরানী-বাবু মিউনিসিপ্যালিটির ফাইলগুলো নিয়ে এগিয়ে যায় দস্তখতের জন্যে। লোকজনের সঙ্গে গপ্পো করতে করতেই চেয়ারম্যানবাবু দস্তখত

করেন। কিন্তু অত কাজের লোকের কি দু'দণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলবার সময় আছে। একটানা চলেছে খস খস করে দস্তখত, খিক খিক করে হাসি, কুট কুট করে টিপ্পনী। এতে বাধা পড়লো; কেরানী বাবু বলেন, এ-চিঠিখানি পড়ে দেখবেন স্যার। কি আবার আছে চিঠিখানায়? বিলেতের দেখছি যে! মেথরের গাড়ি, না হয় ডাস্টবিন সাপ্লাই করবার কোম্পানির নিশ্চয়! না। এ যে দেখছি মিসিজ লির চিঠি। মিসিজ লি? লি সাহেবের মেম? সেই যে এখানে পুলিশসাহেব ছিল? হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ইণ্টারেস্টিং! শুনুন শুনুন, কি লিখেছে।—"আপনারা শুনে দুঃখিত হবেন যে, আমার প্রিয় স্বামী এরিক উইলিয়ম লি গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে স্বর্গগত হয়েছেন। কিছুদিন থেকে তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। তিনি আপনাদের শহরকে, বিশেষ করে আপনাদের মিউজিয়মটিকে কিরূপ ভালবাসতেন, তা আপনারা জানেন। আপনাদের সুন্দর দেশে থাকার সময় কর্মসূত্রে বহু শহরে ও গ্রামে আমরা গিয়েছি, কিন্তু ঐ ছোট্টো ক্ষমাশীল শহরের নাগরিকদের কথা কোনও দিন ভুলতে পারিনি। আপনারা পরদেশীকে আপন করে নিতে জানেন। আমাদের ওখানকার জীবনের সহিত স্থানীয় মিউজিয়মটির স্মৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের সেই সময়ের নতুন বিবাহিত জীবনের মধুর ভাবানুষঙ্গগুলো থেকে ওখানকার মিউজিয়মটিকে আমি কিছুতেই আলাদা করতে পারি না। যাক্‌গে। এসব হ'ল আমার ব্যক্তিগত কথা—একান্ত ব্যক্তিগত। যার জন্যে এই চিঠি লেখা, সেটা হচ্ছে যে—আমার স্বামী আপনাদের মিউজিয়মের জন্যে তিনশ' পাউণ্ড দিয়ে গিয়েছেন! টাকা সামান্য হলেও এর পিছনের প্রীতির সম্বন্ধের কথা মনে করে আশা করি, আপনারা প্রত্যাখ্যান করবেন না। কিরূপভাবে পাঠালে আপনাদের সুবিধা হয়, জানালে বাধিত হব।"

এ যে একেবারে লম্বা চিঠি। লি সাহেব এদেশ থেকে চলে যাওয়ার আগে ডি. আই. জি. হয়েছিল, না? কাণ্ড! লক্ষ্য করেছেন, ঐ আঠারই সেপ্টেম্বর রাত্রেই আমারও পা মচকে গিয়েছিল—সেই মিটিঙ স্থগিত হবার আগের দিন—এক মাস আগে। আশ্চর্য! কেরানীবাবু চিঠিখানাকে 'অনাবশ্যক ফাইলে' রেখে দিও। না-না, কোনও জবাব দেবার দরকার নেই। কতই-বা টাকা! ওর চেয়ে অনেক বেশি আমরা সরকারি গ্র্যান্ট পাবো।

গিন্নি আবার বাড়ির মধ্যে এত চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন কেন? বসুন আপনারা এক মিনিট। আমি একটু বাড়ির ভিতর হয়ে আসি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাবধানে। দেখবেন আবার ঠোকর-টোকর না লাগে জখম-হওয়া পা-টায়।

শুনছেন চীৎকার? চেয়ারম্যানবাবুর গিন্নির? বলবেন না আর। নিত্যি তিরিশ দিন এই ব্যাপার। পাড়াশুদ্ধ তটস্থ। ওকি! ও আবার কি বার করছে মিউনিসিপ্যালিটির কুলীরা চেয়ারম্যানসাহেবের উঠন থেকে? ওরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্? আজ বাগানে কাজ করছিস না যে বড়? মা বললেন, এই পাথরখানাকে টান মেরে ফেলে দিয়ে আসতে? মিউজিয়মে? কেনরে? এইটাতেই চেয়ারম্যানবাবু হোঁচট খেয়েছিল? আমাদের দিয়েই আনিয়েছিল কুঁয়োতলায় পাতবার জন্যে। বলিস্ কি! ঠিকই তো! ঠিক সেই পাথরখান! ঐ তো লেখা রয়েছে। লি মিউজিয়ম, প্রতিষ্ঠিত ১৯২৮ সাল। কাণ্ড মশাই! দিনের বেলায় গায়ে ছমছমানি ধরিয়ে দিলে। ভূত হয়ে নিজের জায়গা করিয়ে নিলে মিউজিয়মে! কম্মফল! যার যেমন কম্মফল। ঐ একই জায়গায় দেখুন না ঋষিকুমারবাবুকে! এর আর কি করছেন বলুন!…

চমকে উঠেছি···ঠক করে শব্দ···নাকের ডাক···ধড়মড় করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেছি। ও, আমার ছাতাটা চেয়ারের সঙ্গে দাঁড় করানো ছিল; সেইটাই পড়ে গেল বুঝি!

সেই থেকে চেয়ারে ঠায় বসেছিলাম; একেবারে গা-হাত-পায়ে ব্যথা ধরে গিয়েছে। দেওয়ালের তোমরা শুনছ? আর আমি তোমাদের কেয়ারও করি না। বেঁচেছি বাবা, তোমাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে। একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। এই অনাবশ্যকের রাজ্যই আমার ভাল। এখানকার কনে-দেখা-আলোর জীয়নকাঠি লেগে, বাজে, অবান্তর অকেজোগুলোও জীয়ন্ত হয়ে ওঠে। ভাবো কি তোমরা? ওপরের পাথরখানাই সব? তার নীচের জলটা কিছু নয়? পাথরখানার যদি কোন দরকারই না থাকে, তবে সেখানাকে নিয়ে গিয়েছিলে কেন বাড়ির ভিতর চেয়ারম্যানবাবু? মশলা বাটবার শিল করবে বলে? না, কাপড় কাচবার পাটা করবে বলে? কেমন? পারলে ঠেকিয়ে রাখতে? লি মিউজিয়ম লেখা পাথরখানাকে? আবার এনে রাখতে হ'ল কিনা সেখানা মিউজিয়মের বাড়িতে? ঐ তো এত ভেবে-চিন্তে, কসরত করে সাইনবোর্ড লিখিয়েছিলে, "দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘর, ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত।" ভেবেছিলে যে লেখার পিছনটা একেবারে মুছে দিতে পেরেছে। আরে মুখ্যু! তা কি হয়? ঐ ১৯২৮ সালটার মধ্যে দিয়ে তুই যে নিজের অজানতে পুজো করছিস লেখার পিছনের লি সাহেবকে। কত মিষ্টি মনে পড়ার আমেজ, দুটি মনের কত আকুলি-বিকুলি, কত টান, কত বুকের দুরু দুরু, কত একসুরে বাজা, কত না-বলা, কত না-লেখা—সব অনাবশ্যকগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তোমাদের অবিচারের প্রতিবাদে। তাদের দাবীই মেনে নিয়েছ তোমরা '১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত' লিখে। সেইগুলোই ঐ আইনচঞ্চু মোক্তারটার মাথায় ঘা দিয়ে দিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে যে, যাদুঘর

যত আগে প্রতিষ্ঠিত দেখাতে পারবে, ততই তার কদর বাড়বে। চোখের আড়ালের বোবা জিনিসগুলোর বিদ্রোহ। কার সাধ্যি তাদের ঠেকায়। অধিকার আদায় করে তবে ছেড়েছে। ইতিহাসের টেক্সট বইয়ে এ-বিদ্রোহের কথা নাই-বা লিখলো। নতুন সাইনবোর্ডখানার মধ্যে পরিষ্কার লেখা হয়ে গিয়েছে তাদের অধিকারের অলিখিত শিলালিপি। দেখবে কি করে? তোমাদের যে চোখে ঠুলি।

—একি! বৃদ্ধ হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন কেন? ছাতাটা মেঝেতে ফেলেই যে চললেন।

—একেবারে সেভেন্টি-টু!

—আজ চা না খেয়েই চললেন যে আপনি?

ও! বিরাজের ছেলে না? সে ধরে এনে আবার আমাকে চেয়ারে বসালো। সত্যিই তো, চায়ের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।… Sorry…আমি এই বার লাইব্রেরীতে বসিয়া সুস্থ মনে ও সবল অন্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি যে…না-না! Sorry!…যে আগাগোড়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। বলছি তো যে, পিছনে ছিটিয়ে-ফেলা মনের মিহি খোসাগুলো কুড়োতে যাওয়া ভুল। আর কি করে বলব? কেমন, এইবার আপনারা Satisfied? ওহে। কি যেন তোমার নাম—বিরাজের ছেলেকে বলছি। মিউনিসিপ্যালিটির 'অনাবশ্যক ফাইল'গুলো তিন মাস পর পর পুড়িয়ে ফেলবার নিয়ম না? আন্দাজে বলো না। আহা, মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টখানা দেখেই নাও না একবার। সব সময় উত্তর দেবার আগে আইনের ধারার লেখাটা দেখে নিও। লেখা অক্ষরগুলোই আসল; বুঝলে হে!

এবং দ্বিতীয়ত…

এই দেখ, সেকেণ্ড পয়েন্টটা মনে আসছে না আর।…

ঈর্ষা

আমি লোকটি অত্যন্ত নার্ভাস ও ভীরু প্রকৃতির। যতটা সোজা ভাষায় বললাম, ব্যাপার তার চাইতে অনেক গুরুতর; রোগ অনেক বেশী জটিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে পারবেন। একবার কলকাতা যাবার পথে বর্ধমান থেকে মামাকে টেলিগ্রাম করেছিলুম—"টেঁপির গলার হার খুলিয়া রাখিয়া দিবেন, চিঠি পরে যাইতেছে।" টেঁপি আমার মামাতো বোন। কারণটা আর কিছু নয়—বর্ধমান ইস্টিশানে ভিড়ের মধ্যে একটি মেয়ের কান ছিঁড়ে চোরে মাকড়ি নিয়ে গিয়েছিল। চোখের সম্মুখে এ জিনিস দেখে তখনই মামা-মামীকে সাবধান করে দেওয়া দরকার মনে হয়েছিল। এই মনে হওয়াটুকুর যা অপেক্ষা! তখন আর টেলিগ্রাম করবার তর সয় না। এমনই আমার স্বভাব: ঝোঁক যখন ওঠে, তখন আর কিছুতেই নিজেকে থামাতে পারি না,—যদিও নিজের আচরণের অসঙ্গতি আমার নজরে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে না হোক্, কিছুক্ষণ পরে নিজের অসঙ্গতি দেখে হাসবার মত রসজ্ঞানও আমার আছে। বন্ধু মহলে সুরসিক বলেই আমার খ্যাতি। আর দুর্নাম ভয়কাতুরে ও খামখেয়ালী ব'লে। তাঁরা কিন্তু নিন্দেটা বন্ধ রাখেন, ঘড়ি ধরে ঠিক ততক্ষণ, যতক্ষণ আমার ব্যাচেলারের সংসারের চা-ছত্র খোলা থাকে। এই চা করবার সদাব্রতের কাণ্ডারী আমার পুরনো চাকর কালাচাঁদ। পুরনো মোটর গাড়ীর মালিক ভাবে যে আমি খুব গাড়ি চালাচ্ছি, কিন্তু আসলে গাড়িই তাঁকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় নিজের খেয়াল-খুশি-মত। পুরনো চাকরও ঠিক তাই। আইনত কালাচাঁদের সঙ্গে আমার

প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ, কিন্তু কার্যত সেই আমার অভিভাবক, গৃহিণী ও বন্ধু।

সাধারণ লোকের মনে একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা আছে যে অবিবাহিত লোকেরা বিবাহিতদের চেয়ে বিপদ-আপদকে উপেক্ষা করতে পারে বেশী; আর সংসারের ব্যাপারগুলোকে বেশ একটা বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে পারে। ভুল। সে ধারণা একেবারে ভুল। আমার বদ্ধমূল ধারণা যে মানুষের মনের সব চেয়ে মৌলিক স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে ভয়—তাই মানুষ প্রথম পৃথিবীতে এসে ভয়ে কেঁদে ওঠে। এ জিনিস সদাশঙ্কাকুল আদিম মানুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। এই ভয়ের ভিত্তির ওপরই গড়ে তোলা মানুষের মনের অন্য সব ভাব—ঈর্ষা, ভালবাসা, রাগ, বিদ্বেষ, ভক্তি,—সব। অবিবাহিত লোকদের ভয় অন্যদের চেয়ে বেশী। নার্ভাস লোকরাই ব্যাচেলার হয়, না ব্যাচেলাররাই নার্ভাস হয় ঠিক জানি না। এ প্রশ্নের সমাধান বোধ হয় কোনও দিন হবে না। হাঁসের ডিম আগে, না হাঁস আগে? সেই রকমেই গোলমেলে সমস্যা। তবে একথা ঠিক যে অবিবাহিত লোকদের উদ্বেগ, আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা, এত হাতধরা যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও পড়তে পায় না। যত রকম সম্ভব ভয় হতে পারে, আমার আবার তার মধ্যে চোর-ডাকাতের ভয়ই সবচেয়ে বেশী।

সেবার পাড়ায় তখন খুব চুরির হিড়িক চলছে—প্রতি রাত্রে চার-পাঁচ বাড়িতে চুরি। আমার ছোট্ট সংসার। কি আর নেবে চোরে। সিঁধ কেটে কিছু না পেয়ে বোধ হয় গালাগালি দেবার জন্যে ডেকেই তুলবে। সব জিনিস ছেড়ে তখন আমার মধ্যের পৈতৃক আসল জিনিসটুকুকে নিয়েই টানাটানি। রাত দুপুরে ঘুম ভাঙতে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ একজন মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে কি যে করবো! কি করবো ভাল করেই জানি। কিন্তু কালাচাঁদ রেহাই দেবে কেন? সে প্রস্তাব

করলে, "আর কিছু না হোক্ বাবু, দু'খান মোটা বাঁশের লাঠি কিনে আনা যাক্। একখান আপনার ঘরে থাকবে, একখান আমার ঘরে।"

"আমার ঘরে?"

সে আমার কথার জবাব দেওয়া দরকার মনে করলো না। তাকে বারণ করা বৃথা। জানি যে সে তার অভ্যাসমত আগে জিনিস কিনে এনে তারপর অনুমতি চাইছে। আমার অনুমান ভুল হয়নি। লাঠিখান দেখেই বুক দুরদুর করে। দুর্গা শ্রীহরি! চোরই বরঞ্চ হাতের কাছে এ লাঠি পেলে······

"আচ্ছা কালাচাঁদ, দুজনে এক ঘরে শুলে হয় না?" মুখ ফুটে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটা করতেই হ'ল।

"বলেন কি বাবু! এত জিনিসপত্তর ওঘরে!"

"তা' হ'লে কেমন দু'খানি লাঠিই একই ঘরে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে রাখা যায়—কে জানে ক'জন চোর একসঙ্গে আসে!"

"অত জিনিসপত্তর কি কখনও ওঘর থেকে সরানো যায়! গতবার কলি ফেরানোর সময় একেবারে হিমশিম খাইয়ে দিয়েছিল।"

আরও কত ওজর-আপত্তি। বড় এক-বগ্‌গা কালাচাঁদ! তার আসল আপত্তি আমি জানি—যতবার রাতে ঘুম ভাঙবে ততবার লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়েই সিগারেট টানতে হবে তাকে। সেইজন্যই তার এত বাগবিস্তার। কে তোকে সমীহ করতে বলেছে, আমার সম্মুখে সিগারেট না খেয়ে! খাস্‌তো আমারই সিগারেট! কিন্তু তার সম্বন্ধে যা' মনে করা যায়, সে কথা কি বলা যায় পুরনো চাকরকে।

'যা ভাল বুঝলাম বললাম। করতে ইচ্ছা হয় কর্, না করতে ইচ্ছা হয় করিস্ না।" কালাচাঁদকে এর চেয়ে বেশী বলবার সাহস আমার নেই। বললাম ঘুরিয়ে, কিন্তু সোজা বারণ করলেও সে এখন আমার

কথায় কান দিত না। গম্ভীর বদনে কালাচাঁদ তার ঘর থেকে একখানি লাঠি এনে আমার বিছানার মাথার দিকে রেখে দিল। এরূপর আর কথা চলে না। নিজের চোরের ভয়ের কথাটা, পাঁচ মিনিটে একবারের বেশী চাকরের কাছে মুখফুটে স্বীকার করব, অতটা কাপুরুষ আমি নই। কালাচাঁদের চেয়েও গম্ভীরভাবে আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসি—আমার সমস্ত ইংরাজীর বিদ্যা খরচ করে 'খবরের কাগজের সম্পাদকের কাছে একখানি চিঠি লিখতে। নইলে এখানকার চৌর্যাপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে না। কালাচাঁদ ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে যাওয়ায় বোঝা গেল যে সন্ধ্যা হয়েছে। ও! তাহ'লে এই জন্যই চিঠি লিখতে লিখতে চোখ টন্‌টন্‌ করছিল। রাত আর ভয় অভেদাত্মা। তাই দিনের বেলার দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের ছদ্মবেশ ছেড়ে ভয় এখন আসর জাঁকিয়ে বসল। আতঙ্কের ঠেলায় কলমের ডগায় জোরালো ভাষা সবেমাত্র আসতে আরম্ভ করেছে, আবার বাধা পড়ল। দুজনের সংসারে, দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ছাড়া আর বাধা দেবে কে! দেখি, আমার দন্তমানিক বেছে বেছে শুধু কালো দাঁত কয়টি বার করে সম্মুখে হাজির।

"মামাবাবুর চাকর, এই চিঠি দিয়ে গেল। জরুরী।"

জরুরীই বটে। সরকারী পুলিশের উপর নির্ভর না করে, পাড়ার লোকে মিলে নিজেরাই রাতে পাড়া পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা উচিত—তারই জন্য মামা সকলকে ডেকেছেন, তাঁর বাড়িতে এখনই। তিনি দশের মাথা—অর্থাৎ বহু রকমের আজে-বাজে কাজকে বারোয়ারি করে নিতে তাঁর তৎপরতা প্রচুর! সাদা ভাষায়, অকারণে চটপট মিটিং ডাকতে তাঁর জুড়ি ভূভারতে নেই। যাক্‌! এতদিনে তবু একটা সত্যিকার কাজের মত কাজ হাতে নিয়েছেন। চোর-প্রতিরোধী মামার উপর মন বেশ গদগদ হয়ে উঠে।

আমাকে মাফলার আর ওভারকোট চড়াতে দেখে কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করে—"বাবুর ফিরতে দেরী হবে নাকি ?"

কালাচাঁদের উপর খানিক আগে থেকেই মনটা বিরূপ ছিল, লাঠির ব্যাপার নিয়ে। তাই যতদূর সম্ভব অল্প কথায় জবাব দিলাম—"হ্যাঁ। মিটিং। ওখানেই খেয়ে নেব।"

যত নাই দেবে তত সব মাথায় চড়ে বসে! কাল থেকে ওর উপর কড়া হ'তে হবে! আজকের রাতটা কাটতে দাও না! সব নিকেশ ওর কাছে দিয়ে তবে চৌকাঠের বার হতে হবে!......

মামার বাড়িতে একেবারে মিটিং বলে মিটিং। পালা করে রাত জাগার মধ্যে যে এত জটিলতা থাকতে পারে, তা আগে ধারণা ছিল না। স্বেচ্ছাসেবক পাহারাওলাদের লিস্ট তয়ের; ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত কোন্ ব্যাচ কোন্ রাস্তায় পাহারা দেবে; লাঠি যোগাড়; টর্চ সংগ্রহ; টর্চের ব্যাটারির জন্য চাঁদা তোলা; হেড-কোয়ার্টারে অর্থাৎ মামার বৈঠকখানায় চা, স্টোভ, ফরাস, কম্বল ও তাসের ব্যবস্থা; আরও কত কঠিন সমস্যার সমাধান করা হল সভার বৈঠকে। সব মিটিংই কোন না কোন সময় শেষ হতে বাধ্য। সেইজন্য এ মিটিংকেও শেষ হতে হ'ল। আমার উপর ধার্য চাঁদার উপরেও একখানি নতুন মোটা বাঁশের লাঠি আজ রাত্রেই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে দিতে রাজী হওয়ায় একেবারে হুররে হুররে পড়ে গেল, আমাকে নিয়ে।

তারপর মামার ওখানে খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ি ফিরতে বোধ হয় বেশ রাত হয়ে গিয়ে থাকবে। অন্ধকার রাত। কন্‌কনে হাওয়া দিচ্ছে! ফুলবাগান পেরিয়ে আমার বাড়ীতে ঢুকতে হয়। দেখলাম সদর দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া। তা' হ'লে বেরিয়েছেন কালাচাঁদবাবু! এইটুকু তর সইল না! এই চোর-ডাকাতের উপদ্রবের দিনেও বাড়ি খালি রেখে সিনেমা দেখতে না গেলে চলছিল না বাবুর!

বাজার করতে যাবার নাম ক'রে ম্যাটিনী শো দেখে এলেই তো পারিস। কালাচাঁদের উপর আমার নির্দেশ ছিল যে, আমি বাড়িতে না থাকার সময় তাকে যদি কোন কারণে বাইরে যেতে হয়, তা'হলে যেন দরজায় তালা দিয়ে চিঠির বাক্সর মধ্যে চাবিটা রেখে যায়। আমাদের দু'জন ছাড়া কেউ জানে না একথা। সদর দরজা খুলেই চমকে উঠলাম। দেখি—আমার ঘরের দরজা হাট করে খোলা। হঠাৎ ভয়ের ছেঁকা লাগল মনে! তবে তো নিশ্চয়ই চোর ঢুকেছে। তা'হলে কি হবে! বুঝলাম যে ঘর্মমিটার লাগাতে হয় কপালে—বগলে নয়। এগোবার সাহস নেই, পিছোতে ভুলে গিয়েছি—এমনি অবস্থা। নেমখারাম বিড়ালটা বারান্দার কোণে শীতে না ভয়ে কি জন্য যেন কুঁকড়ি-সুকড়ি মেরে পড়ে রয়েছে। চোরকে আঁচড়াতে কামড়াতে না হয় না পারলি—অতটা তোর কাছ থেকে আশা করি না—একবার না হয় ডাকই! নিষুতি রাতে আমার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য পাশের বাড়ির হুলোটার সঙ্গে যে নিত্যনৈমিত্তিক ঝগড়াটা করিস্, সেইটাই না হয় এখন একবার সেরে নে! বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়—ঘরের ভিতর ঢোকা তো নয়ই! ভাগ্যিস্ এ সময় ঘরের মধ্যে ছিলাম না! সাঁঝরাতে এসেছে—এগুলো কি আর চোর—এগুলো ডাকাত! এখন কোনও রকমে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। এতকাল থেকে শুনে এসেছি যে, কাপুরুষ সৈন্যের দল যুদ্ধক্ষেত্রে পেছু হটে। ভুল। ভয়ের মুখে পেছু হটাও চাড্ডিখানি কথা নয়। স্পষ্ট অনুভব করলাম যে, পায়ের হাঁটুর নিচের অংশটুকু নেই। তবু কি করে যে দরজার বাইরে এসে পৌঁছলাম মনে নেই; কাঠের পা পরা লোকের মত করেই হবে বোধ হয়। আঃ! অন্দর আর বাইরের মধ্যে কত তফাৎ। চৌকাঠ পেরনো মাত্র বুঝি যে, উঠনের মাটির চেয়ে এখানকার মাটি দিয়ে ভয়ের 'কারেন্ট' পাস করে কম। আর কিছু না পারি এখন ঊর্ধ্বশ্বাসে

ছুটে পালাবার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কিন্তু ভাবটা ফিরে এসেছে। এমনভাবে চোরের উপর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে যাওয়া দেখায় বড় খারাপ। উচিত চোরকে ভয় না পাওয়া, পাড়ায় খবর দেওয়া, চেঁচিয়ে লোক জড় করা, বামাল চোরকে পাকড়াও করা—পাড়াপাহারা কমিটির সন্থনিযুক্ত সেক্রেটারীর ভাগ্নের উচিত তো করা আরও কত কি। "কালাচাঁদ" বলে মিথ্যে ডেকে চোরটাকে পালানোর একটা সুযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলার স্বর আয়ত্তের মধ্যে থাকলে তো! মুখের ভিতরের সব রস তার আগেই ঘাম হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। শুকনো হর্লিক চুরি করে খেতে গিয়ে গলার যে অবস্থা হয়, ঠিক সেই দশা হয় বাড়িতে চোর এলে। একেবারে শুকনো বালি! কেশে শব্দ করতে গেলে কাশা যায় না; অথচ যদি নিঃশব্দে পালিয়ে যেতে চাও তাহলে অব্যর্থ বিষম লাগার মত কাশি আনবে। ফুলবাগানে সদর দরজার পাশে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছি, যাতে ভিতরের ঘরের দরজা দেখা যায়। আজকে জোছনা রাত হ'লে বেশ হতো। দরজার চৌকাঠের ফ্রেমে আঁটা বেশী অন্ধকারটুকুর উপর নজর ফোকাস্ করা। সেখানকার অন্ধকারটা যেন একটু কাঁপল। তবে কি…? আমার চোখই কাঁপছে নাকি ভয়ে? হাঁটু পর্যন্ত আবার অসাড় অসাড় লাগছে! এবারকারটা নির্ঘাৎ ঠাণ্ডায়। না, এ রকম ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তার চেয়ে এখান থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় খানিক পায়চারি করা যাক্। একটু পায়ে রক্ত চলাচল করবে। শীতের ভয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে যাচ্ছি এই স্তোকটুকু মনকে দেবার জন্য গলার মাফলারটিকে বেশ পাগড়ির মত করে মাথায় বাঁধি, ভিতরের গেঞ্জি ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। গা গরম করতে হ'লে একেবারে কুইক মার্চ করতে হবে রাস্তায়; আর সেই সময় ভয়ঙ্করভাবে ভেবে নিতে হবে সারা পরিস্থিতি। বাড়ির

বাইরে এলেই লজ্জাশীলতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই মেয়েমানুষদের ঘোমটার বহর বাড়ে; আর আমার মত পুরুষমানুষদের মনে হতে আরম্ভ হয় যে, লোকজন ডেকে যদি শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বাড়িতে চোর আদপে আসেইনি, তা'হলে বড় লজ্জায় পড়তে হবে। হয়ত চোর না-ও এসে থাকতে পারে, সেকথা এই প্রথম মনে হলো। পা চালিয়ে চলতে চলতে সবে এই প্রশ্নটি সিরিয়াসভাবে ভাবতে আরম্ভ করেছি—হঠাৎ বিশে ময়রার দোকানের সম্মুখের একটি ঘিয়েভাজা নেড়ীকুকুর আঁতকে ডেকে উঠল। গভীর চিন্তার সময় যে ব্যাঘাত ঘটায়, তা'র দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকানো আমার চিরকেলে অভ্যাস। কিন্তু বিপদ এল যে দিকে তাকাইনি সে দিক থেকে। একটা তেজালো কুকুর ছানার-জলের স্বাদের হদিশ পেয়ে পাশেই কাদামাটি চাটছিল, সেটা যেন ইলেকট্রিক শক্‌ খেয়ে ছিটকে এল আমার দিকে। তারপর আর একটা—আরও একটা—কোথায় ছিল এরা! এদের বন্ধুবান্ধবরাও দূর থেকে সাড়া দিচ্ছে—হয়ত আসছে! অথচ ছানার জল খাওয়া একটি কুকুরই মহাপ্রস্থানের পথের পক্ষে পর্যাপ্ত। ময়রার পো দোকানের ঝাঁপ একটু ফাঁক করে মজা দেখে নিলে। এত চেনাশোনা তোর সঙ্গে—একবার তু বলে ডাক না কেন কুকুরগুলোকে। প্রাণের দায়ে কুকুর থামাবার জন্য যে কথার মত আওয়াজটা মুখ থেকে বার হয়েছিল, তা পাড়ার লোক, কুকুর বা ভগবান, কারও কানে যায়নি। যাদের উদ্দেশ করে বলা, তারা শুনল না; কিন্তু শুনেছিল একটি লোক। হাতের প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠিখানা দিয়ে কুকুর তাড়াতে তাড়াতে সে এগিয়ে আসে।

"কে? বাবু!"

"কে? কালাচাঁদ!"

কালাচাঁদ কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়েই কথা আরম্ভ করলে। "রাতের বেলা পাড়ার লোক চিনতে পারিস্‌ না—তোরা রাতকানা নাকি

রে? তোদের আর দোষ কি—তোরা তো অবোধ পশু। আমিই আমার মালিককে চিনতে পারিনি। গলার স্বরটা পর্যন্ত বাবু আপনার বদলে গিয়েছিল। আমি দূর থেকে শুনে ভাবি যে, এত রাতে আবার চ্যানাচুরওলা এল কোত্থেকে। মাথার কম্ফর্ট্টি খুলে এবার গলায় জড়িয়ে নিন্ বাবু। হ্যাঁ! ব্যস্! আর কোনও শালা ডাকবে না। এখন কুকুরদের বাচ্ছা হওয়ার সময় কি না, তাই বাবুরা খেপে থাকেন অষ্ট প্রহর।” দেখলাম যে, কালাচাঁদের বাতলানো মাফলার নাবানোর অভিচার দোকানের বদ্রাগী কুকুরদের উপর খুব ফলপ্রসূ। কুকুররা বোধ হয় মাথাটা না দেখলে টেকো মানুষ চিনতে পারে না। মনের মধ্যে খচখচ করে—কালাচাঁদ এই ফাঁকে আমার মাথার টাকটা নিয়ে ঠাট্টা করে নিল না তো।

এইবার আরম্ভ হলো কালাচাঁদের সাফাই গাইবার চেষ্টা—“দেখলাম যে আপনার সিগারেট ফুরিয়েছে। তাই ভাবলাম যে, এক প্যাকেট কিনে এনে রাখি।”

বুঝি যে সে ভেবেছে আমি মামার বাড়ির মিটিং থেকেই এখন ফিরছি। মুহূর্তের মধ্যে ভয় কেটে গিয়ে আমার আত্মসম্মানজ্ঞান টন্টনে হয়ে ওঠে। আমি যে বাড়ি গিয়ে সেখান থেকে চোরের ভয়ে পালিয়ে এসেছি, এ কথাটা তার কাছে চেপে যাওয়াই মনস্থ করলাম। বাড়ি পৌছে সদর দরজার তালা খোলা দেখে কেমনভাবে কোন কথা ব'লে অবাক হয়ে যাব, তারই মনে মনে মহলা দিতে দিতে এগিয়ে চলেছি। একদিকে চোর আর একদিকে কুকুর—এই দুটোতে মগজ টইটম্বুর ভরা থাকা সত্ত্বেও মাফলার নামানোর পর থেকে মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাল্কা হাল্কা লাগছিল। তাই বোধ হয় হঠাৎ একটা তড়িৎচিন্তার ঝলক খেলে গেল—পজিটিভ থেকে নেগেটিভ—মগজের চোরের দিক থেকে কুকুরের দিকটায়। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেললাম বাড়ি

পাহারা দেবার জন্য একটা কুকুর পুষবার কথা। অবাক হয়ে গেলাম এ সংকল্প আগে কেন করিনি তাই ভেবে। কুকুরের গায়ে হাত দিতে আমার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে চিরকাল। জন্তু জানোয়ারের উপর এত ঘেন্না বলে কুকুর পুষবার কথা এর আগে আমার মনের কোণায় উঁকিঝুঁকি মারবার পর্যন্ত সুযোগ পায়নি। কুকুরের চিন্তায় বাড়ির চোরের কথা প্রায় ভুলে এসেছিলাম, হঠাৎ দেখি আমার ফুলবাগানের গেটের কাছে পৌঁছে গেছি। অমনি সিগারেট ধরাবার অছিলায় একটু পেছিয়ে গেলাম, যাতে কালাচাঁদের একার উপর দিয়েই চোরের সবচেয়ে কড়া ধকটা যায়। সদর দরজার কাছে গিয়েই সে চেঁচিয়ে বলে, "ও! বাবু বুঝি আগে একবার এসেছিলেন?"

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের আকস্মিকতায় বাবু অবাক হতে ভুলে গিয়ে ঢোঁক আর সিগারেটের ধোঁয়া গিলে অস্থির। কালাচাঁদ হচ্ছে ঘড়েল নম্বর ওয়ান; সে ধোঁয়া-গেলা-কাশির অর্থ বোঝে পরিষ্কার। বাবু মিছে কথা বললে সে ধরে ফেলবেই ফেলবে। একথা জানা থাকলেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"গিয়েছিলাম সিগারেট কিনতে।"

কালাচাঁদ এ বিষয় নিয়ে কিন্তু আর কথা বাড়ালো না। চোর নিশ্চয়ই এতক্ষণে পালিয়ে গিয়ে থাকবে। কালাচাঁদের পিছু পিছু আমিও বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকি। এতক্ষণে আমার সাহস বেড়ে গিয়েছে। ঘর খুলে রেখে যাবার জন্য তাকে বকব মনে করছি, সেই দিলে আমাকে বকে। "আপনি বাবু সদর দরজার চাবি রেখে গেলেন, আর ঘরের দরজার চাবিটা রেখে যেতে ভুলে গেলেন। বড় ভুল হয় বাবু, আপনার।"

পকেট টিপে দেখলাম যে, চাবিটা সত্যি আমারই সঙ্গে রয়েছে। "চাবি না থাকলে কি দরজার কপাট ভাল করে ভেজিয়ে দেওয়াও যায় না?"

"তা কি আর দিই নি বাবু। হাওয়া দেখছেন না? বিঁধছে।" কালাচাঁদের কথা শুনলে গা জ্বালা করে। বারান্দায় বিড়ালটা মিউ মিউ করতে করতে এসে তার পায়ে গা ঘষতে লাগল। এই ম্যাও ম্যাওটুকু আমি যখন প্রথম ঢুকেছিলাম বাড়িতে তখন করলে একটু মনে বল পেতাম। বাড়ির সবকটা হয়েছে সমান! পুষতে হয় তো কুকুর। আর অন্য কিছু না।

"কালাচাঁদ! আমি একটা কুকুর পুষবো ঠিক করেছি।" দড়াম করে কথাটা বলে ফেলে মনে বেশ একটু তৃপ্তি পেলাম! এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই! এই চুরির হিড়িকের মধ্যেও বাড়ি খালি রেখে সিনেমা না দেখলে চলছিল না!

আমার সঙ্কল্পের আকস্মিকতা দেখে কালাচাঁদ বোঝে যে, গতিক সুবিধার নয়। তখন অব্যর্থ নিশানায় কুকুর পোষার বিরুদ্ধে এক এক করে বাণ ছাড়তে আরম্ভ করে।

"বড় যা'তা' খায় বাবু কুকুরে।"

"পেট ভরে খাওয়ালে বাইরের জিনিস খাওয়ার জায়গা থাকবে কোথায় পেটে?"

"নর্দামা ঘেঁটে এসে বাবু রান্নাঘর শোবার ঘর একাক্কার করবে।"

"চেন দিয়ে বেঁধে রাখা যাবে।"

"কুকুরের গায়ে কি রকম পোকা হয় দেখেছেন তো বাবু?"

"পোকা মারবার ওষুধ দিলে থাকবে না।"

"বর্ষাকালে কুকুরের গায়ে বিশ্রী বোটকা গন্ধ হয়।"

"ও সাবান মাখালেই চলে যাবে। যত অসুবিধাই থাক, বাড়ির মধ্যে বদলোক ঢুকলে ডাকবে তো, না তাও ডাকবে না?"

কালাচাঁদ জানে যে, সাপের বদলে লতার মত চোরের বদলে বদলোক বলি আমি রাতে। "এই মরেছে! কুকুরে কখনও বদলোককে তাড়া

করে বাবু? আপনাকে এখনই তাড়া করেছিল বলে ভেবেছেন বুঝি কুকুরে খুব পাহারা দেয়? ও সব গপ্পো কথায় কান দেবেন না বাবু। রাতের বেলা কুকুর শুধু ডাকতে জানে পাহারাওয়ালাকে দেখে। আপনার গায়ে আলেস্টার, মাথায় পাগড়ি দেখে আপনাকে পাহারাওয়ালা ভেবেছিল; তাই না অমন দল বেঁধে ঘেউ ঘেউ করে এসেছিল।"

কালাচাঁদের এই শেষের অনুমানের সারবত্তা আমি অন্তর থেকে অনুভব করায় তাড়াতাড়ি মুখে কথা যোগাল না। এবারকার অমোঘ শরে কুশলী কালাচাঁদ আমার সঙ্কল্পকে প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়েছে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দোলানির পর আমার মন আবার তার ভারসাম্য ফিরে পেল। ব্যাস! যতই কারণ দেখাও আমার দৃঢ়সঙ্কল্পের নট্ নড়নচড়ন নট্ কিচ্ছু! চোর ভেবে তাড়া করা ঢের ভাল। অমন পলকা মন আমার কাছে পাবে না। যতদূর সম্ভব স্বর দৃঢ় করে, পরিষ্কার ভাষায় কালাচাঁদকে জানিয়ে দিলাম যে কুকুর আমি পুষবোই পুষবো।

"যা ভাল বোঝেন করুন বাবু!"

"তা তো করবই। কাল থেকেই পুষবো।"

এক ধমকে তাকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে মনে হতে লাগল, ঠিক যেমন টুলের উপর চড়ে বাবার চেয়ে বড় হয়ে ছোট ছেলেটার মনে হয়।

"জাগো হৈ!" হাঁক দিয়ে বাইরে এসে পৌছল, সখের পাহারাওয়ালার দল। কি ব্যাপার? লাঠিখানা নিতে এসেছে। কুকুর পুষবার ঝামেলায় এঁকথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। কালাচাঁদের সঙ্গে আড়ি মুলতবী রাখতে হ'ল; কেননা এদের চা খাওয়ানর দরকার একবার।

চায়ের পর্ব সেরে এদের বিদায় দিতে দিতে রাত একটা। আজ রাত্রে ঘুম আসবে না, তা আমি জানি। মাথার উপর গুরু দায়িত্ব— কুকুর বাছতে হবে। লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসি। বহু পুঁথিপত্র ঘেঁটে

সিরিয়াস-ভাবে ভাবতে হবে কোন্ কুকুর পুষবো। বসেই খেয়াল হ'ল আমার সিগারেট অনেকক্ষণ ফুরিয়ে গিয়েছে—অনেকক্ষণ খাওয়া হয়নি—বাড়ি ঢুকবার মুখে ফুলবাগানে সেই শেষ সিগারেট খেয়েছি। সেরেছে। আজ সারারাত যে অগুনতি সিগারেট পোড়াতে হবে। "ওরে ও কালাচাঁদ! শুলি নাকিরে বাবা?"

সে সবে নিজের ঘরে লেপের মধ্যে ঢুকেছিল। লাঠি নিয়ে দুড়দাম করে ছুটে এল—"শব্দ টব্দ পেলেন নাকি কিছুর? বদলোক-টোকের?"

এক ডাকে উঠে এসেছে বাবুর ভয় লেগেছে ভেবে। সাধে কি আর তাকে এত ভালবাসি।

"নারে শব্দটব্দ কিছু না। সিগারেটের প্যাকেটটা তো দিয়ে গেলি নারে।"

লজ্জিত হবার পাত্র কালাচাঁদ নয়। "মিছে বলিনি। তখন সিগারেট কিনতে গিয়েছিলাম তো ঠিকই। কিন্তু কেনা আর হয়ে উঠল কই। যেই না কিনতে গিয়েছি, অমনি শুনলাম কুকুরদের আর আপনার হাঁকডাক। আপনি আনেননি সিগারেট কিনে?" আমার চটবার রাস্তা মেরে দিলে। শয়তানটা ঘুরিয়ে বলে দিল—তুমিও মিথ্যাকথা বলেছ, আমিও মিথ্যা কথা বলেছি—পুরনো কাসুন্দি মিছে ঘেঁটে আর লাভ কি? কাজে কাজেই তার হাত ধরে বলতে হ'ল—"হ্যাঁরে কালাচাঁদ—বাবা আমার—এক প্যাকেট সিগারেট কি কোনও রকমে যোগাড় করতে পারিস না?"

"দেখি একবার চেষ্টা চরিত্তির করে। কুকুরের চেয়েও বেশী ঘুমোতে পারে এই দোকানদাররা।"

বাড়ি থেকে বার হবার আগে কালাচাঁদ তার নিজের বিড়ি একটা রেখে গেল আমার টেবিলে—"ততক্ষণ না হয় বাবু এইটা দিয়েই কাজ চালান। একটাই ছিল।" মুখ ফুটে 'না' বলতে পারলাম না।

আমার এখন মরবার ফুরসত নেই। কত বই ঘাঁটতে হবে! কোন পুরনো মাসিক পত্রিকায় কবে যেন পড়েছিলাম কুকুরের বিষয়ে ছবি দেওয়া প্রবন্ধ, ধারাবাহিকভাবে বার হয়েছিল। এনসাইক্লোপিডিয়ার মধ্যেও নানারকম কুকুরের ছবি একবার নজরে পড়েছিল। ইংরাজ কবি ব্লেকের বিভিন্ন কুকুরের গুণাগুণ দেওয়া বিখ্যাত কবিতাটি একবার ভাল করে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। গৃহপালিত পশু ও আদরের জানোয়ারদের উপরও খানকয়েক বই আছে আমার লাইব্রেরীতে। এ সব হবে কালাচাঁদ সিগারেট আনবার পর। ততক্ষণ বরঞ্চ নোট করে রাখা যাক, আমি কুকুরের কাছ থেকে কি কি আশা করি। পয়লা নম্বর হচ্ছে, যে জাতের কুকুর স্বভাবত শুধু তার মালিককেই চেনে এবং মানে, আমার কুকুর হবে সেই জাতের। দ্বিতীয়ত পাহারা দেবার কাজে হওয়া চাই অদ্বিতীয়। তৃতীয় পয়েণ্ট হচ্ছে যে ঘরে 'বদলোক' ঢুকলে বৃথা ডাক খরচ না করে একেবারে নিঃশব্দে তার উপর যেন লাফিয়ে পড়ে। চার নম্বরের পয়েণ্ট লিখলাম ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল হওয়া উচিত যাতে মাথায় পাগড়ি বাঁধা থাকলেও আসল লোকটিকে চিনতে পারে।…

সবে এতদূর মাত্র লিখেছি—বাইরে হট্টগোল শোনা গেল। কি আবার হ'ল? সখের পাহারার দ্বিতীয় ব্যাচ্ রোঁদে বার হয়েছিল; তারা কালাচাঁদকে ধরে নিয়ে এসেছে। তাকে মারধোর কিছু করেনি। সে নাকি পানের দোকানের ঝাঁপে টোকা মারছিল; জিজ্ঞাসা করতে ছুতো দেখায় যে বাবুর সিগাঁরেট কিনতে এসেছে। সেইটাই আমার কাছে যাচাই করতে এসেছে। হাসি-মস্করা করে তো তাদের বিদায় দিলাম; কিন্তু সিগারেট পাবার আশা সে রাত্রের মত ইতি। তখন রাত দুটো। সিগারেট আর লাঠি কিনবার ব্যাপারে আমার সেবক যতটা তৎপর, ভাগ্যিস ঘর ঝাঁট দেবার ব্যাপারে ঠিক তার উল্টো। সেইজন্য খাটের তলায় আর ঘরের কোণায় অনেকগুলো খাওয়া সিগারেটের গোড়া দেখা

গেল। কালাচাঁদ শুতে যাবার আগে, সেগুলোকে ঝাঁট দিয়ে একত্র করে আমার টেবিলের উপর রেখে গেল। যাবার সময় আশ্বাস দিয়ে যায় "ঘুমিয়ে পড়লে এতগুলোর দরকারও হবে না।"

আমি কাগজকলম নিয়ে পাঁচ নম্বর পয়েণ্ট লিখতে বসি—কুকুরের রঙ এমন হওয়া চাই যাতে অন্ধকার রাতে বদলোক তাকে দেখতে না পায়। তারপর ছয় নম্বর পয়েণ্ট—আমার চৌকির নীচের জায়গাটুকুর মধ্যে দাঁড়ানো বা শোয়া অবস্থায় কুকুরটি আঁটা চাই।

কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা আমি ভালবাসি। তাই আর এক তা ফুলস্কেপ কাগজে সব জাতের কুকুরের নাম লিখেনি। তারপর সারারাত চলে বই খোঁজা, দাগ দেওয়া, প্রত্যেকের স্বপক্ষে ও বিরুদ্ধে পয়েণ্ট নোট করা, আপেক্ষিক ভালমন্দ ওজন করা, বাছা, খারিজ করা। খারিজ করা কুকুরগুলোর নাম কাটছিলাম কপিং পেন্সিল দিয়ে। সিগারেট-দুর্ভিক্ষের মরসুমে ঠোঁট কতটা পুড়লো, তাই আয়নায় দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম যে, কপিং পেন্সিলের শিসের রসে আমার জিভ বেগুনী রঙের হয়ে গিয়েছে। কাগজে খাটের-নীচে-আঁটবে-নার দলে পড়েছে ম্যাস্‌টিফ, ব্লাডহাউণ্ড, গ্রেটডেন, আলসেসিয়ান, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, সেণ্ট বার্নার্ড। বদলোক দেখবার আগেই ডেকে উঠবে ফক্সটেরিয়ার, ব্যাসেট, স্কটিশ টেরিয়ার, স্প্যানিয়েল। পেকিনিজ, পুড্‌ল বা ককার স্প্যানিয়েল এত ছোট যে একটা জোয়ান বদলোককে সামলাতে পারবে না। আরও অগণিত কুকুরের নাম। সব খারিজের দলে—গোটা কাগজখানাই কপিং পেন্সিলের দাগে দাগে ভরা। এক শুধু কপিং পেন্সিল ছোঁয়ানো হয়নি বুলটেরিয়ার নামটিতে। একেবারে জলজ্বল করছে ঐ সাদা জায়গাটুকু—মুক্তকেশী বেগুনের ঝুড়ির মধ্যে একটা লম্বা সাদা বেগুনের মত। এইটাই আমার পছন্দ ; খামখেয়ালি বাছা নয়—দস্তুরমত যুক্তির ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকা, প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠি দিয়ে মাপা। কিন্তু জানোয়ারটা আমার

অষ্টপ্রহর সঙ্গী, ভৃত্য ও পাহারার কাজ করবে, তাকে বাছবার আগে আরও একবার ভাল করে যাচাই করে নেওয়া দরকার। আর একবার ওর দোষগুণের ফিরিস্তিটা বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যাক। সবচেয়ে গভীর চিন্তার সময় এসেছে এতক্ষণে ; কিন্তু সিগারেটের শিকড়গুলোও যে এদিকে খতম! এখন উপায়? কালাচাঁদের দেওয়া বিড়িটি এখনও টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। বিড়ির গন্ধ যে আমি জীবনে সহ্য করতে পারিনি। আজকের ব্যাদড়া রাতটা যে এখনও জিদ ধরে বসে রয়েছে কিছুতেই ফুরবে না বলে! প্রিয়ার প্রতীক্ষায় এক ঘণ্টা যে প্রিয়ার সঙ্গের এক ঘণ্টা থেকে ষাটগুণ বড়—একথা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। শেষ পর্যন্ত অগতির গতি কালাচাঁদের খাঁকি মার্কাটাই ধরাতে হলো। বাকি আধ ঘণ্টার মধ্যে আরও কত কি যে খোয়ার আছে কপালে কে জানে! তিরিক্ষি মেজাজে বইয়ের বুলটেরিয়ারের অধ্যায়টা খুলে বসি। প্রথমেই ফুটনোটের দিকে নজর পড়ল—"এই জাতের কুকুররা কানে অত্যন্ত কম শোনে। শতকরা প্রায় সাঁইত্রিশটি একেবারে বদ্ধ কালা হইয়াই জন্মায়।" তাই নাকি! ফুটনোটের ছোট ছোট লেখাগুলো ক্রমেই সাইজে বড় হয়ে সারা মন জুড়ে বসে। বাইরে সিঁধ কাটবার সময় শব্দ শুনতে পাবে না? এ কুকুর চলতে পারে না। নেভার! এ লেখাটুকুর উপর নজর না পড়লে কি কাণ্ডই হয়ে যেত! ভাগ্যে শেষকালে আর একবার দেখেছিলাম। সব বেগুনী হো যায়গা? বিড়ি খাওয়ার সময়ের লালামিশ্রিত জিভে কপিং পেন্সিল ঠেকিয়ে কাগজখানার সাদা অংশটুকু দৃঢ় হস্তে বেগুনী করে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে মনের থেকে বিলিতি কুকুরের রাজপাট মুছে গেল। ভাগ্যিস্ খাঁকি-ব্যাণ্ডের স্বদেশী ধোঁয়া কালাচাঁদের কল্যাণে লাগাতে পেরেছিলাম বুদ্ধির গোড়ায়!

"কালাচাঁদ! ও কালাচাঁদ! আজ কি উঠতে হবে না নাকি?"

"ফরসা হবে, তবে তো দোকান খুলবে বাবু।"

"কে তোকে দোকানের কথা বলছে! আগে কথাটা শুনেই নে; তারপর জবাব দিস্। আমার জন্য একটা কুকুরছানা এনে দিতে পারিস? একেবারে দেশী?"

"এখনই নাকি?"

অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। "না, আধ ঘণ্টা পরে হলেও চলবে!" রাস্কাল কালাচাঁদটার ঘরের থেকে নতুন ধরানো সিগারেটের গন্ধ এসে লাগল নাকে। রাজকন্যার যোগ্য স্বামী খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে রাজা যেমন এক সময় ঠিক করেছিলেন, 'আজ সকালে যার মুখ প্রথমে দেখব, তারই সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবো'—আমারও তখন সেই অবস্থা। তবে ভোরে উঠে কালাচাঁদ যখন কুকুরের খোঁজে বেরুবে, তখন তাকে বলে দিতে হবে ময়রার দোকানের ছানার জল-খাওয়া কুকুরটার বাচ্চা আনতে পারলেই সবচেয়ে ভাল।

ওহো! ভুল হয়ে গিয়েছে! আমার চাহিদার ফিরিস্তির মধ্যে সপ্তম পয়েণ্ট লিখে দিলাম—কুকুর কানে কম শুনিলে চলিবে না।

নূতন নূতন জ্ঞানের ঠাস বুননে ভরা রাত্রিটি কোনও রকম শেষ হতেই কালাচাঁদ আমার উদ্বেগ দূর করলে একটা জলজ্যান্ত কুকুরছানা এনে। খাঁকি খাঁকি রং, পোড়া কালো মুখ, খাড়া কান, গুটনো লেজ— একেবারে নির্ভেজাল পেডিগ্রি খেঁকিকুকুর। রাত কাটার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম কুকুর জাতটার উপর ঔদাসীন্য কালাচাঁদেরও কেটে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞের মত কুকুরের একটা কান ধরে শূন্যে বার কয়েক দোলা দিয়ে বলল, "কি রকম তেজ দেখছেন? একটুও কাঁই কাঁই করছে না।"

"অমনি করে কুকুরের তেজ পরীক্ষা করতে হয় বুঝি? কিন্তু ওই যে, কুঁই কুঁই করছে যে!"

"কান আছে বাবুর ; ঠিক ধরেছেন। ওটা হচ্ছে কুঁই কুঁই—আরামের। ব্যথা লাগলে পরে কুকুর করে কাঁই কাঁই—সে একেবারে পরিত্রাহি চীৎকার।"

খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। কালাচাঁদ বোঝালো যে, সে পোড়া মুখ ইচ্ছা করে বেছেছে, চোর-ডাকাতদের বেশী ভয় খাওয়ানর জন্য। ঠিক তার কাকার কুকুরটার মত করে এই কুকুরটাকে তয়ের করবে। এ জাতকে যা শেখাবে তাই শেখে। কি ভাল পাহারা দেনেবালা কুকুর তার কাকার! পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে কাকা কলকাতা যাচ্ছে চাকরীর খোঁজে ; কিছুতেই যেতে দেবে না কুকুরে। একেবারে তাড়া করে যায় ঘেউ ঘেউ করে। পুঁটলিটি রাখ, তবে যাও। তাই করতে হ'ল শেষকালে কাকাকে। এক কাপড়ে যেতে হ'ল বাড়ি ছেড়ে।

"না না কালাচাঁদ, আমি যে চাই আমার স্যুটকেসের চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসুক আমার কুকুর।"

এইবার কালাচাঁদ সামলে নিল ভুল বুঝতে পেরে। "যেমন শেখাবেন তেমনি শিখবে বাবু। তবে একটা কথা—নামটা রাখতে হবে ভাল। যেমন নাম রাখবেন, তেমনি কুকুর হবে। আমার কাকা রেখেছিল সাহেবী নাম ; তাই খানা পেতে দেরী হলে সাহেবের রাগের মত ঘর্-র্-র্ ক'রে আওয়াজ বার করত গলা থেকে।......"

সত্যিই কালাচাঁদ আমায় ভাবিয়ে তুললে। কি নাম রাখি ঠিক করতে পারি না। টমি জিমি তো নয়ই। রাস্তা থেকে আনা কুকুরের নাম স্যাটান বা টাইগার রাখলে খাপ খাবে না। বাঘা, ভুলু বস্তাপচা হয়ে গিয়েছে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম—'পাহারা'। ভারি ব্যঞ্জনা-পূর্ণ নাম—অথচ কি সহজ কথাটা। প্রথম ভাগ পড়া ছেলেও এর বানানে ভুল করবে না। আকারান্ত নামগুলো যেমন দরাজ গলায় প্রাণখুলে চীৎকার করে ডাকা যায়, তেমন আর কোনও কথা

নয়। 'পাহারা' শব্দটিতে আকার একটা-দুটো নয়—একেবারে তিন তিনটে। ক্রমেই স্বর চড়বে মা-পা-ধা-র মত।

এই গেল আমার বাড়িতে কুকুর আনবার কাহিনী। দু'জনের সংসারে আর একটি প্রাণী এসে ঢুকলে খানিকটা বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু যা ঘটল তা একেবারে তছনছ কাণ্ড—বিশেষ করে আমার মনের দিক দিয়ে।

কুকুরছানা পোষা যে কি মারাত্মক ব্যাপার, তা যিনি পুষেছেন তিনিই জানেন। হেন কাজ নেই, যা করতে হয় না। এতকাল অবাক হতাম লোকে একদিন প্রতিজ্ঞা ক'রে সিগারেট ছেড়ে দেয় কি করে? একদিনে ঘেন্না ভুলে গেলাম কি করে তা ভেবে অবাক হবার পর্যন্ত আমার সময় নেই তখন। অষ্ট প্রহর ডিউটি—কুকুরসেবার। আর তার জন্য দুশ্চিন্তারও। রাত্রিতে পর্যন্ত। এতকাল ভয় আর দুশ্চিন্তার ডিপার্টমেণ্ট ভাগ করা ছিল; দুশ্চিন্তার দপ্তর খুলত দিনে আর ভয়েরটা খুলতো রাতে। কুকুর আনবার দিন থেকে রাত্রে ভয় পাবার পর্যন্ত ছুটি নেই! খাটের তলায় কাঠের প্যাকিং বাক্সে পাহারার শোবার জায়গা। শীতে সারারাত কুঁই কুঁই করে অথচ গায়ে কম্বল রাখবে না। এইরকম কুকুরছানার আবহাওয়ায় ঘরের মধ্যে ভয় ঢুকতে পারে না। কুকুরের উপর আট পাট করে কম্বল চাপা দেবার ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্নরাজ্য চোখের সম্মুখে খুলে যায়;—আমার "পাহারা" Master's dog হয়ে উঠেছে—আমাকে ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় লোককে জানে না—আমি যা বলব তাই, উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। বদলোক দেখামাত্র তার গলার টুঁটি কামড়ে ধরছে; বাছুরের মত বড় হয়ে উঠেছে; বাড়ি পাহারা দিচ্ছে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে; থাবাগুলো ফেলছে একেবারে ঠিক বাঘের মত; কার সাধ্যি তার কাছে যায়? কিন্তু আমাকে দেখামাত্র এসে আমার পা চাটতে লাগল।...

এ সব ভাবতেও আনন্দ। সত্যিই ঠিক তেমনি করে আমি পাহারাকে ট্রেনিং দিয়ে তয়ের করাবো! দেখিয়ে দেব পৃথিবী সুদ্ধ লোককে যে বৃথাই তারা বিলিতী কুকুর, বিলিতী কুকুর করে মরে। বিলিতী কুকুরকে যে রকম খাওয়াও-দাওয়াও, ধোয়াও-পোঁছাও, যত্ন কর, সে রকম কখনও করে দেখেছ দিশী কুকুরকে? শুধু শুধু এদের খেঁকি-কুকুর বলে দুর্নাম দিয়ে দিলেই তো হবে না! মহাবীরের সময়ে এই রাঢ় দেশের খেঁকিকুকুরগুলো যে কি চিজ ছিল, তা জানতে হ'লে জৈনদের ধর্মগ্রন্থ এক আধখান দেখে নিও! তারপরে বলতে এস। আচ্ছা অতদূর না হয় নাই বা গেলে! কসাইখানার কুকুর, শ্মশানঘাটের কুকুর, সাঁওতালদের কুকুর, কিংবা ময়রার দোকানের ছানার-জল খাওয়া কুকুর—শুধু একবার এদের কাছ দিয়ে চলে যাও দিকি!...

আঃ! আবার কম্বলখানা ফেলে দিল বুঝি! যে রকম কুঁই কুঁই শব্দ করছে ভয় হয় এ কুকুর কোনও দিন ডাকবে তো? মাস দুয়েক বয়স হবে নিশ্চয়ই—এখন আর এমন বাচ্চা নয় যে, এক আধবারও ঘেউ ঘেউ গোছের শব্দ করে ডাকতে পারবে না। বোবাটোবা হবে না তো? বাকি রাতটুকু এই দুশ্চিন্তাতে কাটল।

ভোর হতেই ছুটলাম ময়রার দোকানে। পাহারার মা-টাকে চিনি—পরশু রাতে বিলক্ষণ চিনেছি; কিন্তু বাবাটাকে তো চিনি না! মা বোবা নাই বা হলো; কিন্তু বাবা তো বোবা হতে পারে! বাবার দোষ যদি পাহারা পায়! তাহলে মায়া বসবার আগেই বিদায় করে দেওয়া ভাল। আমার কুকুর, না ডেকে চোরকে কামড়ে দিক্‌, তা আমি চাই; কিন্তু তাই বলে একদম ডাকতে পারবে না—সে আবার কেমনধারা কথা। না না, সে চলবে না। বিশু ময়রাকে আমার কুকুরের বাবার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে প্রথমে বুঝতেই পারল না।

"বাবা? কুকুরের?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কুকুরের কি বাবা হয় না?"

ময়রার পো অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাল করে দেখল। কি বুঝলো সেই জানে। তারপর বেশ মোলায়েম স্বরেই আমাকে বুঝিয়ে দিল যে কুকুরের বাপের সন্ধান রাখবার ঔৎসুক্য বা সময় তার নেই। শেষকালে গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কিছু খেয়েটেয়ে এসেছেন না কি?"

"না না, কিছুর দরকার নেই। দোকানের খাবার আমার সহ্য হয় না?"

সেখান থেকে ব্যর্থ মনে ফিরে এসে, নিজের সন্দেহের কথা কালাচাঁদের কাছে প্রকাশ করি। কালাচাঁদ জোর গলায় ভরসা দিল— "কুকুরে কখনও বোবা হয় না বাবু। এটা এখনও একটু কমজোর আছে। আর একটু তেজ বাড়তে দিন না। দেখবেন পাড়া কাঁপাবে ডেকে।"

আমার মনের তখন বদ্ধমূল ধারণা যে, কুকুরের তেজ বাড়াতে হ'লে ছানার জল খাওয়ানো উচিত। আমার হুকুমে তখনই কালাচাঁদ চার পয়সার ছানার জল নিয়ে এল বিশু ময়রার দোকান থেকে। তাড়াতাড়ি পাহারার জন্য কেনা নতুন এনামেলের থালাখানা আনতে গেলাম ঘরে। এসে দেখি কালাচাঁদ এরই মধ্যে ছানার জলটুকু উঠনে ঢেলে দিয়েছে, আর পাহারা একটু একটু করে চাটছে। দেখেই মেজাজ বিগড়ে গেল।

"মাটিতে দিলি? কত কি রোগভোগ হতে পারে। এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই!"

"কাল দিয়ে দেখেছি। জল থালা থেকে খায় না; ড্রেনের জল খাওয়া অভ্যাস কিনা। তবে আর একটা কথাও বলি বাবু—ছানার জল মাটি থেকে খাওয়াই ভাল। তাতে কুকুরের তেজ বাড়ে। দেখেননি এর মাটাকে?"

এমন বিচক্ষণ ডাক্তারের মত কথাগুলো বলে, যে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেব কিনা ঠিক করতে পারি না। এ ব্যাপারের এইখানেই শেষ

নয়। ভুরুপের তাস ছাড়লে কালাচাঁদ ঘণ্টাখানেক পর। আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দোখয়ে দিল যে, উনন নেপার গোবরমাটি পাহারা বেশ আরাম করে বসে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। সে হেসেই আকুল। কুকুরকে অমন গোগ্রাসে মাটি খেতে দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। তখনই ছুটলাম ভেটারিনারি সার্জেনের কাছে। তিনি বললেন যে, ক্রমি হ'লে কুকুরে মাটি খায়। তাঁর প্রেসক্রপশন অনুযায়ী দু' আউন্স ওষুধ নিয়ে এলাম। কালাচাঁদ বাজারে গিয়েছে, ঠিকে ঝি শশী বাসন মাজছে। আমি গেলাম ওষুধ খাওয়াতে। কুকুরকে জোলাপের ওষুধ খাওয়ানো যে এমন কঠিন ব্যাপার, আগে জানা ছিল না। একার কম্ম নয়। চিৎ করে ফেলে, হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে, হাঁ করানর চেষ্টা করতেই, শশী পোড়াবাসন ফেলে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

"কি করেছে বাবু কুকুরে ?"

"কিছু না। জোলাপ।"

"জোলাপ ?"

"একটু কুকুরটাকে হাঁ করিয়ে উপকার করতে পারেন না, এসেছেন ফেচ্ ফেচ্ করতে।"

কি যেন একটা বলে, সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। মিনিট পাঁচেক পরেই দেখি আমার মামীকে ডেকে এনেছে তাঁদের বাড়ি থেকে। শশী তাঁকে কি বলেছিল জানি না, তিনি আমাকে মহিষাসুরের 'পশ্চারে' দেখবার জন্য তৈরী ছিলেন না। তিনি আসতেই আমি কুকুরটাকে ছেড়ে দিই। সেটা আমার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কয়লাগাদার পিছনে গিয়ে লুকায়।

মেয়েমানুষের যতটুকু বুঝবার দেখামাত্র বুঝে যায়। তবুও মামী ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—"দেখিস, তোর আবার যেন ভরতমুনির দশা না হয়।"

ওষুধ আনবার সময়ই ঘোড়ার ডাক্তারের সঙ্গে যেচে বন্ধুত্ব পাতিয়ে এসেছিলাম, পাহারাকে 'মনিবের কুকুর' তয়ের করবার কাজে যখন তখন তাঁর সলা পরামর্শ পাবার লোভে। তিনি অতি সদাশয় লোক। কুকুর পোষবার শাস্ত্রের নির্যাস একটি সারগর্ভ বাক্যে আমাকে বলে দিয়েছিলেন, "এর জন্য মশাই আপনাকে dog minded অর্থাৎ কুকুর-পাগল হতে হবে। সেই যে কে যেন বলেছিলেন না—ইংরিজী শিখতে হ'লে ইংরিজীতে শোও, বসো, কথা বল, স্বপ্ন দেখ, নিশ্বাস নাও, তবে না ইংরিজী শিখবে—এও সেই রকম।"

তাঁর কথাগুলো আমার বেশ মনে ধরেছিল। কোনও কাজে আমার ফাঁকি নেই। 'কেনেল ক্লাবের' সদস্যতার নিয়মাবলী আনতে দিলাম। কুকুরের সম্বন্ধে বইয়ের অর্ডার গেল প্রচুর। শহরের মধ্যে যাদের কুকুর পোষার বাতিক তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার চেষ্টা করি। তাঁদের সঙ্গে গল্প করে আনন্দ পাই, অযাচিত উপদেশে কৃতার্থ হয়ে যাই। কোনও দু'জনের অভিজ্ঞতা একরকম নয়। কুকুরকে মাছ খাওয়ানো চলে কিনা সে বিষয়ে ভোট 'হাঁ-না' উভয় পক্ষেই সমান। প্রত্যহ স্নান করানো উচিত কিনা সে বিষয়েও ঘোর মতভেদ। এইরকম প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেকের অভিমত ভিন্ন ভিন্ন। মাঝ থেকে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। তবু তাঁদের সঙ্গে দেখা হ'লে নমস্কার করেই জিজ্ঞাসা করি 'কুকুব কেমন আছে'। আপনা থেকে এসে যায় এ কথা। সত্যিই কয়েকদিনের মধ্যে মনে হ'তে আরম্ভ হয় যে, পৃথিবীতে কেবল দু'রকমের লোক থাকে; একদল কুকুর ভালবাসে, আর একদল বাসে না। বিস্কুট বললেই মনে হয় প্রথমে ডগবিস্কুট। সাবানের কোম্পানীর বিজ্ঞাপন দেখলে প্রথমেই খুঁজি যে, তাদের 'ডগ্ সোপ' আছে কি না। বিলিতী কুকুর কিনবার আমার এখন কোনও সম্ভাবনা নেই জেনেও কুকুর বিক্রির বিজ্ঞাপনগুলো পড়বার জন্য একখানি সাহেবী দৈনিক

কাগজ নিতে আরম্ভ করি। কুকুর ছাড়া অন্য গল্পে আমার উৎসাহের অভাব দেখে কর্জ খাওয়া বন্ধুরা পর্যন্ত পাশ কাটাতে আরম্ভ করে। নেহাৎ সামনে পড়ে গেলে জিজ্ঞাসা করে পাহারার আধুনিকতম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ। আমার এইসব আচরণের সম্মিলিত যোগফলের নামই বোধ হয় ঘোড়ার ডাক্তার বর্ণিত 'কুকুর-পাগলা' হওয়া। আসল পাগলামির সঙ্গে এ পাগলামির কোনও তফাত নেই ; শুধু আসল পাগলকে ঠাট্টা করলে সে কখনই বোঝে না, কিন্তু কুকুরপাগলকে ঠাট্টা করলে সে বুঝতে পারে কখনও কখনও। এই যেমন আমি বুঝলাম যখন মামার মত গুরুজন ব্যক্তিও পাহারার চেহারা দেখে বলে গেলেন, "তোর কুকুরের কানদুটো ফক্সটেরিয়ারের মত খাড়া, আর গায়ের রোঁয়া গ্রেহাউণ্ডের মত চামড়া ঘেঁষা।" এসব বিদ্রূপ গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে গত কয়দিনে। ঠাট্টা করে না এক কেবল কালাচাঁদ। কুকুরের গল্পের এমন দরদী শ্রোতা আর কেউ নেই। 'পাহারা' সম্বন্ধে আমার নূতন নূতন কৌতূহল ও আশঙ্কা জাগে কমপক্ষে ঘণ্টায় একবার করে। প্রতিবার কালাচাঁদের কাছে প্রকাশ করা মাত্র সে আমার নতুন উদ্বেগের অংশীদার হয়ে যায়। সে সম্বন্ধে নিজে যা ভাল মনে করে তা সে করবেই করবে। মজা হচ্ছে যে, করবার পর এমন অকাট্য যুক্তি দেখাবে যে, তার উপর আর কোনও কথা চলে না।

একদিন বেরিয়ে ফিরবার সময় দেখলাম কালাচাঁদ বিশু ময়রার দোকানে আড্ডা মারছে···সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে পাহারাকে। যদি ময়রার দোকানের খেঁকি কুকুরগুলোর সঙ্গেই মিশবে, তবে এত সাবান, স্নান, ধোয়ানো, পোঁছানো কিসের জন্যে? অন্য কুকুরের গা থেকে এঁটুলি আর পোকা নিয়ে আসবে। বকুনি খাবার সময় চুপ করে শুনল কালাচাঁদ। শেষ হ'লে বললে—"নিয়ে এলাম মায়ের কাছে ; তাড়াতাড়ি ডাক-টাক শিখিয়ে দেবে বলে।"

"সে রকম দরকার বুঝলে, আমি নিজেই নিয়ে যেতে পারি!"

"শিকল বাঁধা খেঁকি কুকুর রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়াও যা, গরুর গলায় দড়ি বেঁধে হট্‌টো হট্‌টো করে নিয়ে যাওয়াও তাই। সে কি আর বাবু আপনারা পারেন!"

কালাচাঁদের সাতখুন মাপ; কিন্তু তবু একটু মাত্রাধিক্য হয়ে গেল না কি? তবে ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিক। মনে হতে লাগল যে, কালাচাঁদ যদি অন্ততপক্ষে আমার কুকুরের ব্যাপারে সর্দারি না করত তাহ'লে বড় ভাল হ'ত। ও কুকুর পোষার কতটুকু বা জানে। কবে ওর কাকা কুকুর পুষেছিল, তারই গল্পের ঠেলায় অস্থির! কে ওকে বুঝোতে যাবে যে, শুধু খাইয়ে দাইয়ে কুকুর পোষা এক জিনিস, আর 'মনিবের কুকুর' তয়ের করা অন্য জিনিস। দুটোতে আকাশ-পাতাল তফাত। এর জন্য দরকার চব্বিশ ঘণ্টা কুকুরের উপর লক্ষ্য রাখা। একবার বিগড়লে কি আর কখনও মনিবের বশ মানবে! তবে এখন পর্যন্ত কুকুরটা খারাপ হয়নি, এই যা! বাচ্চা কি না! যত দেখছি ততই পাহারাকে ভাল লাগছে। একতাল চঞ্চলতার বোঝা। পোকা উড়তে দেখলে পেছু পেছু ছোটে। পিঁপড়ে নজরে পড়লে শুধু শুঁকতে হবে, না থাবা দিয়ে একবার নাড়ানাড়িও করে দিতে হবে ঠিক করতে পারে না। ব্যাং দেখলে ঠিক গ্রামোফোন রেকর্ডের কুকুরের মত অবাক হয়ে দেখে। ইটের টুক্‌রো শুঁকে দেখে, কাঠের টুকরো হাড়ের মত করে চিবিয়ে দেখে, ন্যাকড়া দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখে, জুতোর চামড়া চেটে দেখে। নিজের অভিজ্ঞতায় তাকে সব জিনিস শিখতে হবে। মায়ের কাছে থাকলে এসব জিনিস মা-ই শিখিয়ে দিত। সে সুযোগ আমি দিলাম কই? শিয়ালের ডাক শুনলে অজানা আকাশভরা বিস্ময় চোখে নিয়ে কান দুটোকে খাড়া করে; এখনও এ ডাককে ভয় করতে

শেখেনি। অথচ আমাকে ভয় করে। মনিব বলে এরই মধ্যে আমাকে চিনে গেল নাকি? রাতে শীতে কাঁই কাঁই করলে, যতবার তার উপর কম্বল চাপা দিতে যাই, ততবার দেখি আমার ভয়ে কুঁকড়ি সুঁকড়ি মেরে একেবারে প্যাকিং বাক্সের কোণার সঙ্গে মিশে যেতে চায়! দূর বোকা কোথাকার! এত ভয় কিসের রে? ভারি মজা লাগে দেখতে। আঙুলের ডগায় অনুভব করি তার নরম লোমের নীচে ভয়ের শিহরণ। আদর করছি রে, আদর করছি।

জন্তু-জানোয়ারের মন নিয়ে এর আগে কখনও মাথা ঘামাইনি। এখন এতে রস পেতে আরম্ভ করি। অবিকল মানুষের মত! যত পাহারাকে দেখি অবাক হয়ে যাই। খানিকটা ছুটোছুটি করে বসে হাঁফাতে লাগল; হাই উঠল দুটো; ঢুলছে, মধ্যে মধ্যে চোখ খুলে সজাগ হয়ে বসবার চেষ্টা করছে, রাতে পড়তে বসে ছেলেপিলেরা যেরকম করে; বৃথা চেষ্টা; বেশ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল; অঘোরে ঘুমচ্ছে কেমন সুন্দর; নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পাঁজরার হাড়ের দুটো খাঁজ একবার করে বেরিয়ে আসছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। একেবারে হুবহু মানুষের মত। বড় অসহায় লাগে ঘুমন্ত পাহারাকে। এতক্ষণকার এত চঞ্চলতার ঢেউগুলোকে তাল পাকিয়ে কুণ্ডলী করে কে যেন রেখে দিয়েছে প্যাকিং বাক্সের কোণায়। অদ্ভুত! এক দৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি—আর ভাবি—আর দেখি!...

কালাচাঁদ বুঝে গিয়েছে যে, তার বাবু পাহারার প্রশংসা শুনলে খুশী হন। সেইজন্য সুযোগ-সুবিধা পেলেই কুকুরের কৃতিত্বের নূতন নূতন খবর আমার কাছে দিয়ে যায়। আমার সময় সময় সন্দেহ হয়, সে বোধ হয় মিছে কথা বলছে, আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প জমাবার উদ্দেশ্যে। কারণ অধিকাংশ বিষয়েই পাহারা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় আমার বাড়ি থেকে অনুপস্থিতির সময়ে। কি দরকার কতকগুলো মিথ্যা

গল্প বানিয়ে আমার কাছে বলবার? আর আমারই কুকুরের সম্বন্ধে।

একদিন থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম। আমি বাড়ি ঢুকতেই কালাচাঁদ সেদিন খবর দিল যে, পাহারা খুব ডেকেছে। সে কি ডাক! একেবারে প্রায় সোমথ কুকুরের মত—ভুক ভুক করে। পূবের পাঁচিলের উপরে কাঠবেরালি দেখে।

আমি কালাচাঁদের কথায় আমল না দিয়ে বলি—"ও যত কেরামতি দেখায় আমি বাইরে গেলে?" আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম না দেখে কালাচাঁদ বলল, "চাকর-বাকররা নিজেদের মধ্যে যেমন প্রাণখুলে কথা বলে, তেমনটি কি আর পারে মনিবের সুমুখে? আমিও মনিবের নুন খাই, পাহারাও মনিবের নুন খায়। আমার কাছে ও যা যা করে, তা কি পারে আপনার সমুখে করতে? মিছে বলিনি আমি বাবু।"

দেখলাম আমার কথায় কালাচাঁদ দুঃখিত হয়েছে। হলে আর করছি কি। স্পষ্ট কথা এক-আধদিন শুনিয়ে দেওয়াই ভাল মাঝে মাঝে। পাহারাকে সে চাকরবাকরের দলে ফেলল কি করে, ভেবে পাই না। কিন্তু সেই দিনই বিকালবেলায় দেখি অবাক কাণ্ড। কালাচাঁদ গিয়েছে বাজারে। আমি ঘরের মধ্যে। উঠনে দু'বার বাচ্চা কুকুরের ডাক শুনেই বেরিয়ে আসি। সত্যিই অভাবনীয়। পাহারাই ডাকছে একটা বেড়াল দেখে। গোনা দু'বার। তা হোক, কিন্তু ডেকেছে ঠিকই। আমাকে দেখে বেড়ালটাও পালাল, আর পাহারাও গুটি গুটি স'রে পড়ল কয়লা-গাদার দিকে। না, তাহলে তো কালাচাঁদ মিথ্যে বলেনি। সত্যিই আমার সম্মুখে তাহলে পাহারার ইচ্ছামত কাজ করতে বাধো বাধো ঠেকে। মনে মনে একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কালাচাঁদ মিথ্যাবাদী হ'লেই ছিল ভাল। পাহারা

বোধ হয় মুহূর্তের জন্ত ভুলে গিয়েছিল যে আমি ঘরের মধ্যে আছি। সেই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির একবার বাজারে গেলে আর ফিরবার নাম নেই? সত্যি কথা বলেছেন তো আমার মাথা কিনেছেন!...

হয়ত আপনারা লক্ষ্য করেননি যে, আমার কথায় আর সেই আগেকার হাল্কা স্থর নেই। কবে থেকে যে আমার মনের ভাব একটু একটু করে গম্ভীর ধরণের হয়ে উঠছে তা আমার নিজেরই খেয়াল হয়নি এতদিন। লক্ষ্য করলাম, প্রথম ঐ পাহারার ডাক শুনবার দিনে; তাও অস্পষ্টভাবে। এ কেবল একটা ঝোঁক বা খেয়াল বদলাবার ব্যাপার নয়—ও সব জিনিস আমার জীবনে এর আগে বহুবার ঘটেছে। এ হচ্ছে আমার মনের গঠনের মৌলিক পরিবর্তন। পরিবেশকে এক মুহূর্তের জন্তও আর হাল্কা নজরে দেখতে পারি না।

আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'লেই পাহারা একটু আড়ষ্ট গোছের হয়ে যায়। তাই ঘরে বসে আধ ভেজানো দরজার মধ্যে দিয়ে, উঠনে তার খেলা দেখি। শরীরের রেখাগুলো এত সজীব। দৌড়নোর সময় টানা তারের দৃঢ় ঋজুতা সেগুলোর মধ্যে। ঘুমনোর সময় সেগুলো শিথিল হ'লেও এলোমেলো নয়। এর ছন্দ ধরা পড়ে যে দেখতে জানে তার চোখে। এ সময় কালাচাঁদ বাড়ির বাইরে থাকলে ঘুমন্ত পাহারার কাছে গিয়ে ভাল করে দেখি। পা টিপে টিপে যাই, পাছে আবার তার ঘুম ভেঙে যায়। এ কুকুরের কান ভাল যে; বুলটেরিয়ারের মত কালা নয়। জেগে আমাকে দেখলেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাবে। আগেকার রোঁয়া ঝরে নতুন লোম বার হচ্ছে এর গায়ে। কি চকচকে! তার লেজের উপরের কালো রেখাটি আমি ছাড়া আর কেউ লক্ষ্য করেনি; বোধ হয় কালাচাঁদও না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কান নাড়ছে—ছোট ছেলের দেয়ালা করবার মত। মাছিটা বড় জালাতন করছে ওকে।...

বাগানের গেট বন্ধ করবার শব্দ হ'ল। কালাচাঁদ নিশ্চয়ই বাজার করে ফিরছে। তাড়াতাড়ি আবার নিজের ঘরে গিয়ে বসি। দরজার কপাট ফাঁক করা আছে। কালাচাঁদের কাশিতে চমকে জেগে উঠল পাহারা। একটু অবাক হয়ে সে ঠাহর করে নিল কোথায় আছে। দুটো হাই তুলবার পর সে আড়মোড়া ভেঙ্গে নিচ্ছে—ঠিক যেমন করে মানুষে ডন ফেলে। এইবার আরম্ভ হ'ল তার খেলার পালা—ছুটোছুটি, রঙ্গকৌতুক। কালাচাঁদ মাছ কুটতে বসেছে। পাহারা সম্মুখের পা দুটোকে এগিয়ে আধবসা অবস্থায় তাক করে নিল কালাচাঁদের দিকে। তারপর আরম্ভ হয় ছুটোছুটি লুটোপুটি, তাকে কেন্দ্র করে অর্ধবৃত্তাকারে। কালাচাঁদ যেন খেলার বুড়ী। তাকে একবার করে ছোঁয়, আবার হাঁফাতে হাঁফাতে নিজের জায়গায় এসে জিভ বার করে জিরিয়ে নেয়। এবার আর এক নতুন খেলা তার মাথায় ঢুকেছে। কালাচাঁদ সমানে তার সঙ্গে কথা বলে চলেছে; পাহারার সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। সে আছে নিজের তালে। পিছন দিক থেকে গিয়ে কালাচাঁদের কাছার কাপড় একটু কামড়ে ধরে ছুটে পালালো। "হেট্!" এবারকার খেলাটি জমে আসছে। আবার পিছনের কাপড়ে একটু দাঁত ফুটিয়ে দৌড়। "আ মর!" দুষ্টুমিভরা চাউনি পাহারার। বুঝছে সব। "পালা বলছি!" তবুও পাহারার খুনসুড়ির অন্ত নেই। বঁটির সম্মুখে রাখা ছাইয়ের মধ্যে থেকে একখান আধপোড়া কয়লা ছুঁড়ে কালাচাঁদ তাকে ভয় দেখায়। এ আবার এক নতুন খেলা নাকি? না কোনও খাবার জিনিস? কেমন যেন আঁশটে আঁশটে গন্ধ বার হচ্ছে। পাহারা সেটাকে চিবিয়ে খেয়ে দেখে। "ভাল না খেতে, নারে পাহারা?"…

আর আমি থাকতে পারি না। "কালাচাঁদ!"

"বাবু!"

"কুকুরটা যে আঁস্তাকুড়ে যা তা খেয়ে বেড়াচ্ছে। পাহারা!"

শিকল বকলস হাতে নিয়ে উঠি। আমার গলার সাড়া পেয়ে পাহারা কালাচাঁদের গা ঘেঁসে বসে পড়েছে ; ভয় পেয়েছে, তার আড়ালে আশ্রয় নিতে চায় আসন্ন বিপদে ; মিশে যেতে চাচ্ছে কালাচাঁদের শরীরে।···ঐ আসছে! জুজু! ডাকাত! তাকে ধরতে। ভয়ে চোখের পাতা পড়ছে না ; আমার দিকে তাকিয়ে।···এসে পড়ল যে! এখন উপায়? ···কালাচাঁদের দিকে কাতর মিনতি জানাল তার দৃষ্টি। তারপর চারি-দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল।···পালাবো নাকি মরিয়া হয়ে? না অসম্ভব। এ ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব। না। ও আমার খেলার সাথী কালাচাঁদ, তোমার দুটি পায়ে পড়ি বাঁচাও!··· পাহারার চোখের ভাষা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি। আঁকড়ে ধরেছে কালাচাঁদের পা। তবু তাকে বাঁধতেই হবে। কৃমির ওষুধ আর জোলাপ খাইয়ে মরছি!—চোখের উপর যা তা খাওয়া দেখতে পারি না। কালাচাঁদের কি? সে আজ আছে, কাল চাকরী ছেড়ে চলে যেতে পারে। আমাকেই তো এই কুকুর নিয়ে ঘর করতে হবে। ও খারাপ হ'লে চাকরবাকরের কি যায় আসে? ওকে শিক্ষা দেবার গুরু দায়িত্ব যে আমার উপর।···তোর ভালর জন্যই তোকে বাঁধছিরে পাহারা।

"বার বার করে বলি কালাচাঁদ ওটাকে বেঁধে রাখ!"···

"আমি আবার কি করলাম বাবু?"

"আচ্ছা আচ্ছা! ঢের হয়েছে!"

অনিচ্ছুক পাহারাকে শিকল ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ঘরে বাঁধি। সত্যিই ওকে বেঁধে রাখবার বিষয়ে কালাচাঁদের কোনও দোষ নাই। আমিই দিনকয়েক আগে খুলে দিয়েছিলাম। কুকুরের বইয়ে যা ইচ্ছে লিখুক—অতটুকু বাচ্চা ইচ্ছামত ছুটোছুটি করতে পারবে না? নিজের বাড়ির মধ্যেও? পথে-ঘাটে চলে গেলে অবশ্য আলাদা কথা।

বকলসের চামড়ার ঘষটানি লেগে গলার নরম রোঁয়াগুলো উঠে একেবারে ঘা হওয়ার যোগাড়। ছেলেমানুষ—বোঝে না তো—যতক্ষণ বাঁধা থাকবে কেবল শেকল টানাটানি করবে।...

সেদিন কালাচাঁদ শশীর কাছে গল্প করল যে, বাবুর মেজাজ কিছুদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না; আর শশীর রায় হ'ল যে বিয়ে-না-করা লোকের মেজাজ মাঝে মাঝে তিরিক্ষি না হয়েই পারে না।

কালাচাঁদ বোধহয় অস্পষ্টভাবে বুঝছিল যে তার উপর বাবুর মন দিনদিনই বিরূপ হয়ে উঠছে। তার বাবু তো এমন ছিলেন না। সে বাবুকে খুশী রাখবার জন্য নানারকম চেষ্টা করে, নিজের বুদ্ধিতে যতদূর কুলয়। মাংস রাঁধবার বৈচিত্র্য বাড়ে; চায়ে সরের কুচি আর পাওয়া যায় না; হলপ খেয়ে বাবুর কথার প্রতিবাদ করবার অভ্যাস সে ছেড়েছে; বাবুর সম্মুখে পাহারাকে প্রশংসা করবার মাত্রা সে শতগুণ বাড়িয়েছে। তবু বাবুর মন পাওয়া ভার। টাকা-পয়সার টানাটানি নয়তো? আগেকার মত যখন তখন কুকুরের গপ্‌পো করেন কই তার সঙ্গে?

কালাচাঁদের মুখে পাহারার প্রশংসার গল্প সত্যিই আমার ভাল লাগে না আজকাল। একঘেয়ে মিথ্যে গল্প কতকগুলো। তবু কি কালাচাঁদ রেহাই দেবে? খাওয়ার সময়টুকুতে পর্যন্ত কামাই নেই; এক এক সময় অসহ্য বোধ হয়।

সেদিন খেতে বসেছি। কালাচাঁদ এসে সম্মুখে দাঁড়ালো। এইবার আরম্ভ হ'ল বুঝি তার মিথ্যে গল্প। বারণ করলেও শোনে না। কি যে করি একে নিয়ে।

"দিয়েছি শশীকে আজ এক এমন দাবড়ানি"...

আজ তা'হলে শশীর কথা দিয়েই আরম্ভ। কালাচাঁদের সব কৌশল আমার জানা।

"কেন? কি করেছিল শশী?"

"আর বলবেন না বাবু। হলুদ বাঁটে, তার মধ্যে এত বড় বড় ডুমো ডুমো হলুদ থাকে।"

"তাই নাকি ? আমি লক্ষ্য করিনি তো।"

"আপনার কথা বাদ দেন। ভাল হোক, মন্দ হোক, যা রেঁধে দিই তাই সোনামুখ করে খেয়ে ওঠেন। কিন্তু ওঁর মুখে যে রোচে না।" ওঁর মানে পাহারার। তা' হ'লে এসে গেল, পাহারার কথা।

"পাহারা বেচারাকেই বা দোষ দিই কি করে। ওর মাংসের মধ্যে পড়ে তো শুধু ঐ একটু হলুদ। তাও যদি মনের মত না হয়, তা'হলে একটু মেজাজ খারাপ হবে বইকি। আজকাল আবার ভবিষ্যযুক্ত হয়ে উঠেছেন পাহারাবাবু। বসতে বললে বাবু হয়ে বসা হয়।"...

"বল্‌তো দেখি একবার ওটাকে বসতে; দেখি কেমন তোর কথা বুঝতে শিখেছে।"

কালাচাঁদ ঘাবড়াবার পাত্র নয়। অসীম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হুকুম দিল "ব'স পাহারা।"

পাহারা তার পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও কিছুক্ষণ সময় দিলাম কালাচাঁদকে। কিন্তু তার সব খোশামোদ, অনুনয়-বিনয়কে উপেক্ষা করে পাহারা নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

"কথা বোঝে, না ছাই।"

কালাচাঁদ লজ্জিত হয়ে সাফাই গাইবার স্বরে বলে—"আপনার সামনে ভয় পায় বাবু। দেখছেন না, তাকাচ্ছে কেমন করে।"

এই কথাটিকেই আমি সব চেয়ে অপছন্দ করি। অথচ কথাটা নির্মম সত্য। কালাচাঁদও তা'হলে পাহারার চাউনির ভাষা বোঝে। বুঝেও, নিজের কাছে পর্যন্ত কথাটাকে স্বীকার করতে চাই না আমি। পাহারা যে আমার সম্মুখে ভয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়, আমি ভাবতাম এ জিনিস কালাচাঁদের নজরে পড়েনি। তার কথার মধ্যে

খানিকটা দাম্ভিকতা মেশানো নয়ত, পাহারা তার বশ বলে? তার উপর বিদ্বেষ ফুটে বার হয় আমার উত্তরের মধ্যে দিয়ে।

"কেন? আমি কি বাঘ না শিয়াল যে ওকে খেয়ে ফেলে দেবো?"

"তা নয় বাবু। ছোটলোকের জাত এই দিশী কুকুর···!" কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুনর আশঙ্কা দেখে কালাচাঁদ সন্ধি করতে এগিয়ে এসেছে।

হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল আমার মধ্যে। ভাববার যন্ত্রটাকে বিকল করে দিয়ে একটা আগুনের হলকা ছুটে গেল আমার মাথায়, শরীরের প্রতি স্নায়ু উপস্নায়ুতে। কখন আসন ছেড়ে উঠে পড়েছি জানি না। কালাচাঁদের উপর অহেতুক রাগের সমস্তটা গিয়ে পড়েছে পাহারার উপর। এতদিনকার বদ্ধ আক্রোশ হঠাৎ বেরুবার পথ খুঁজে পেয়েছে। এক লাথিতে দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে পাহারা। আবার কাঁই কাঁই করে ছোট ছেলের কান্নার মত চীৎকার। ইচ্ছা হয় ওটার টুঁটি মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিই। দরদ বোঝে না, টান বোঝে না, ভালবাসার মর্যাদা দিতে জানে না। নিমকহারাম কুত্তার বাচ্চা কোথাকার। এমনি মারের উপর ওটাকে রাখা উচিত। তবেই ওর বেয়াড়াপনা শায়েস্তা হবে!···

কালাচাঁদের উপরে এক কটাক্ষ হেনে নিজের ঘরে এসে ঢুকি। দড়াম করে দরজার কবাটটা বন্ধ করেই খেয়াল হয় যে, আঁচানো হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে সম্বিৎ ফিরে আসে।···ছি, ছি···! মিছামিছি এমন অশোভন কাণ্ড করে বসলাম। কি ভাবল কালাচাঁদ। আঁচাতে বেরুতেই কুকুরটা ছুটে পালাল, তার শেষ আশ্রয়স্থল কয়লাগাদার পিছনে। কালাচাঁদ ঠিক সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে—মাটির দিকে তাকিয়ে। তাই চোখো-চোখি হবার সঙ্কোচ থেকে বেঁচে গেলাম। ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট মনিবকে নিয়ে তার কারবার। তাই মনিবের রাগকে সে কোনদিনই বিশেষ আমল দেয় না। কিন্তু আজকেরটা অন্য রকম। এ জিনিস এর আগে

সে কখনও দেখেনি। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, বাবুর আসল আক্রোশ কার উপর। নইলে সে কি জিজ্ঞাসা করত না একবার, "কি বাবু, দইয়ের প্লেট তুলে রাখব নাকি ও বেলার জন্য?" সে সাহস তার আজ নেই।

সেদিন কালাচাঁদ কিছু খেলো না। এ খবর আমি জানতে পারলাম, উঠনে শশীর কথা থেকে। তার ভাত দিয়ে দিয়েছে দেখে, শশী জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ হয়েছে নাকি? কালাচাঁদ বলল—হ্যাঁ, একটু খারাপ খারাপ লাগছে।

ধরা পড়ে গিয়েছি কালাচাঁদের কাছে।

এর পর থেকে আমার আর তার মধ্যের সহজ সম্পর্কটা আর জীইয়ে রাখা সম্ভব হয় না। চেয়েছিলাম পাহারাকে আমার কুকুর, একান্ত আমার কুকুর করে তয়ের করতে। পারিনি। এজন্য অসফল শিক্ষকের গ্লানি তো আছেই। কালাচাঁদের কাছে হেরে গিয়েছি; দিন দিন একটু একটু করে তার শক্তি বাড়ছে আর আমার কমছে, অষ্টপ্রহর এ কথাও আমাকে পীড়া দেয়। আমার আমিত্বের অপমানে ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মান অপমানের প্রশ্ন মনের উপরের স্তরের জিনিস; তার চটক আর পালিশ সম্পর্কিত ব্যাপার। আমার গ্লানি অন্তরের আরও গভীরে। পাহারার কাছ থেকে আমি কি প্রত্যাশা করি তা আগে বুঝতে পারতাম না ঠিক, এখন পারি। সেদিন মার খাবার পর থেকে পাহারা আমার বশ মেনেছে; অর্থাৎ দেখছি ডাকলে আসে—ভয়ে, লেজ আর মাথা নামিয়ে হামাগুড়ি দেবার মত নীচু হয়ে, বলির পাঁঠার মত আড়ষ্টভাবে। সে সময় কুঁই কুঁই করে গলা দিয়ে একটা কাতরোক্তি বার হয়। অমন করিস কেন পাহারা? আমি কি এখন তোকে বকছি?...পাহারা জেনে গিয়েছে যে আমিই তার মনিব, কালাচাঁদ নয়।...এই জিনিস তো তুমি চেয়েছিলে—তবে আবার কেন?...না না, তাকে ডাকতে হবে কেন।

আমি চাই, আমার বাড়িতে ঢোকার সাড়া পেয়ে নিজে থেকে ছুটে আসুক, লেজ নাড়তে নাড়তে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ুক আমার গায়ে, গা-হাত চেটে সোহাগ জানাক। সেদিন মার খাওয়ার পর থেকে আমার বাড়ি ঢুকবার সাড়া পেলেই কয়লাগাদার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকে। সেই দিন থেকে পাহারা ও আমার মধ্যের ভয়ের ব্যবধান আরও গভীর হয়ে গিয়েছে। ডাকলে অবশ্য আসে, কিন্তু সে আসে ভয়ে; যা বলি শোনে, কিন্তু সে শোনে ভয়ে; আমার আদরে আত্মসমর্পণ করে বটে, কিন্তু সে করে ভয়ে। এ তো আমি চাইনি।...চেয়েছিলে 'মনিবের কুকুর' করতে; তোমাকে তো পাহারা মনিবের স্বীকৃতি দিচ্ছেই।...না, আমি ওর বশ্যতা চাইনি, ভালবাসা চেয়েছিলাম। প্রভুভক্তি চাইনি, চেয়েছিলাম অন্তরের টান—যেমন ওর আছে কালাচাঁদের উপর। ঐ যেমন করে ও দাঁত না ফুটিয়ে কালাচাঁদের আঙুল কামড়ে দিয়ে পালায়, পাঁচিলের উপর কাঠবেরালি দেখে যেমন করে তাকে মজার খবর দিয়ে যায়, যেমন তাকে বুড়ী করে খেলা করে, তেমনি। আমার কথা পাহারা সব সময় শোনে, বাঁধবার জন্য ডাকলেও। কিন্তু কালাচাঁদ শেকল হাতে নিয়ে ডাকলে নাগালের থেকে দূরে পালায় দুষ্টু ছেলের মত। আমিও তাই চাই। না শুনুক আমার কথা, আমি চাই তার মন। সে আমাকে তার খেলার সাথী ভাবুক। ভয়ের সম্পর্ক কি কখনও নিবিড় হয়? ভয় পেলে যে মনের অবস্থা কি হয়ে যায়, তা কি আমার জানা নেই? ছোট-বেলা থেকে ভয়ের রোগে ভুগছি; আমি তো জানি সারা মনকে ভয় কি রকম অসাড় করে দেয়। সে সময় কি কাউকে ভালবাসা যায়? তিন জনের সংসারে, তারা দুজন একদিকে; আমি ভোটে হেরে গিয়েছি। আমার সংসারে আমি হয়ে পড়েছি অনাবশ্যক। সেই প্রথম ওষুধ খাওয়ানর দিন থেকে আমার আর পাহারার মধ্যে একটা ভয়ের সম্বন্ধ গড়ে উঠতে আরম্ভ হয়েছিল। তারই চরম পরিণতি ঘটেছে

তাকে লাথি মারবার দিনে। এ ভয় কি আর কোনও দিন ভাঙ্গবে ?...

পাহারাকে মারবার দিন থেকে কালাচাঁদ গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। নেহাৎ দরকারের কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা হয় না আমাদের মধ্যে। অবশ্য তার কোন কাজের ত্রুটি নেই—টেবিলের উপর সিগারেটের প্যাকেট, মাথার বালিশের পাশে টর্চ, ভোরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আমার বিছানার পাশে এসে গলা খাঁকার দেওয়া, স্নানের ঘরে গরম জলের কেটলি, সব আগেকার মত আছে। শুধু সে হয়ে গিয়েছে অন্যরকম। আগেকার মত স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা আমি তার সঙ্গে বলতে পারি না আর। তাই কালাচাঁদ আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। আমি তার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছি বলে দুঃখিত হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এ সঙ্কোচ কেন ? কেন সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না ?...না না, তার উপর নরম হওয়া কোন কাজের কথা নয়। চাকরের সঙ্গে চাকরের মত ব্যবহার করবে। সব সময় খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখবে তার সঙ্গে। ও নিজেকে মনে করে আমার সমান—আমার চেয়েও বড়। ও একটু একটু করে ছিনিয়ে নিয়েছে পাহারাকে আমার কাছ থেকে!...আচ্ছা তাই নয়ত ?...অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের ঝলক লাগল। মন যা খুঁজছিল, তা দেখতে পেয়েছে হঠাৎ। সন্দেহ মূর্ত হয়ে উঠেছে।...নিশ্চয়ই তাই। যা সন্দেহ করছি তাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কালাচাঁদের কূটনীতি—কেমন করে একটার পর একটা চাল দিয়ে পাহারার মন কেড়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। ছি ছি ছি! এ দিকটা এতদিন খেয়ালই হয়নি। পাহারার অপ্রিয় কাজগুলো কালাচাঁদ চালাকি করে আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে এতদিন; আর নিজের উপর রেখেছে, সেই কাজগুলোর ভার যেগুলো পাহারা ভালবাসে। পাহারা স্নান করতে ভয়

পায় ; তা করাবো আমি। সে বাঁধা থাকতে পছন্দ করে না ; কিন্তু শিকল দিয়ে বাঁধবার ডিউটি আমার। তাকে চেপে ধরে চিৎ করে ফেলে প্রতি সপ্তাহে ওষুধ খাওয়ানর কাজ আমার। পাহারা ঘর নোংরা করলে, সারারাত চটিজুতো চিবুলে, শুকোতে দেওয়া কাপড় দাঁত দিয়ে ছিঁড়লে, রান্নাঘরের নর্দমা থেকে ফেন খেলে, শাসন করবার ডিউটি আমার ; তখন কালাচাঁদ মুখে রা কাটে না। কিন্তু কুকুরকে খেতে দেয় সে, বেড়াতে নিয়ে যায় সে। যত ভাবি তত মাথা গরম হয়ে ওঠে। বাড়ির থমথমানি ভাব কোনও দিন কাটবে বলে মনে হয় না। এই রকম একটা কুটিল প্রকৃতির লোককে আমি এতদিন থেকে বিশ্বাস করে পুষে রেখেছি। শয়তানটা একটু একটু করে আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে ! আগে থেকে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আর কি এখন সময় আছে ?

কি ক'রে পাহারার মন ফেরানো যায়, সেই চিন্তা আমার অষ্টপ্রহর। পাহারার মন পেলে কেমন লাগবে সে কথা ভাবতেও আনন্দ। কালাচাঁদের জন্য পাহারা যা যা করে, সেগুলো যদি আমার জন্য করত ! কাজকর্মের পর কালাচাঁদ দরজা বন্ধ করে ঘুমোয়। ওঠে সাড়ে তিনটের সময়। এর মধ্যে বারকয়েক পাহারা কুঁই কুঁই ক'রে কালাচাঁদকে ডাকতে ডাকতে তার দোর আঁচড়ায়, আর প্রতিবার কালাচাঁদ "ভাগ্ বলছি ! পালা !" ব'লে তাকে তাড়িয়ে দেয়। এই ব্যবহার যদি আমি পেতাম পাহারার কাছ থেকে ! সে আনন্দের স্বাদ আমি কোনও দিন হয়ত পাব না। হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি খেলে। বইয়ের দোকানে একটি মনিঅর্ডার করবার জন্য পোস্ট অফিসে ইচ্ছা করেই সেদিন পাঠালাম কালাচাঁদকে। পাহারা তখন ঘুমিয়ে। কালাচাঁদ চলে গেলে তার ঘরে গিয়ে ঢুকি। ঢুকেই ইচ্ছা ক'রে জোরে শব্দ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিই—যাতে পাহারা জেগে ওঠে। তারপর বন্ধ কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করি পাহারার।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি। বুঝতে পারি যে, পাহারা এসেছে ঠিক। ফোঁস ফোঁস করে শব্দ করে সে দোরগোড়ায় কি যেন শুঁকলো বারকয়েক, তারপর নিঃশব্দে চলে গেল। ভয়ের গন্ধ পেয়েছে। শুঁকবার পূর্ব মুহূর্তে পাহারা আশা করেছিল কালাচাঁদের গন্ধ পাবার। যত নষ্টের গোড়া ঐ কালাচাঁদ! বিদ্বেষ আরও ঘনিয়ে ওঠে তার উপর। এখনি আবার সে ফিরে আসবে। তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসি তাড়াতাড়ি।...আজ থেকে বাজারের হিসেব নিতে হবে! অমন লোকের উপর বিশ্বাস ক'রে সমস্ত ছেড়ে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। অত খাতির কিসের।

কি করি ভেবে পাই না। গুছিয়ে ভাবতে পারছি না। চেষ্টা করলে কি হবে! মনের মধ্যের বদ্ধ আক্রোশ সব ভাবনাচিন্তাগুলোকে এলোমেলো করে দিচ্ছে। ঐ দুষ্টু লোকটা আমার কাছ থেকে যে কৌশলে পাহারাকে দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছে ঠিক সেইরকম করেই আমিও পাহারাকে তার প্রতি বিমুখ করাব। এখনও সময় আছে। যেমন লোক তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করতে হবে। পাহারাকে খাওয়ানর ভার এবার থেকে আমি নিজে নেব। নিজে তাকে নিয়ে বেড়াতে বার হব। পাহারার স্নান করবার সময় রান্নাঘরে ওর হাত জোড়া থাকে এই অছিলায় কালাচাঁদ তাকে কোনও দিন স্নান করায় না। ওসব চলবে না! পরিষ্কার বলে দেব, কাল থেকে রান্নাবান্নার পর তুমি নাওয়াবে ওকে—তোমাকেই করতে হবে। তোমার সব চালাকি আমি বার করছি! কিন্তু যদি সে সত্যিসত্যিই দোষী না হয়? যদি আমাকে পাহারার বিরাগভাজন করবার কথা সে আদপে নাই করে থাকে? ভাবে আবার নি! নিশ্চয়ই ভেবেছে! আমার সংসারে, আমার কুকুর সম্বন্ধে আমার চাকরকে আমি হুকুম করব, এর মধ্যে আবার দ্বিধা কিসের? কিন্তু পাহারার কথা তার কাছে তোলবার আগে

খানিকটা প্রাথমিক সঙ্কোচ কাটিয়ে নিতে হবে। এ সঙ্কোচ পাহারাকে মারবার আগে পর্যন্ত ছিল না।…

কালাচাঁদ এসে গম্ভীর ভাবে ব'লে গেল যে, ভাত বাড়া হয়েছে। এরই মধ্যে সাড়ে আটটা বেজে গেল! বুঝতেই পারিনি।

খেতে বসেও ভাবতে লাগলাম, কি রকম ভাবে কথাটা তোলা যায় তার কাছে। পাহারা নামটা কালাচাঁদের সম্মুখে নিতেই লজ্জা সবচেয়ে বেশী। "কুকুরটার খাবার এবার থেকে আমিই দেব"—কেমন শোনায়? কুকুর শব্দটি ব্যবহার না করতে হ'লেই ভাল। "ওর খাবারটা দিও তো আমার কাছে"—শুনতে মন্দ লাগছে না "ওর" বললে আবার বুঝবে তো কালাচাঁদ? বাড়িতে তিনটি প্রাণী; আমি বলছি কালাচাঁদের কাছে; এখানে "ওর" বললে পাহারা ছাড়া আবার কার হবে?

ভাত বেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া হ'ল সম্মুখ থেকে! আর কিছু চাই কি না, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যও তো লোক থাকে! হোটেলেরও অধম হ'য়ে উঠেছে এ বাড়ি!…

মনের জল্পনা কল্পনার স্রোত হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়—ঐ যে কালাচাঁদ, উঠনের কোণায় রাখা পাহারার এনামেলের থালায় ঢেলে দিচ্ছে হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করা ভাত আর হাড়! পাহারার আর তর সইছে না। আনন্দের আতিশয্যে লেজ নাড়বার সঙ্গে সারা দেহ তার নড়ছে।…

…আমার খাওয়া শেষ হবার আগেই কালাচাঁদ নিজে হাতে পাহারাকে খাইয়ে দিতে চায়—যাতে আমি পাহারাকে খাওয়াবার সুযোগ না পাই! কী চালাক! আমার সন্দেহের হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছি।…যে খেতে দেয়, তাকেই কুকুর সবচেয়ে ভালবাসে।…

"কালাচাঁদ!"

আমার হুঙ্কার শুনে চমকে পিছন ফিরে তাকালো সে। পাহারাও। ভয়ে।

"সব বুঝেছি আমি তোমার! বদমাইস কোথাকার!"

এ স্বরে, এ সম্বোধনে কালাচাঁদ অভ্যস্ত নয়।

"কি আবার বাবু, বুঝলেন আপনি আমার?"

সে রুখে দাঁড়িয়েছে! সোজা হয়ে; মাথা উঁচু ক'রে। মুখে প্রশ্নের ব্যঞ্জনা দেখে বুঝি যে, সে আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে। এ একেবারে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান, তার মান-অপমানের প্রশ্নে। আমাকে অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণের একটা সুযোগ দেবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছে মাত্র। এ সাহস সে পেলো কোথা থেকে? আমি যা বলতে চাই, তা সে নিশ্চয়ই বুঝেছে। সে জেনেছে আমার ঈর্ষার কথা! সে বুঝেছে যে, এ বিষয়ে একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া দরকার—আজই এখনই। আমিও তাই চাই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সাহস পাই না। কালাচাঁদ বুঝে থাকে বুঝুক; কিন্তু নিজে থেকে আমি সে কথা তুলব না তার কাছে। সে নিজে যদি পাহারার কথা তোলে, তা'হলে অবশ্য আমি তখন আর কিছু বাকি রাখব না—তার আগে নয়। কিন্তু জবাব যা হোক একটা কিছু দিতেই হয়।...মনে পড়েছে একটা কথা।...হোক তুচ্ছ।...

"তুই প্রত্যহ আমার সিগারেট চুরি করিস্। আমি রোজ গুণে রেখে দিই, তার খবর রাখিস্? যতটা বোকা আমাকে ভাবিস্, ততটা আমি নই। বুঝেছিস্?"

এর জন্য কালাচাঁদ তৈরী ছিল না। আঘাত যে ঐ দিক থেকে আসতে পারে, তা সে ভাবেনি। কথাটা সত্যি। তার ধারণা যে, বাবু তার সিগারেট চুরির কথা জানে চিরকাল; কিন্তু সেই কারণ দেখিয়ে পাল্টা ঝগড়া করা চলে না। তবু মৃদু প্রতিবাদে জানাতেই হয় যে, বাবুর ধারণা ভুল; তবে তার উপর বিশ্বাস যখন চলেই গিয়েছে, তখন আর এখানে চাকরি করা উচিত নয়।...

কালাচাঁদকে নরম পেয়ে তখন আমার মনের জোর বেড়েছে ; এ একরকম বেশ আপনা থেকে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

"যেতে ইচ্ছা হয় যাবে—তার ভয় দেখাচ্ছ কি ? অত খোশামোদ কিসের ? পয়সা দিলে কি আর অন্য চাকর পাওয়া যাবে না ?"

সে গম্ভীর হয়ে ঘরে ঢুকে নিজের কাপড় গামছা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

এতক্ষণ পাহারা কি করছিল লক্ষ্য করিনি। কালাচাঁদ তখন সবে ফুলবাগান পার হয়ে সদর রাস্তায় পড়েছে। আমি দোরের উপর মানসিক উত্তেজনায় এক রকম অভিভূত অবস্থায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠেছি ভয়ে। একেবারে পড়ে যাবার যোগাড়। আমার গা ঘেঁষে ছুটে বেড়িয়ে গেল পাহারা। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।...

"পাহারা! পাহারা!"

আমার কথা শুনবার কোন লক্ষণ নেই নিমকহারামটার! পথের ড্রেন শুঁকতে শুঁকতে সে চলেছে।...

লোকে কি বলতে চায়, আর কি ব'লে ফেলে। পাহারার উপর নিষ্ফল আক্রোশে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—অতি হাস্যাস্পদ কথা—"নতুন বকলসটা!"

কালাচাঁদ ভাবল, তাকে শুনিয়েই বলা হ'ল।

"আমি তো আর নিইনি। আপনার কুকুর, আপনি ডাকুন ; ধরে খুলে নেন্।"

যাবার সময় চরম অপমান করে গেল সে। আমার সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায় সে আঘাত দিয়েছে—"আপনার কুকুর"—শ্লেষ করেছে আমার মালিকানা স্বত্বের কথা তুলে—এমন সময় যে, জবাব দেবার পর্যন্ত সুযোগ রাখেনি।

একলা থাকব কেমন করে? এত বড় বাড়িতে একা! কি হবে! চিরকাল কালাচাঁদ ছিল। যদি বদলোকটোক আসে! নিজের বিছানার উপর গিয়ে বসি। এখনই গা ছমছমানি আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। সারারাত কিভাবে যে কাটবে!...

...বাড়ি খালি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মনের ভিতরটা খালি লাগছে আরও বেশী। মন ভরা থাকলে সেখানে ভয় ঢুকতে পারে না।...এর আগে বহুবার একটা খেয়াল ছেড়ে, আর একটা খেয়াল ধরেছি। কিন্তু সে পরিবর্তন রাতারাতি হয়নি। নতুন ঝোঁক আর পুরনো খেয়াল, দুটোতে কিছুকাল আমার মনের মধ্যে নিজের নিজের দাবী পেশ করে আমায় অধিকার করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এবার মন সে রকম খাপ খাইয়ে নেবার সুযোগ পেল কই? দেশলাইয়ের ছবির জায়গায় ডাকটিকিট জমালেও চলতে পারে; কিন্তু পাহারার জায়গায় অন্য একটা কুকুর পোষায় মনের শূন্যতা ভরবার নয়। কাঠের পা কি কখনও নিজের পায়ের তৃপ্তি দিতে পারে?...ভয়ে গা শিরশির করছে। জানালাগুলো বন্ধ করলে হত...ভয় কিসের? ঐ তো ঘরে আলো জ্বালা রয়েছে। এ ঘরে পাহারা থাকলে এখন একটুও ভয় করত না। ...ঠিক সময়ে দুবেলা খাওয়াবে তো কালাচাঁদ পাহারাকে? পয়সা পাবে কোথায়? যে বাড়িতে নতুন চাকরি নেবে তারা যদি পাহারাকে না রাখতে চায়। থাকগে, যে জানোয়ারটা স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছে কালাচাঁদের সঙ্গে, তার কথা আমার ভাববার দরকার কি? একবার ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। যা! বোঝ বাইরে কত আরাম কালাচাঁদের সঙ্গে। না ডাকতেই চলে গেল ওর সঙ্গে। আশ্চর্য! ঐ কুকুরটাকে দিয়ে আমায় অপমান করালে কালাচাঁদ! সে চলে যাবার পর যদি সাত দিনও রাখতে পারতাম পাহারাকে, তা'হলে বোধহয় তার ভয় ভাঙ্গত। কালাচাঁদ যদি অন্তত এনামেলের থালাখানাও সঙ্গে নিয়ে যেত। কুকুরটা

যে কিছুতেই খাবে না যতক্ষণ না ঢেলে দিচ্ছ তার খাবার; ঐ থালাতে।...এতদিন পাহারাকে দেখে শ্রান্ত হতাম না: আজ পাহারার কথা ভেবে শ্রান্তি আসে না। কতরকম করে তার কথা ভাবি। আমার ঘর-দুয়োর সব জায়গায় যে পাহারা ছড়ানো।...দেখ—আদিক্যেতা কোনও জিনিসের ভাল না! একটা কুকুর গিয়েছে, তাই নিয়ে তিলকে তাল করা!...কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিতে পারছি কই ব্যাপারটাকে। শূন্য ঘর-দোর যে আমাকে গিলে খেতে আসছে। পাহারার ত্রস্ত চোখের চাউনি কি আর আমায় স্বস্তি দেবে।...ভয় পাস কেন পাহারা আমায় দেখে। পাহারা!—আয়—আয়—আ—তু...! বোকা কোথাকার।...পাহারার কাতর কান্না...ভয়ার্ত চীৎকার...তাকে বাঁচাবার জন্যে কালাচাঁদের কাছে নির্বাক মিনতি-ভরা চাউনি...সব মেশানো এ বাড়ির হাওয়ায় বাতাসে। সবগুলো ভয়ের অশরীরী মূর্তি! ছাড় আমি অপরের চোখে ধরা পড়ে না—আমার সঙ্গে ভয়ের একটা চিরকেলে আত্মীয়তা আছে কিনা। এত গভীর ভাবে পাহারাকে চেয়েছি যে, আমার ভয়কাতুরে মনের ছায়াই বোধ হয় পড়েছিল পাহারার চোখে।...যবে থেকে কুকুর পুষছি তবে থেকে নিজের ভয়ের কথা ভুলেছিলাম। আমার ভয়টাই হয়ত চলে গিয়েছিল পাহারার মধ্যে। অমন তো হয় শুনেছি। বাবর বাদশা, হুমায়ূনের রোগ নিজের মধ্যে নিয়ে নিয়েছিলেন যেমন করে ঠিক তেমনি।...পাহারা চলে যাবার সময়, আমার ভয়টা আবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল না কি? সেই ধাক্কা দিয়ে পালাবার সময়—গা ঘষটানির মধ্যে দিয়ে!...

এ রাতের শেষ নেই। এ চিন্তারও।

একটা আওয়াজ হ'ল যেন! হাওয়া? পায়ের শব্দ! কে? যে হয় হোক, আমি চোখ খুলছি না কিছুতেই! আবার কি না কি দেখব।...ঘরে এসে ঢুকেছে! ওই—এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ

আমার দিকে !···মুখের উপর তার নিশ্বাস পড়ায় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল !

"বাবু ! ও বাবু !"

কালাচাঁদেরই মত গলা ? ও এসেছে কেন এই রাত্রে ! না না, কালাচাঁদকে আবার ভয় কিসের ? ও কি কখনও আমার গায়ে হাত তুলতে পারে ?···

"ওটা কোথায় ।"

"কে ? কোনটার কথা বলছেন বাবু ।"

"পাহারা, পাহারা, আবার কে ! যেন বুঝতেই পারছেন না !"

"পাহারা তো আমার সঙ্গে যায়নি । বাড়ি থেকে বেরিয়ে নালার ধারের মাটি শুঁকতে শুঁকতে ও চলে গেল ঐ ময়রার দোকানের দিকে আর আমি গেলাম শিবতলার রাস্তায় ।"

"যায়নি তোর সঙ্গে !" হাত চেপে ধরেছি কালাচাঁদের । পাথর নেমে গিয়েছে আমার বুক থেকে ।

"হাতটা গরম গরম লাগছে বাবুর ! শরীর খারাপ হয়েছে ? শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন, বাবু ।"

"বস কালাচাঁদ একটু এখানে । আমার বড় ভয় ভয় করছে ।"

"ভয় কিসের ।"

এ বাবু কালাচাঁদের চেনা